ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ; একটি অনুসন্ধান

পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক:

গোপা দত্ত

গবেষক:

দেবলীনা রায়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৩২

Certified that the Thesis entitled

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ; একটি অনুসন্ধান

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Gopa Datta

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/ elsewhere.

Candidate : Debalina Roy

Dated : 10.07.2021

Countersigned by the Supervisor : Gopa Datta

Dated : 10.07.2021

স্বীকৃতি

ব্যক্তিগত স্তরে আত্মহত্যা বিষয়ে আগ্রহ থেকেই বাংলা সাহিত্যের নানা চরিত্রদের আত্মহত্যার দিকে নজর যায় আমার। বর্তমান গবেষণার প্রতি মুহূর্তে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ গোপা দত্ত মহাশয়া। গবেষণার এই সাত বছরে একদিকে যেমন নতুন নতুন ভাবনার দিক খুলে দিয়েছেন, অসংখ্য উপন্যাসের সন্ধান দিয়েছেন, তেমনই ব্যক্তিগতভাবে যাতে কখনও অলস না হয়ে পড়ি, লেখাপড়ায় যেন ঘাটতি না হয়, সেই দিকেও ওঁর নজর ছিল প্রতিমুহূর্তে।

আরো একটি বিষয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত অধ্যাপিকা পুষ্পা মিশ্র ও ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন ও গবেষণা বিষয়ে মূল্যবান কিছু আলোচনার সুযোগ পাই আমি, যা এই সন্দর্ভটিতে আলাদা ভাবে যুক্ত করেছি আমি।

অধ্যাপক শ্রী আব্দুল কাফি এই বিষয়ে বিভিন্ন বই এবং মূল্যবান নানা মতামত দেন যা আত্মহত্যার মত জটিল একটি বিষয় ও তার তাত্ত্বিক নানা দিক বিষয়ে আমার আগ্রহ তৈরি করে দেয়।

ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপিকা পুষ্পা মিশ্র ও ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্যকে, ওঁরা নিজের ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমার প্রশ্ন শুনেছেন এবং আত্মহত্যা বিষয়ে নিজের নিজের ধারণা তুলে ধরেছেন যা আমাকে বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে সাহায্য করেছে।

প্রি-সাবমিশন সেমিনারে অধ্যাপিকা সুমনা দাস মহাশয়া আমায় কিছু উপন্যাসের কথা বলেন, আমার এই গবেষণা সন্দর্ভ তাঁর মূল্যবান মতামতে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর প্রতিও আমার শ্রদ্ধা জানাই।

সহপাঠী ও বন্ধুদের কাছে অনায়াসে বারবার গেছি নানা সাহায্যের জন্য। তারা ফেরায় নি কখনো। তাদের অনবরত উৎসাহ ও কখনো কখনো কড়া শাসন আমায় দিগভ্রান্ত হতে দেয় নি।

সবশেষে বলতে হয় পরিবারের কথা। যাদের কথা বলে শেষ করা যায় না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের মতোই আমার এই গবেষণার কাজও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না তাদের ছাড়া।

সূচিপত্র

ভূমিকা (পৃষ্ঠা ১ - ৭)

প্রথম অধ্যায় - আত্মহত্যার ইতিহাস (পৃষ্ঠা ৮ - ৪৬)

১.১ প্রাচীনতম আত্মহত্যার নিদর্শন

১.২ গ্রিক- রোমান সমাজে আত্মহত্যা

১.৩ খ্রিস্টধর্মে আত্মহত্যা বিষয়ক ধারণার বিবর্তন

১.৪ প্রাচ্যে আত্মহত্যার ধারণা ও ইতিহাসের বিবর্তন

১.৫ ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা বিষয়ক ধারণা

১.৬ বৌদ্ধ ধর্মে আত্মহত্যার ধারণা

১.৭ হিন্দু ধর্মে আত্মহত্যা বিষয়ক ধারণা

১.৮ কালোত্তীর্ণ কিছু চরিত্রের আত্মহত্যার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

দ্বিতীয় অধ্যায় - আত্মহত্যার ধারণা; অতীত থেকে বর্তমান (পৃষ্ঠা ৪৭ - ৮৮)

২.১ ব্যক্তিতাবোধ ও বিচ্ছিন্নতা

২.২ আত্মহত্যা ও কয়েকটি তত্ত্ব

- ২.২.১ জ্যঁ পিয়ের ফ্যালরেট
- ২.২.২ মার্ক্স
- ২.২.৩ থমাস জি মাসারিক
- ২.২.৪ এমিল ডুর্খেইম
- ২.২.৫ কার্ল মেনিঙ্গার
- ২.২.৬ অ্যান্ড্রু সলোমন

২.৩ কথোপকথন (১) – অধ্যাপিকা পুষ্পা মিশ্র

২.৪ কথোপকথন (২) - ডঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য

তৃতীয় অধ্যায় - উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যার বিবরণ

(পৃষ্ঠা ৮৯ - ১৪০)

৩.১ পৌরাণিক কাহিনীতে আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.২ মধ্যযুগের সাহিত্যে আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.৩ আধুনিকতা, উপন্যাস এবং ব্যক্তিতাবোধের জন্ম

৩.৪ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.৫ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আত্মহত্যার অনুষঙ্গ

৩.৫.১ *দুর্গেশনন্দিনী* : আয়েষার আত্মহত্যার ভাবনা

৩.৫.২ *বিষবৃক্ষ* : মূল্যবোধের পরিণতি

৩.৫.৩ *চন্দ্রশেখর* : মহৎ আত্মাহুতি?

৩.৫.৪ *কৃষ্ণকান্তের উইল* : অপ্রাপ্তি ও আত্মহত্যা

৩.৫.৫ *আনন্দমঠ* : পাপ ও আদর্শবোধের পরিণতি

৩.৫.৬ *রাজসিংহ* : ধর্মরক্ষা ও আত্মাহুতি

৩.৫.৭ *কপালকুণ্ডলা* : আত্মহত্যার নতুনতর ব্যাখ্যা

৩.৬ বঙ্কিম সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাস

৩.৬.১ রমেশচন্দ্র দত্ত(১৮৪৮-১৯০৯)

৩.৬.১.১ *বঙ্গবিজেতা* : পরিত্রাণের উপায়

৩.৬.১.২ *মাধবীকঙ্কণ* : উগ্র প্রতিশোধস্পৃহা

৩.৬.১.৩ *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত* ও *রাজপুত জীবন সন্ধ্যা* : আত্মহত্যা – পৌরুষ ও সতীত্বের প্রতীক?

৩.৬.২ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)

৩.৬.২.১ *হরিষে বিষাদ বা নায়ক-নায়িকাশূন্য উপন্যাস* : সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার প্রাচীন কাহিনি

৩.৬.৩ স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২)

৩.৬.৩.১ *স্নেহলতা* : অভিমান ও প্রেমের অপমৃত্যু

৩.৬.৩.২ *মিবাররাজ* : অনুশোচনা ও আত্মহত্যা

৩.৬.৩.৩ *বিদ্রোহ* : অপরাধবোধ ও আত্মাহুতি

৩.৬.৪ দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩ – ১৯০৭)

৩.৬.৪.১ *বিমলা* : নিষ্কৃতির অবৈধ উপায়?

৩.৬.৪.২ *দুই ভগ্নী*: আত্মহত্যায় বঙ্কিম অনুসরণ

৩.৬.৪.৩ *মা ও মেয়ে* : প্রেমহীনতা

৩.৬.৫ মীর মশররফ হোসেন

৩.৬.৫.১ *বিষাদ সিন্ধু* : ধর্মরক্ষার খাতিরে আত্মহনন

৩.৬.৬ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮)

৩.৬.৬.১ *শক্তিকানন* : স্নেহের পরিণতি ও প্রায়শ্চিত্ত

৩.৬.৬.২ *ফুলজানি*: চিতারোহণ ও ধর্মরক্ষা – নারীর আত্মহত্যার প্রাচীনতম অনুষঙ্গ

৩.৬.৭ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৩.৬.৭.১ *তমস্বিনী* : প্রেমের স্বপ্নভঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায় - বিশ শতকের উপন্যাসে আত্মহত্যা: আধুনিক মানুষের সংকট (পৃষ্ঠা ১৪১ - ২১৪)

৪.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪.১.১ *রাজর্ষি* : মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মাহুতি

৪.১.২ *নৌকাডুবি* : আত্মহত্যার সম্ভাবনা এবং জীবনের প্রতি আস্থা

৪.১.৩ *চতুরঙ্গ* : আত্মহত্যা-উপন্যাসের বক্তব্যের প্রকাশক

৪.১.৪ *ঘরে বাইরে* : আত্মহত্যার ভাবনা থেকে জীবনবোধে উত্তরণ

৪.১. ৫ *যোগাযোগ* : আধুনিক সহমরণ

৪.১.৬ রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ

৪.২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৪.২.১ *রত্নদ্বীপ* : পাপ পুণ্যের পুরনো ছক

৪.৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪.৩.১ *দেবদাস* : প্রেম ও অপ্রাপ্তি

৪.৩.২ *গৃহদাহ* : দুঃখভোগ ও অপ্রাপ্তি

৪.৪ জগদীশ গুপ্ত

৪.৪.১ *অসাধু সিদ্ধার্থ* : আত্মনিগ্রহ

৪.৪.২ *রতি ও বিরতি* : শোক ও জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য

৪.৫ বুদ্ধদেব বসু

৪.৫.১ *সাড়া* : জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা

৪.৫.২ *নির্জন সাক্ষর :* প্রথাগত জীবনের ক্লান্তি

৪.৬ 'আত্মহত্যা'কে অস্বীকার: বিভূতিভূষণ

৪.৭ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

৪.৭.১ *পাষাণপুরী* : আত্মহত্যা যা ছাপ ফেলে যায়

৪.৭.২ *তামস-তপস্যা* : আত্মহত্যা চরিত্রের বাঁকবদলের দ্যোতক

৪.৭.৩ *আগুন :* ঈশ্বরলাভের মোহে আত্মাহুতি

৪.৭.৪ *নাগিনী কন্যার কাহিনী* : আত্মহনন,সামাজিক অবদমনের ফলশ্রুতি

৪.৭.৫ *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* : প্রেমের দর্প চূর্ণ

৪.৮ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪.৮.১ *দিবারাত্রির কাব্য* : প্রেমকে সম্পূর্ণতা দিতে ব্যক্তি 'আমি'র মৃত্যু?

৪.৮.২ *পুতুলনাচের ইতিকথা* : ইচ্ছামৃত্যুর আড়ালে পরাজয়ের গোপন গ্লানি

৪.৯ মনোজ বসু

৪.৯.১ *ভুলি নাই* : আত্মোৎসর্গের গরিমা

৪.১০ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

৪.১০.১ *লুসি আর্মানীর হৃদয় রহস্য* : মৃত্যু ভালোবেসে

৪.১১ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

৪.১১.১ *চেনামহল* : সামাজিক নৈতিকতা

৪.১২ সমরেশ বসু

৪.১২.১ *মহাকালের রথের ঘোড়া* : প্রতিবাদ

৪.১৩ নবারুণ ভট্টাচার্য

৪.১৩.১ *হারবার্ট:* অনিবার্য আত্মহত্যা

৪.১৩.২ *ভোগী* : সময় যেন নিঃশব্দ ঘাতক

৪.১৪ বিমল কর

৪.১৪.১ *অজ্ঞাতবাস* : অস্তিত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

৪.১৪.২ *দ্বীপ* : তবু কেন সুখী নই?

৪.১৫ শংকর

৪.১৫.১ *নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি :* বৌদ্ধিক চর্চা ও সাংসারিক জীবনের সংঘাত

৪.১৬ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

৪.১৬.১ *এখন আমার কোনো অসুখ নেই* : আধুনিক অস্পষ্টতা

৪.১৬.২ *কলেরার দিনগুলিতে প্রেম* : আত্মহত্যা বিষয়ে বহুমাত্রিক স্বর

৪.১৬.৩ *এখন জীবন অনেক বেশি সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা* : দায়ী কে?

৪.১৬.৪ *এসো নীপবনে* :খুন না আত্মহত্যা?

উপসংহার - আধুনিক আত্মহনন: অকারণ হনন, নাকি সমবেত হনন?

(পৃষ্ঠা ২১৫ - ২২৪)

গ্রন্থপঞ্জি (পৃষ্ঠা ২২৫ – ২৩৩)

ভূমিকা

আত্মহত্যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল চিরদিনের। অতীত কালে আত্মহনন নিয়ে তেমন তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসা না থাকলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু আত্মহত্যা নিয়ে পাড়ার মোড়ে, চায়ের টেবিলে, রকের আড্ডায় আলোচনা চালিয়ে গেছে। বর্তমানে যার জের টেনে আলোচনা এসে পৌঁছেছে ভার্চুয়াল আড্ডা তথা সোশ্যাল মিডিয়ার আলোচনাতেও। আত্মহত্যা ঘটে যাওয়ার পর সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু আলোচনার অন্যতম হল আত্মহত্যাকারীর ব্যক্তিগত জীবনে কোন পাওয়া, না-পাওয়া বা হতাশার কাহিনী খুঁজে বের করা, এবং যদি তেমন স্থূল কোন কারণ সেভাবে চোখে না পড়ে সেক্ষেত্রে নিজের নিজের মত করে, নিজের অভিজ্ঞতা ও শোনা গালগল্পের সঙ্গে কিছু কল্পনা মিশিয়ে নিয়ে একটি কাহিনী তৈরি করা হয়। আর যদি তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় কোন কালেকটিভ না-পাওয়ার কাহিনী তাহলে সেখানে আন্দোলন, প্রতি আন্দোলনেরও ঢেউ ওঠে। রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা যেভাবে ভারতবর্ষের যুব সমাজ, নিম্নবর্গীয় মানুষের হয়ে বলা কণ্ঠস্বরকে জোরদার করেছিল, নিম্নবর্গের উপর এখনো ঘটে চলা অন্যায়ের যে ছবি জনমানসে ফুটে উঠেছিল, অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের কাহিনী কিন্তু ঠিক তেমন প্রভাব ফেলে নি। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মনে যে তাৎক্ষণিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা হল বিস্ময়। আপাত দৃষ্টিতে সুখী, বিত্তবান, শিক্ষিত এই যুবকটির আত্মহত্যার কারণ খুঁজতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিল মধ্যবিত্তের চাওয়া-পাওয়ার ধারণা। আর তাই ঘটনাটি আসলে আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল জনমানস তথা সোশ্যাল মিডিয়া।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে আত্মহত্যার প্রতি নজর যায় সেই স্কুল বয়সেই, যখন মাঝে মাঝেই বাবামায়ের কাছে তিরস্কৃত হয়ে, পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পেয়ে কিংবা হৃদয় ভেঙে যাওয়া চেনা বন্ধুটি বলত আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সে সব ঘটনা আত্মহত্যার রূঢ় বাস্তবকে চেনায় নি তখনো। একবার এক প্রানোচ্ছল বন্ধুর আত্মহত্যার খবর পেয়ে মনে আছে যারপরনাই অবাক হয়েছিলাম। অমন ক্রমাগত আড্ডা মেরে চলা, সবসময় হালকা মেজাজে থাকা বন্ধুটি কেন আত্মহত্যা করেছে সেদিন জানতাম না, বুঝতেও পারি নি, অনেক পরে শুনেছিলাম বন্ধুটি অবসাদগ্রস্ত ছিল বহুদিন, চিকিৎসাও চলছিল। এভাবেই জীবনে চেনা বন্ধু, প্রিয় তারকা, স্বল্প পরিচিত বা প্রিয় লেখকের আত্মহত্যা বারবার ধাক্কা দিয়েছে। বন্ধুদের মধ্যে একটি আলোচনা প্রায়শই উঠে আসত। একদল বলত যে আত্মহত্যা করে সে ভীরু, পালানোর মনোভাব তার, আরেকদল বলত, না, আমি কখনো আত্মহত্যা করতে পারব না, অত সাহস নেই আমার। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম তাহলে আত্মহত্যা কে করে, যে দুঃসাহসী সে, না যে ভীরু সে?

আত্মহত্যাকারী অনেক সময়েই আত্মহত্যার বিপক্ষে সওয়াল করে, এটা তার সচেতন সিদ্ধান্ত, না কি মানসিক ভাবে সে নিজেও জানে না যে সে কখন আত্মহত্যায় উদ্যত হবে, তা বলা কঠিন। আত্মহত্যার সামাজিক দিকটি বুঝে নেওয়ার পাশাপাশি সাহিত্যে আত্মহত্যার বিবরণ ও বিবর্তনের একটি ক্রমচিত্র তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য ও সময়কে বুঝে নিতে চাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে আমি দেশ বিদেশে আত্মহত্যার ইতিহাস, আত্মহত্যা বিষয়ে নানা দার্শনিক, মনোবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনাকে কেন্দ্র করে বাংলা উপন্যাসের আত্মহত্যার ঘটনাগুলির প্রবণতা বুঝতে চেয়েছি। আত্মহত্যা সম্পর্কে সমাজ মানসে যেমন ক্রম বিবর্তন ঘটেছে

ঠিক তেমনই উনিশ বিশ শতকের বাংলা ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যে আত্মহত্যার রূপ বদলেছে। আত্মোৎসর্গের মহিমা, ব্যক্তিমানুষের চাহিদা, অপ্রাপ্তির ধারণাকে অতিক্রম করে সমাজ ও পারিপার্শ্বিকের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়েছে আত্মহত্যার ঘটনাগুলিতে।

প্রথম অধ্যায়ে (আত্মহত্যার ইতিহাস) প্রাচীন কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কবে আত্মহত্যার প্রচলন হয় সেই ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা করেছি। সেই অতীত কাল থেকেই আত্মহত্যার ব্যক্তিগত ও সামাজিক - এই দুই ভিন্ন মাত্রা ছিল। প্রাচীনতম আত্মহত্যার উল্লেখ কবে কোথায় পাওয়া যায় তাও দেখার চেষ্টা করেছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যাকে দেখার ধরন বদলেছে। কখনো আত্মহত্যাকারীকে আত্মহত্যার যথাযথ কারণ দেখাতে বলা হয়েছে, আবার একই সঙ্গে আত্মহত্যাকে সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে দাগিয়ে দিয়ে আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবারকেও যথেষ্ট সাজা দেওয়া হয়েছে। দেশ কাল ধর্ম সমাজ ভেদে আত্মহত্যা বিষয়ে ভাবনা ও তার ক্রম বিবর্তনকে পড়তে চেয়েছি আমরা। এমন একটা সময় এসেছে যখন চার্চ অবৈধ ও বৈধ এই দুই প্রকারের আত্মহত্যার কথা বলছে, আসলে আত্মহত্যাকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না তখন। পাশ্চাত্যে আত্মহত্যার ইতিহাসের পাশাপাশি আমরা মূলত এশিয়ার কিছু দেশের আত্মহত্যার কথা জেনেছি এবং বিভিন্ন ধর্মে তথা ধর্মগ্রন্থে আত্মহত্যা নিয়ে কী ধরনের বক্তব্য রাখা হচ্ছে তার কিছু নমুনা তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে আত্মহত্যার অতীত ইতিহাসকে খুঁজতে চেয়েছি এই অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা তুলে ধরেছি দেশ কাল ভেদে জনপ্রিয় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তথা জনপ্রিয় চরিত্রদের আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'আত্মহত্যার ধারণা: অতীত থেকে বর্তমান', সপ্তদশ শতকে ইউরোপে রেনেসাঁর সময় থেকে আত্মহত্যা বিষয়ে মনোভাব অনেকটাই বদলে যেতে থাকে,

ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিমানুষের ধারণার সম্প্রসারণের ফলে এই ভাবনা তৈরি হয় যে প্রত্যেকের ভাগ্য বা পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। এই সময় থেকে আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ধারণাও বদলাতে থাকে। আত্মহত্যায় শাস্তি, প্রায়শ্চিত্তের পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্যহীনতার কথাও আসে। মনোদর্শন ক্রমাগত আলোচনায় ঢুকে পড়ে।

আত্মহত্যাকে বোঝার জন্য আমরা প্রথমে মানুষের ব্যক্তিতার কথা বলেছি এবং বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে যে আত্মহত্যার গভীর সম্পর্ক আছে তা দেখাতে চেয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক, কান্ট, হেগেল, ফয়ারবাখ, মার্কস, ফ্রয়েড ও ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ভাবনাকে তুলে ধরতে চেয়েছি সংক্ষেপে। এরপর আমরা আত্মহত্যার ধারণাকে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছেন এমন কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিক ও মনোবিদের আলোচনা ও আত্মহত্যা বিষয়ে তাঁদের তত্ত্বকে আত্মস্থ করতে চেয়েছি । আলোচনা করেছি ডুর্খেইমের তত্ত্ব, এছাড়াও কার্ল মার্ক্স, মাসারিক, মেনিঙ্গারের বক্তব্যকে বিশদে পড়তে চেয়েছি আমরা। প্রসঙ্গক্রমে একবিংশ শতাব্দীর লেখক অ্যান্ড্রু সলোমনের বিষাদ ও আত্মহত্যার সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাও ঠাঁই পেয়েছে এই অধ্যায়ের আলোচনায়। গবেষণা করতে গিয়ে আমি বর্তমান সময়ের একজন সাইকোলজিস্ট ও একজন সাইক্রিয়াটিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি,আত্মহত্যা সম্পর্কে তাদের ধারণা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং সেই নাতিদীর্ঘ দুটি সাক্ষাত্‌কার সংযোজিত হয়েছে এই অধ্যায়ের শেষে।

তৃতীয় অধ্যায়ের (উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যার বিবরণ) একদম শুরুতে আমরা পৌরাণিক কাহিনী তথা রামায়ণ মহাভারতের নানা আত্মহত্যার ঘটনার উল্লেখ করেছি এবং পাশাপাশি মধ্যযুগের নানা সাহিত্যশাখায় আমরা আত্মহত্যার বিভিন্ন রূপ খুঁজেছি অতি সংক্ষেপে। এই আত্মহত্যাগুলি উল্লেখ করার মূল কারণ এই, যে পরবর্তী

ক্ষেত্রে বাংলা উপন্যাসের শুরুর পর্যায়ে এই আত্মহত্যার কয়েকটি রূপ বা প্রবণতা ফিরে ফিরে এসেছে।

উনিশ শতকে উপন্যাস তৈরি হয়েছে ব্যক্তিমানুষের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়েই, আধুনিকতার অপর পরিণাম আত্মহত্যা, মূলত উপন্যাসেই এইসময় কিছু আত্মহত্যার সম্ভাবনা তৈরি করেছেন লেখকেরা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিক, রমেশচন্দ্র দত্ত, দামোদর মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশররফ হোসেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখের নির্বাচিত উপন্যাসে কিভাবে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এসেছে এবং তা কতটা গল্পের খাতিরে,কতটা সমাজের দলিল হিসেবে উঠে এসেছে সেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি । কখনো কখনো পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত নানা আত্মহত্যার তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছি এই আত্মহত্যাগুলিকে। আমরা দেখেছি যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেই সর্বপ্রথম আত্মহত্যার পিছনে থাকা 'নিঃসঙ্গতা' নামক সমাজের প্রকৃত অসুখটি ধরা পড়েছে। যদিও আমাদের মনে হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে শুরু হওয়া এই আধুনিকতার যথাযথ উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারেন নি তাঁর সমকালীন ঔপন্যাসিকেরা। বারবার একই প্রবণতা ফিরে ফিরে এসেছে এই সময়ের উপন্যাসগুলিতে এবং সেই আত্মহত্যার অনুষঙ্গগুলিও কিছু সামাজিক তথা প্রচলিত মোটিফের ক্রমাগত পুনর্নির্মাণ ছাড়া আর কিছু নয়।

চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ 'বিশ শতকের উপন্যাসে আত্মহত্যা: আধুনিক মানুষের সংকট'-এ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আসে, উনিশ শতকের একদম শেষভাগে ও বিশ শতকের শুরুতে তাঁর উপন্যাসে অতি সামান্য কিছু আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এলেও তার মধ্যে বেশ কয়েকটি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধকে উপনিষদের

জীবনবোধের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আমরা বুঝতে চেয়েছি কেন আত্মহত্যাকে তিনি নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তার মধ্যেও তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসগুলিতে কোথাও আধুনিকতার কোনো লক্ষণ ফুটে উঠেছে নাকি কেবল উনিশ শতকীয় ভাবনার প্রতিফলন হয়ে উঠেছে তা খতিয়ে দেখেছি। ছোটগল্প আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র নয়, তাই আমরা কেবল একটি-দুটি গল্পের উল্লেখ করে বলতে চেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে বরং আধুনিক মানুষের সংকট ও সেই সঙ্গে যুক্ত কিছু আত্মহত্যার প্রসঙ্গ বহু বার এসেছে।

রবীন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা প্রভাতকুমারের লেখায় আধুনিকতার সেই সংকট আমরা খুঁজে পাইনি বরং জগদীশ গুপ্তের লেখায় আমরা আত্মহত্যার কারণ হিসেবে 'আত্মনিগ্রহ'-এর মত নিছক আধুনিক ও স্বার্থপর একটি শব্দ খুঁজে পাচ্ছি। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের রচনায় বেশ কিছু আত্মহত্যার নিদর্শন আমরা পেয়েছি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আত্মহত্যায় সমাজের ভূমিকা স্পষ্টতর হয়েছে। ডুর্খেইম Anomic আত্মহত্যার কারণ হিসেবে অর্থৈনৈতিক Anomy-র সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের Anomy-র কথাও বলেছিলেন।মনোজ বসু, বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দোপাধ্যায় ,বিমল কর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, শংকর, নবারুণ ভট্টাচার্য ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়দের নির্বাচিত কিছু উপন্যাস অনুকরণে আত্মহত্যার কারণ হিসেবে আমরা সময়ের অস্থিরতা তথা সমাজের ব্যর্থতার ভূমিকা খুজেছি। এই পর্বের লেখকেরা সচেতনভাবেই আত্মহত্যাকে কোন নির্দিষ্ট কারণ দিয়ে বেঁধে ফেলার ছককে আর মানতে চাইলেন না। কোনোরকম আড়াল না রেখেই তারা নগ্নভাবে আত্মহত্যার কারণরূপে বিচ্ছিন্নতাকে বা একাকিত্বের বোধকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চাইলেন। কেউ

কেউ কোন ব্যাখ্যাই করলেন না। এক অতি স্বাভাবিক সত্য হিসেবে আত্মহত্যার কথা বলে গেলেন অনায়াসে। এই অধ্যায়ের লেখকদের রচনায় যে আধুনিকতার সন্ধান পাই তা যে সময়ের ফসল এবং আধুনিক মানুষের সংকট তা বলাই বাহুল্য। আত্মহত্যাগুলিও হয়ে উঠল আধুনিক ও 'অকারণ' আত্মহত্যা।

উপসংহারে (আধুনিক আত্মহনন: অকারণ হনন, নাকি সমবেত হনন?) আত্মহত্যা বিষয়ে সমাজ ও উপন্যাসে প্রবণতার ও ধারণার যে বিবর্তন মাথায় রেখেই বলতে চেয়েছি যে 'অকারণ' আত্মহত্যা বলে আমরা কি দাগিয়ে দিচ্ছিনা সেইসব আত্মহত্যাকেই যার পেছনে আসলে সমাজ, রাজনীতি বা রাষ্ট্রের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।ভারতবর্ষের মত দেশে যখন প্রতিদিন হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে,চুণী কোটাল বা রোহিত ভেমুলাদের বেঁচে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না, তখন কেবল মনোবিকলন বা একাকিত্বের কথা বলে 'অকারণ' আত্মহত্যা খোঁজা কি খানিকটা বিলাসিতা নয়।সাহিত্য তো সমাজেরই ছবি, চুণী কোটালকে নিয়েই তো মহাশ্বেতা দেবী 'ব্যাধখণ্ড' লিখবেন।আমরা তাই সমাজ কর্তৃক আত্মহত্যার কথা বলতে চেয়েছি, আত্মহত্যাকে 'সমবেত হনন' হিসাবে দেখতে চেয়েছি যেখানে কেবল আত্মহত্যাকারী নয়, দায়ী সকলেই। গবেষণা কালে উনিশ বিশ শতকের আত্মহত্যা, সময়ের প্রবণতা বুঝতে যে যে উপন্যাস নিয়ে কাজ করেছি, তার বাইরেও অনেক অনেক উপন্যাস বাকি রয়ে গেল নিশ্চয়, ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরো পড়াশোনা ও গবেষণা করার ইচ্ছে রইল।

প্রথম অধ্যায়

আত্মহত্যার ইতিহাস

আত্মহত্যার ইতিহাস প্রাচীন, সভ্যতার জন্মের আগেই তথাকথিত অসভ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মহত্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে এডওয়ার্ড ফিলিপের 'নিউ ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ডস' বইতে প্রথম 'সুইসাইড' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও আত্মহত্যার ইতিহাস আরো বহু প্রাচীন।[i] এই প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে 'Suicide' শব্দের আবির্ভাব বিষয়ে ভিন্ন মতামত পাওয়া যায় Oxford English Dictionary-তে । এটি অনুযায়ী ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ল্যাটিন শব্দ 'Suicidium' থেকে ইংরাজি 'Suicide' শব্দের উত্পত্তি।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয় উপজাতি, বেদুইন, ককেশাস প্রজাতি, ভারতীয়, মেলানেশিয়ান, মাইক্রোনেশিয়ান,পলিনেশিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান- এই সকল প্রাচীন উপজাতির মধ্যে আত্মহত্যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে। ট্রবিয়ান দ্বীপের আদিবাসীরা একটি উঁচু তাল গাছের মাথায় উঠে ঝাঁপ মারতো। অন্যদিকে গ্লোব মাছের বিষাক্ত গলব্লাডারের মারাত্মক বিষ ছিল তাদের আত্মহত্যার অন্য একটি উপায়। আন্দামানের আদিবাসী এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদিও তেমন প্রচলনের ইতিহাস গবেষকরা খুঁজে পাননি ।আত্মহত্যার ভাবনার সঙ্গে এক ধরনের ট্যাবু জড়িয়েছিল। মন্দ আত্মা শরীরে ঢুকলে তা আত্মহত্যার মতো ঘটনার সূত্রপাত ঘটায় বলে মনে করা হতো।

সে সময়গুলিতেও আত্মহত্যার ব্যক্তিগত ও সামাজিক - এই দুই ভিন্ন মাত্রা ছিল। এস্কিমোদের মধ্যে যেমন বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষটি খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম এবং গোষ্ঠীর

অপরের কাছে বোঝা স্বরূপ হয়ে পড়লে নিজেই আত্মহননের পথ বেছে নিত। এছাড়াও রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আত্মহত্যার শরণাপন্ন হওয়াও প্রাচীন জনগোষ্ঠীগুলোর একটি ধরন ছিল। একজন ট্রবিয়্যন্ডারকে কোন কারণে দোষী সাব্যস্ত করা হলে সে তাল গাছের মাথায় উঠে দোষারোপকারী ব্যক্তির নামোচ্চারণ করে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করতো ।

ব্যক্তিগত আত্মহত্যা বলতে মূলত মর্যাদা রক্ষার্থে, যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পেতে, শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে, প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তি কে হারিয়ে, পবিত্রতা রক্ষার্থে আত্মহত্যার বর্ণনা পাওয়া যায়।

১.১ প্রাচীনতম আত্মহত্যার নিদর্শন

প্রাচীনতম আত্মহত্যার বর্ণনা যা পাই তা হল একটি মিশরীয় প্যাপিরাস যার নাম 'এ ডিসপিউট ওভার সুইসাইড' (মতান্তরে 'দ্য ডায়ালগ অফ এ মিস্যানথ্রোপ উইথ হিজ ওউন সোল')। এর রচয়িতার কোন নাম পাওয়া যায় না। মনে করা হয় ২২৮৩ থেকে ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়কালের মধ্যে কোন মিশরীয় এটি রচনা করেন। এই প্যাপিরাসটিতে একজন মানুষ এবং তার সোল, অর্থাৎ আত্মা কথোপকথনে রত। সেখানে ক্লান্ত, হেরে যাওয়া মানুষটি যখন তার আত্মাকে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার কথা বলে, তখন এই প্রশ্ন ওঠে যে মানুষের কি আত্মহননের অধিকার আছে আদৌ? আত্মহত্যাকে নিয়ে সমাজ কী ভাবে তারও একটা দিক ফুটে ওঠে এই কথোপকথনে; ভয় পায় যে মানুষের আত্মহননে হয়তো তার প্রকৃত উপায় সৎকার হবে না, মুক্তি পাবে না, যথোচিত সম্মান পাবে না সে। একে অপরকে আত্মহত্যার পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত জানায় তারা এই কথোপকথনে। আত্মা যখন বলতে চায় আত্মহত্যাকারীর জন্য কোন

সামাজিক সম্মান অপেক্ষা করে না, তখন আত্মহত্যার স্বপক্ষে মানুষটি বলে যে সামাজিক অসম্মানের, হেরে যাওয়ার বিরুদ্ধে আত্মহনন আসলে প্রতিশোধ এবং ফ্যান্টাসি ও বটে।[ii]

ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত সাতটি বিধ্বংসী ঘটনার মধ্যে অন্যতম আহিতোফেলের (Ahitophel) ঘটনা; রাজা ডেভিডের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী আহিতোফেল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। (II Samuel 17:23)

অপর একটি আত্মহত্যারও বর্ণনা পাওয়া যায় টেস্টামেন্টে। ইজরায়েলের প্রথম রাজা স্যল, ফিলিস্তাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রাণপণ যুদ্ধের পর যখন তাঁর তিন পুত্রের মৃত্যু হয় এবং তিনিও ভয়ানকভাবে জখম হন, তিনি আত্মহত্যা করেন। আর মৃত্যু চাক্ষুষ করে তার অস্ত্রবহনকারীরাও প্রাণ ত্যাগ করেন। শত্রুর হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ও ঈশ্বরের অবমাননার সম্ভাবনা রুখতে স্যল আত্মহত্যা করেন। (I Samuel 31:4; II Samuel 1:6; I Chronicles 10:4)

জেরুজালেমের দেশভক্ত বৃদ্ধ রাজিস শত্রুর হাত থেকে প্রানরক্ষার্থে আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করেন। (II Maccabees 14:46)

নিউ টেস্টামেন্টে যিশুখ্রিস্টের শিষ্য জুডাস তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর গলায় দড়ি দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।

মিশরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষটিকে আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া হতো, পরবর্তীতে রোমানদের মধ্যেও এই প্রথার প্রচলন ঘটে।

ইহুদিদের মধ্যে আত্মহত্যার নিয়মিত প্রচলন দেখা যায় না, কারণ হিসেবে বলা যায় যে জীবনের সঙ্গে ভীষণ ভাবে সংযুক্ত ইহুদিদের জীবন ও জগতের প্রতি ধারণা অত্যন্ত সদর্থক এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী এই ইহুদিরা মনে করত ঈশ্বরের দেওয়া জীবনকে অস্বীকার করে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া আসলে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা।

ইহুদিদের মধ্যে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ ছিল। ইহুদি ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন শেষ করার অধিকার একমাত্র ঈশ্বরের। কেবলমাত্র যখন কেউ হত্যা, যৌন ব্যাভিচার প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী তখন আত্মহত্যা মান্যতা পেত। আত্মহত্যার অর্থ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারান। সুতরাং যুদ্ধে পরাজিত, বন্দী, বিশ্বাসঘাতকতা এবং পাপীদের জন্য কেবল আত্মহত্যা মান্যতা প্রাপ্ত ছিল ।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তোরাতে আত্মহত্যাকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বলা হয়নি । এখানে স্যলের আত্মহত্যাকে বৃহত্তর স্বার্থে (ঈশ্বরের অপমান অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়) হিসেবে দেখানো হয়েছে ।

ইহুদী ধর্মে আত্মহননকারীর প্রতি কোন রূপ সম্মান, এমনকি বিশেষ ক্ষেত্রে পোশাকও দেওয়া হতো না । তবে যেহেতু মনে করা হত আত্মহত্যা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃতভাবে করা ভুল, তাই জীবিত ব্যক্তির সম্মানার্থে তার দেহ সমাধিস্থ করার সময় সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা হতো ।

যুদ্ধের সময় আত্মহনন যদিও প্রাচীন ইহুদিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রোমান সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা পেতে যোসেফাসের আত্মহননের কাহিনী সুপ্রচলিত।এই যোসেফাসের কাহিনীতেই ইহুদি সৈন্যদের মাস সুইসাইড বা গণ আত্মহত্যার কথা জানা যায় ।

খ্রিস্টপূর্ব ৭৪-এ রোমান সৈন্যদের কাছে পরাজয়ের সম্ভাবনা দৃঢ় হলে তারা পূর্ব পরিকল্পিত প্রতিজ্ঞার কথা মনে করে। রোমান সৈন্যদের অধিকৃত ক্রীতদাসে পরিণত হওয়ার পরিবর্তে তারা আত্মহননের সিদ্ধান্ত নেয়। সৈন্যবাহিনী প্রথমে নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করে এবং পরবর্তীকালে আত্মহত্যা করে। এই সময় প্রায় ৯৬০ জনের মৃত্যুর হিসেব পাওয়া যায়।

১.২ গ্রিক – রোমান সমাজে আত্মহত্যা

রোমানদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রচলন নিয়ে আলোচনার আগে একটি তথ্য তুলে ধরি। 'Suicide' শব্দটি মনে করা হয় ল্যাটিন ভাষা থেকে তৈরি। যদিও একটিমাত্র শব্দ থেকে এটির উৎপত্তি নয়, মনে করা হয় যে রোমানদের মধ্যে প্রচলিত কিছু শব্দের মিশ্রণেই তৈরি হয়েছে এটি। sibi mortem consciscere (to procure his death), vim sibi inferre (to cause violence to himself) বা sua manu vcondere(to fall by his own hand) – এরূপ শব্দবন্ধ গুলিকেই 'Suicide' শব্দের আদিরূপ বলে মনে করা হয়। গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে আত্মহত্যার ধারণা বারবার বদলেছে। দার্শনিকদের মধ্যেও এই নিয়ে মতভেদ ঘটেছে। গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে মর্যাদার ধারণা অত্যন্ত উঁচু এবং আত্মহত্যা তাদের কাছে ছিল মর্যাদাহীনতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি উপায়। বন্দিত্ব এড়াতে এবং আত্মসম্মান রক্ষার্থে গ্রিক যুদ্ধার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রচলন ছিল। ৩৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পি ডিসিয়াস মুস (P. Decius Mus), ২৯৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তারই কনিষ্ঠ পুত্রের আত্মহত্যার গৌরবোজ্জল কাহিনী পাওয়া যায়। যুদ্ধে বীরের ন্যায় আত্মহননের ইতিহাসের পাশাপাশি প্রিয় জনের মৃত্যুতে আত্মহত্যার ঘটনাও খুঁজে পাওয়া

যায়। কার্থেজের রানী ডিডো (Dido), এনাসের (Aeneas) প্রেমে মুগ্ধ হন এবং তার বিরহে আত্মহত্যা করেন। এছাড়াও পুত্রের মৃত্যু কল্পনা করে পিতা এগাস(Aegeus) সমুদ্রে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করেন।

গ্রিক ইতিহাসে বেশ কিছু গণ আত্মহত্যার চিত্র পাওয়া যায় । ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ পর্যন্ত সময়কাল আসলে ছিল নিরাশা ও বৈরাগ্যের সময় । এই সময় বহু দার্শনিক যেমন থিওগনিস অব মেগারা (Theognis of Megara), সফোক্লিস, ইউরিপিডিস, হেরোডোটাস, ডেমোক্রিটাস এরকম অনেকেই আত্মহত্যার পক্ষে সওয়াল করেন। এই সময় পর্বেই (খ্রিস্টপূর্ব ৪০৩ অব্দে) বিষ হিসেবে হেমলক পানের প্রচলন ঘটে। মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত সক্রেটিস যদিও দ্রুত মৃত্যুর উপায় হিসেবে হেমলককে বেছে নিয়েছিলেন, কিন্তু জীবৎকালে তিনি আত্মহত্যাকে সমর্থন করেননি বরং ঈশ্বরের বিনা অনুমতিতে জীবন শেষ করাকে তিনি অনুচিত মনে করেছেন। সেনেকা জীবনের নানা অসহনীয়তাকে স্বীকার করে বলেছেন, মৃত্যুই একমাত্র উপায় এসব সমস্যা থেকে মুক্তির। তিনি বলেন -

“Does life please go? Live on. Does it not? Go from whence you came.”[iii]

একই কথা বলেছেন গ্রিক দার্শনিক এপিকাটেটাসও । কিন্তু আত্মহত্যার জন্য যথেষ্ট কারণ থাকার সপক্ষে কথা বলেন তিনি।

রোমান প্রশাসনে আত্মহত্যাকে অপরাধ মনে করা হতো, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি আত্মহত্যার স্বপক্ষে যদি যথেষ্ট কারণ দেখাতে পারত, প্রশাসনের তরফে তাকে

বিনামূল্যে হেমলক দান করা হতো। আত্মহত্যা রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমনকি সম্পূর্ণ পরিবার একসঙ্গে শোকসম্মুখে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে- এমন ঘটনাও অপ্রতুল ছিলনা। আত্মহত্যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ রুখে দিতে পারতো, এমনকি দোষী বা অপরাধীদের মৃতদেহ যেমন স্বাভাবিক উপায় কবর দেওয়া হতো না, আত্মহত্যাকারীর ক্ষেত্রে সে ধরনের কোনো নিয়ম ছিল না। আত্মহত্যাকারীর পরিবার পরবর্তী সময় আইনের মুখোমুখি হলেও, তাকে নিজের দোষহীনতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হতো।

রোমান সৈন্যদের আত্মহত্যার ক্ষেত্রে যদি তা যুদ্ধের প্রতি ভীতির কারণবশত হয়ে থাকে, তাকে দোষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, শারীরিক অসুস্থতার কারণে সৈন্যের আত্মহত্যা সেখানে গ্রহণযোগ্য ছিল। বহু ক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি দয়াস্বরূপ তাকে আত্মহত্যার অধিকার প্রদান করা হতো। দার্শনিক সেনেকার (Seneca) প্রতি নেরো আত্মহত্যার আদেশ দেন। Zeno, যিনি মৃত্যুকে বা বলা ভাল আত্মহত্যাকে এক অদ্ভুত বৈরাগ্য হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন, তিনি বার্ধক্যজনিত কষ্টের হাত থেকে নিস্তার পেতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

১.৩ খ্রিস্টধর্মে আত্মহত্যা বিষয়ক ধারণার বিবর্তন

রোমান সাম্রাজ্য আত্মহত্যাকে খানিকটা সমর্থন করেছিল একথা আমরা বলতেই পারি। মূলত খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব যখন সেখানে পড়তে শুরু করে তখনো তাদের কাছে আত্মহত্যার ধারণা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী অবধি চার্চ আত্মহত্যাকারীর পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করত, এমন কি আত্মহত্যাকে একসময়

লোভনীয় বলে মনে করা হতো। কারণ খ্রিস্টধর্মের শুরুতে জীবনের পরিবর্তে মৃত্যু পরবর্তী জগতের প্রতি আকর্ষণ ছিল প্রধান। জীবনের নানা প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যার প্রতি আকর্ষণ ছিল খ্রিস্টীয় সভ্যতার শুরুর প্রধান লক্ষণ।

সেন্ট অগাস্টিন, ৪৫২ খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করেন যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার নেই কাউকে হত্যা করার এমনকি নিজেকে হত্যাও অপরাধ রূপে স্বীকৃত হয়। আত্মহত্যাকারী কে শয়তানের আদেশ পালনকারী রূপে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য নানা অপরাধের তুলনায় আত্মহত্যাকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অপরাধ রূপে স্বীকার করে নেয় চার্চ।

৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রাগা (Braga) পরিষদের নিয়মানুসারে আত্মহত্যাকারী এবং তার পরিবারকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে আত্মহত্যা পাপ বলে স্বীকৃত হয়। আত্মহত্যাকারীর স্বাভাবিক সমাধির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

সপ্তম শতাব্দীতে এমন অনেক ঘটনার কথা জানা যায় যেখানে আত্মহত্যায় উদ্যত বা অসফল আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটানোর ফলে সেই ব্যক্তিকে চার্চ-এর পক্ষ থেকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। কিছু সময় পরে চার্চের সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। আত্মহত্যাকারীর মৃত্যুর পর তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু পরবর্তী ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী নাগাদ আত্মহত্যা বিষয়ক আইন আবারো প্রবল কড়া হয়ে ওঠে। তাদের সমাধিস্থ করার অধিকার কেড়ে নেওয়ায় প্রতিবাদ তৈরী হয়। সেই সময় মৃতদেহের আত্মার যত্রতত্র ভ্রমণ আটকাতে আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহকে রাস্তার মোড়ে সমাধিস্থ করা হয় এবং সেই মৃতদেহের বুকে একটি কাঠ আটকে দেওয়া হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ফ্রান্সে এই ধরনের মৃত্যুতে আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহকে রাস্তায় উল্টো করে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হত। ইংল্যান্ডে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আত্মহত্যাকারীর মৃতদেহ বাজেয়াপ্ত করা হতো। পোল্যান্ডে আত্মহত্যার শাস্তি স্বরূপ মৃতদেহটি দরজা দিয়ে নয়, বরং জানলা দিয়ে বা দেয়াল ভেঙে বের করে নেওয়া হত।

অ্যালবাইজেনসিয়ান ক্রুসেড (Albigensian crusade) ছিল মূলত প্রায় কুড়ি বছর ধরে চলা একটি ধর্মযুদ্ধ, যা ছিল পোপ তথা ক্রিশ্চিয়নিটির বিরুদ্ধে। তারা বিশ্বাস করত Catharic heresy-তে যা ছিল তা একটি দ্বৈত ধর্মবিশ্বাস- ঈশ্বর এবং শয়তান উভয়ের প্রতি। এটি ইউরোপের বিভিন্ন অংশে দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল। Abigenses-রা আত্মহত্যাকে আকর্ষণীয় মনে করত কারণ তারা জাগতিক নানা বিষয়, যেমন- ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বিবাহের মত প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করতো। তারা মূলত আগুনে পুড়ে বা উপবাসের মাধ্যমে আত্মহননের পথ বেছে নিত।

রাশিয়ার রাসকলনিকিরা (Raskolniki) সপ্তম শতাব্দীতে রাশিয়ার পুরনো চার্চের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। তাদের মধ্যে গণআত্মহত্যার মত ঘটনার প্রাচুর্য দেখা যায়। ভরা গির্জায় কিংবা একদম শুনশান মনাস্ট্রিতে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটাতো তারা।

অন্যদিকে একাদশ শতাব্দীর পরে চার্চের যাজকদের জন্য যখন কৌমার্য রক্ষা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে তখন বহু যাজকের স্ত্রীরা আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস আত্মহত্যার বিরুদ্ধে তিনটি বক্তব্য রাখেন।

১. আত্মহত্যা মানুষের সাধারণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়।
২. মানুষের কোন অধিকার নেই সমাজকে তার উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করার।

৩. মানুষের প্রাণ ঈশ্বরের নির্মাণ, সুতরাং মানুষের নয়,ঈশ্বরেরই একমাত্র অধিকার তার জীবন এবং মৃত্যুতে।

সেন্ট অগাস্টিন থেকে সেন্ট থমাস পর্যন্ত আত্মহত্যা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত স্থাপিত, প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ক্যাথলিক চার্চ গুলিতে আত্মহত্যার ভাবনা নিয়ে আলোচনা জারি থেকেছে। বর্তমানে চার্চগুলি দুধরনের আত্মহননের কথা স্বীকার করে –

১. অবৈধ আত্মহনন

২. বৈধ আত্মত্যাগ

ব্যক্তিস্বার্থে আত্মহত্যা অবৈধ,কেবলমাত্র যদি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোন যোদ্ধা তার জীবন ত্যাগ করে, যদি তার পেছনে কোন নীতি বা বিশ্বাস কাজ করে তখন তা সমর্থনযোগ্য। ব্যক্তির ইচ্ছায় মৃত্যু নয় বরং কোন বিচক্ষণ কাজের পরিণাম রূপে মৃত্যুকে বেছে নেওয়া হয় তখন তা বৈধ। বর্তমানে মনে করা হয় যে কোন শারীরিক বা মানসিক দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির ফলে ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্য হারায় এবং আত্মহত্যার মত ঘটনা ঘটায় সুতরাং তা পাপ বলে স্বীকৃত হবে না।

১.৪ প্রাচ্যে আত্মহত্যার ধারণা ও ইতিহাসের বিবর্তন

ইউরোপে আত্মহত্যার নানা নিদর্শন খুঁজে দেখার পাশাপাশি পাশ্চাত্যের নানা দেশ, জাতি ধর্ম আত্মহত্যাকে কিভাবে গ্রহণ বা বর্জন করেছেন কিংবা তার সমালোচনা করেছেন তা জানলাম। ইউরোপে এক সময় আত্মহত্যাকে পাপ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী ক্ষেত্রে সমাজের অনুষঙ্গ যুক্ত হওয়ার পর এটিকে সামাজিক অসুখ বলে মনে করেছেন

কেউ কেউ কিংবা আত্মহত্যাকারীর মানসিক স্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রাচ্যের দেশগুলিতে আত্মহত্যার কোন নিদর্শন আছে কিনা তা খুঁজে দেখব এইবার এবং আত্মহত্যাকে তারা কিভাবে বিবৃত করেছেন সে ইতিহাস ও তার বিবর্তনকেও পড়ার চেষ্টা করব।

চীন দেশে আত্মহত্যার ঘটনা আলাদা করে কোন উল্লেখের দাবি রাখে নি। নিত্যদিনের জীবনের একটি অংশ হিসেবে আত্মহত্যা ছিল বহুল প্রচলিত কিন্তু তা নিয়ে বৌদ্ধিক কোন আলোচনা গড়ে ওঠেনি সেখানে। জাপানের আত্মহত্যার ইতিহাস খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। জাপানের যোদ্ধাদের ভুল বা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে কিংবা নিজেকে অসম্মানের হাত থেকে মুক্তি দিতে বা নিজের দেশ বা ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য আত্মহত্যাই ছিল সেখানে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পথ।

জাপানে প্রচলিত এই আত্মহত্যাকে বলা হত হারাকিরি/সেপুকু (Seppuku)। এই সেপুকু কথাটি তৈরি হয়েছে 'সেৎসু'(setsu) ও 'পুকু'(puku) এই দুই শব্দের সংযোগে। 'সেৎসু' কথাটির অর্থ মাঝ বরাবর কাটা এবং 'পুকু' শব্দের অর্থ পেট। সেপুকু ও হারাকিরি আসলে একই পদ্ধতি।

--"This is commonly pointed out that Hara Kiri is a vulgarism but this is a misunderstanding. Hara Kiri is a Japanese reading or Kun-yomi of the characters; As it became customary who prefer Chinese readings in official announcements only the term Seppuku was ever used in writing, so Hara Kiri is a spoken term but only to commoners and

seppuku a written term, but spoken amongst higher classes for the same act."[iv]

১১৮০ খ্রিস্টাব্দে উজির যুদ্ধে মিনামোতো নো ইয়ো সিমাসা (Minamoto no Yosi masa) সবচেয়ে প্রথম সেপুকু প্রদর্শন করেন।[v]

এরপর থেকে এটি জাপানি সামুরাইদের জীবনের একটি প্রথায় পরিণত হয়। শত্রুর হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে বা তাদের অত্যাচারের থেকে রক্ষা পেতে এই প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। অনেক সময় সামন্তপ্রভুদের নির্দেশেও সামুরাইরা ওই প্রথা পালন করতেন। সামুরাইদের সম্মান প্রদর্শন করতে সাধারণ মৃত্যুর বদলে এই প্রথা বেছে নেওয়া হত ।

মূলত সপ্তদশ শতাব্দীতে সেপুকু একটি বিশিষ্ট রূপ পায়। মূলত তিন রকম অস্ত্রের মাধ্যমে এই প্রথা পালিত হতো। তাচি (Tachi) অর্থাৎ বড় তলোয়ার, ওয়াকিজাসি(Waki zashi) অর্থাৎ ছোট তলোয়ার এবং তান্টো (Tanto) অর্থাৎ ছুরিকার দ্বারা পেটের মাঝ বরাবর অনুভূমিকভাবে কেটে এই প্রথা পালন করা হত। ১৬০০খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দ, এই সময় কালেই সেপুকু জনসাধারণের সামনে অনুষ্ঠিত হত, যুদ্ধক্ষেত্রে সামুরাইকে স্নান করিয়ে, সাদা পোশাক পরিয়ে,বিশেষ আসনে বসিয়ে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হত। একটি মৃত্যু বিষয়ক কবিতা লেখার পর সামুরাই তার কাইশাকুনিন(Kaishakunin)-এর সামনে বসে, সাদা পোশাকটি খুলে পেটটি বাম দিক থেকে ডানদিকে কেটে ফেলত। কাইশাকুনিনের অনুপস্থিতিতে সে অনেক সময় ছুরিটি

নিজের গলায় স্থাপন করত। বৃদ্ধ, ছুরিকা ব্যবহারে অসক্ষম সামুরাই কিংবা দুষ্টু সামুরাইয়ের ক্ষেত্রে অপর একজন ছুরিকাটি ব্যবহার করত।

সেপুকুর একটি সামন্ততান্ত্রিক রূপের প্রচলনের কথা জানতে পারা যায় যার নাম ছিল কানশি(Kanshi)। সেখানে রাজার আদেশের বিরোধিতা করার শাস্তি হিসেবে অংশটি আনুভূমিকভাবে কাটার পর তাতে ব্যান্ডেজ করে রাজার সম্মুখে আনা হত এবং রাজার সামনে পুনরায় সেই ক্ষতস্থানটি উন্মুক্ত করা হত।

এছাড়াও জাপানে অপর এক প্রকার আত্মহত্যার বিবরণ পাওয়া যায়। মহিলারা ধর্ষণের কবল থেকে রক্ষা পেতে আত্মহত্যা করলে তাকে বলা হত 'জিগাই'(Jigai)। পরবর্তী ক্ষেত্রে আধুনিক শব্দ 'জিসাৎসু' ব্যবহৃত হত মূলত সামুরাইদের স্ত্রীদের আত্মহত্যাকে বোঝাতে।

১.৫ ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা বিষয়ক ধারণা

ইসলাম ধর্মে নির্দোষকে হত্যা ও আত্মহত্যা সমানভাবে নিষিদ্ধ। কোরানে বলা হয়েছে যে আমাদের জীবনের মালিক আমরা নই, সুতরাং তা ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকারও আমাদের নেই। কেবলমাত্র আল্লাই আমাদের জীবনদান করেন সুতরাং 'আত্মা'কে হত্যার অধিকারও কেবল তাঁর। আত্মহত্যা আসলে ঈশ্বরের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। জীবন অত্যন্ত পবিত্র সুতরাং তাকে সম্মান জানানো আমাদের কর্তব্য। কোরানের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১৫২ নং আয়াতে ঈশ্বর বলছেন - " তাঁহার সঙ্গে কোন বস্তুকে অংশী নির্ধারণ করিও না ও পিতামাতার প্রতি সদাচারণ করিও এবং দরিদ্রতা প্রযুক্ত আপন সন্তানদিগকে বধ করিও না; আমি তোমাদিগকে ও তাহাদিগকে জীবিকা দান করিতেছি; এবং যাহা প্রকাশ্যে

কুক্রিয়া ও যাহা গুপ্ত তাহার নিকটবর্তী হইও না, ন্যায়ের অনুরোধ ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিও না; "

এছাড়া কোরানের বহু আয়াতে সরাসরি আত্মহত্যা বিরোধী অনেক বক্তব্য পাওয়া যায়, যেমন চতুর্থ অধ্যায়ে ২৯-৩০ সংখ্যক আয়াতে পাই - "হে বিশ্বাসিগণ, তোমাদের পরস্পর সম্মতিক্রমে বাণিজ্য হওয়া ব্যতিরেকে তোমরা আপনাদের ধন অন্যায়রূপে পরস্পরের মধ্যে ভোগ করিও না, এবং আপনাদের জীবনকে বধ করিও না,নিশ্চয় ঈশ্বর তোমাদের প্রতি দয়াবান হন। " --- অর্থাৎ পাপকাজ করে বা অবৈধ বস্তু ভোগ করে নিজের জীবন নষ্ট কোরো না। নিজেকে বা প্রিয়জনকে মৃত্যুজনক অবস্থানে স্থাপন কোরো না। যা তোমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন কোন কাজ কোরো না।

হাদিশেও আত্মহত্যাকে চরম পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারি, দ্বিতীয় খন্ড, ২৩ সংখ্যক বইয়ের ৪৪৫ সংখ্যক সূত্রে নবীজী বলা একটি গল্প আছে। গল্পে নবীজী বলছেন যে এক আহত ব্যক্তি যন্ত্রণার কারণে আত্মহত্যা করলে ঈশ্বর বলেন যে আমার দাস তাড়াহুড়োয় আত্মহত্যার মত কাজ নিজের দায়িত্বে করেছে সুতরাং আমি তার স্বর্গে যাওয়ার অধিকার কেড়ে নিলাম।

বুখারি,অষ্টম খন্ড, ৭৩ সংখ্যক বইয়ের ৭৩ সংখ্যক সূত্রে বলা আছে যে কেউ যদি জাগতিক কারণে আত্মহত্যা করে তাহলে পুনর্জীবন লাভের দিন তাকে অত্যাচারিত হতে হবে।

বুখারি চতুর্থ খন্ডে,৫২ সংখ্যক বইয়ের ৫৩ সংখ্যক সূত্রে কেবলমাত্র ধর্মযুদ্ধের যোদ্ধাদের আত্মত্যাগকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ধর্মযোদ্ধা মৃত্যুর পর চাইলে আবার

পৃথিবীতে ফেরত আসতে পারে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধর্মরক্ষার্থে পুনরায় প্রাণত্যাগ করতে পারে। তাদের জন্নতে প্রবেশাধিকারের কথাও বলা হয়েছে।

হিন্দুদের মধ্যে আত্মহত্যাকে তখনই মেনে নেওয়া হত, যখন কোন ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ জীবন যাপন করে নিয়েছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মে যে নির্বাণ, মোক্ষ, কৈবল্য, সর্বদুঃখশান্তি বা মুক্তির কথা বলে তাকে আত্মহত্যা বলা যায় কি না, তা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। আমরা এবার এই ধর্ম ও আত্মহত্যা বিষয়ে তাদের মনোভাবকে বোঝার চেষ্টা করব।

১.৬ বৌদ্ধ ধর্মে আত্মহত্যার ধারণা

বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণকে জাগতিক ভাষার দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় বলে ধর্মপাসকরা মনে করেন। কারণ এটি একটি অলৌকিক বা অতিজাগতিক অবস্থান। সমস্ত দুঃখ থেকে বিমুক্তির অবস্থা। নির্বাণ শব্দটি (পালিতে নিব্বান) নি-বান/বান শব্দের সমন্বয়ে তৈরি। বান শব্দের অর্থ তৃষ্ণা। যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে জন্মান্তরের তৃষ্ণা বন্ধন ছিন্ন হয়, তাই হল নির্বাণ বা নিব্বান। নির্বাণকে বারবার একটি ধ্রুব অবস্থা বলেছেন বৌদ্ধ দার্শনিকরা। এই ধ্রুব অবস্থানকে মৃত্যু পরবর্তী ধ্রুব অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাওয়া যায় কি? মহাকবি অশ্বঘোষ প্রদীপের চির নির্বাপনের সঙ্গে নির্বাণের তুলনা করেন।

দীপো যথা নিবৃতিমভ্যুপেতো নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরীক্ষম।

দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম ।।

এবং কৃতী নিবৃতিংভ্যুপেতো নৈবাবনিং গন্থতি নান্তরীক্ষম।

দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশনং কাঞ্চিৎ ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম ।। [vi]

প্রদীপ নিভে গেলে যেমন পৃথিবী বা অন্তরীক্ষের কোথাও তা যায় না, দিগ্বিদিক কোথাও যায় না তেমনি মুমূর্ষু ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করলে পৃথিবী অন্তরীক্ষের কোথাও যায়না, কোন দিকেই যায় না, মনের দুঃখ ক্ষয় হলে সে চিরশান্তি লাভ করে।

নির্বাণের এই ধারণাকে মৃত্যু পরবর্তী জগত ভাবা ঠিক নয়, প্রদীপ নিভে যাওয়ার সঙ্গে মানুষের এই চিরশান্তি লাভের যে তুলনা কবি টেনেছেন যা যতই মৃত্যু পরবর্তী শূন্যতার সঙ্গে সমার্থক হয়ে উঠুক না কেন। আসলে নির্বাণ কোন স্বর্গ নয়,যেখানে লোকান্তর আত্মা অবস্থান করে।বৌদ্ধ নির্বাণ ও হিন্দু মোক্ষ, এর মধ্যে এই পার্থক্য যে বৌদ্ধরা কোন শাশ্বত আত্মা বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না। এইজন্যই এডউইন আর্নল্ড নির্বাণকে উচ্ছেদ বা শাশ্বত বলে মানতে অস্বীকার করেন। নির্বাণ আসলে দুঃখ মুক্তি। শমথ-যান ও বিদর্শন-যান এর মাধ্যমে নির্বাণ লাভ হয়।নির্বাণ মুক্তি কোন আসলে কোন ভাব পদার্থ নয়। এটি একটি অনির্বচনীয় পরম অবস্থা।

১.৭ হিন্দু ধর্মে আত্মহত্যা বিষয়ক ধারণা

ঋগ্বেদে মানুষের আত্মত্যাগ তথা আত্মহত্যার বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্মের 'নির্বাণ' বা হিন্দু ধর্মের 'সতীদাহ' কে আত্মহত্যার আদি রূপ বলে ধরে নেওয়া যায়। সতীদাহ প্রথার প্রচলন অতীতে খুঁজে দেখতে গেলে প্রথমেই মনে আসবে মহাভারত ও রামায়ণে নারীদের কথা। পান্ডুর মৃত্যুর পর মাদ্রী সহমৃতা হলেও তা প্রথা জনিত আত্মহত্যা নয়। স্বামীর মৃত্যুজনিত অপরাধবোধ থেকে মাদ্রী সহমৃতা হলেও কুন্তী বেঁচে থাকছেন এবং সত্যবতী, অম্বিকা, অম্বালিকা, দুঃশলা, দ্রৌপদী সকলেই জীবিত রয়েছেন স্বামীর মৃত্যুর পরেও। রামায়ণে দশরথের তিন পত্নী ছাড়াও তারা, মন্দোদরী এবং

ইন্দ্রজিৎ বা কুম্ভকর্নের স্ত্রীরা কেউই চিতারোহন করছেন না। কালিদাসের *রঘুবংশম*-এ অনেক রাজার মৃত্যুর কথা রয়েছে, কিন্তু কোনো সহমরণের চিত্র নেই। *হর্ষচরিত*-এ যশোবতী যখন স্বামীর মৃত্যুর পরে সহমৃতা হতে উদ্যত হন তখন সকলেই তাকে নিরস্ত করেন, কেউই উৎসাহিত করেন নি। পরবর্তী যুগের সাহিত্যে যেমন প্রাচীন মধ্য যুগের সাহিত্য রাজতরঙ্গিনীতে সহমরণের ঘটনার একাধিক উল্লেখ আছে। মহাভারতের মৌষল পর্বে কৃষ্ণের চার স্ত্রী এবং বসুদেবের আট পত্নীও সহমৃতা হন। ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে সতীদাহকে পবিত্র পুণ্যকর্ম বলা হয়েছে। অথর্ব বেদে মৃতের বধূ হতে দেখা যায় জীবিত নারীকে। পরাশরের ধর্মসূত্রে কিন্তু বিধবার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা স্বীকৃত রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর তপস্যা করেন তিনি তপস্বীদের মতই স্বর্গলাভ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য সহমরণকে অনুমোদন করেন নি। তিনি বলেছেন বিধবা নারীর দায়িত্ব নেবে পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, ভাই বা মাতুল। যদিও পরবর্তীতে তাঁর টীকাকারেরা তাঁর অন্য ব্যাখ্যা করেন। ব্যাসস্মৃতির নিদান অনুসারে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ নারীর স্বামীর চিতারোহণের অধিকার রয়েছে। বিকল্প হিসেবে তপস্যার মাধ্যমে শরীর শুদ্ধ রাখার কথাও বলা হয়েছে। মনুও বিধবাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত জীবনের বিধান দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্যকার মেধাতিথি মনুর ব্যাখ্যায় বলেছেন পুরুষের পক্ষে যেমন, নারীর পক্ষেও আত্মহত্যা সমর্থনযোগ্য নয়। মেধাতিথি বলেন যে মনু বিধবার পক্ষে শীর্ণ হওয়ার যে বিধান দেন তার অর্থ আয়ুক্ষয়, কিন্তু সদ্য বৈধব্যের পর মৃত্যুর কথা মনু বলেন নি। কোনো বিধবা ফললাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হয়ে আত্মহত্যা করলে তা প্রকৃত অর্থে শাস্ত্রবিরোধী হবে। যাজ্ঞবল্ক্যের মিতাক্ষরা টীকা এবং অপরার্ক ভাষ্যে সতীর ক্ষেত্রে আত্মহত্যাকে অপরাধ ভাবা হচ্ছে না। স্মৃতিশাস্ত্রের নব্য মধ্যযুগীয় পণ্ডিত রঘুনন্দন বলেন

বিধবার জন্য শ্রেষ্ঠ পথ সহমরণ, কিন্তু তিনিও বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলেন। বেদ পরবর্তী যুগ থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত নানা শাস্ত্রকার সতীদাহ বিষয়ে নানা মতামত দিয়েছেন। কেউ কেউ বিধবার জন্য সহমরণের নিদান দেন, কেউ বিকল্প ব্যবস্থার কথাও বলেন, কেউ বলেন আত্মহত্যা পাপ, কেউ বলেন আত্মহত্যা পুণ্য। দক্ষসংহিতায় বলা হয়েছে সাপুড়ে যেমন গর্ত থেকে সাপকে টেনে আনে তেমনই সহমৃতা নারী স্বামীকে নরক থেকে উদ্ধার করে। হারীত সংহিতায় বলা হয়েছে সহমৃতা নারী পিতৃকূল এবং শ্বশুরকুল উভয়কেই নরক থেকে মুক্তি দান করে। পাপ ও পুণ্যের এই মতভিন্নতার কারণেই হয়ত বিষ্ণুধর্মশাস্ত্রে সরাসরি প্রশ্ন তোলা হয় নারীর এই আত্মহনন পাপ কি না? এই বিতর্কের সিদ্ধান্ত যা দাঁড়ায় তা হল স্বামী এমনই এক পবিত্র বস্তু তার চিতায় আত্মহত্যাও পুণ্যকর্মবলে গণ্য হবে। বৈদিক যুগ থেকে শাস্ত্র নারীর জন্য প্রধান যে ভূমিকাটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল তা হল পতিব্রতার ভূমিকা। পতিব্রতা নারীর সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা হল সতী। হারীত সংহিতায় "সাধ্বী" নারীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সে স্বামীর দুঃখে দুঃখ পায়, সুখ ভোগে সুখ পায়, স্বামী গৃহত্যাগ করলে তাকে দেখে মনে হয় সে ভেঙ্গে পড়েছে এবং স্বামীর মৃত্যুতে সে প্রাণত্যাগ করে। সদ্য বিধবাদের মনে স্বামীর সঙ্গে চিরকালীন স্বর্গভোগের লোভ তো ছিলই, পাশাপাশি সতীর মৃত্যুতে যে সামাজিক ও ধর্মীয় উত্তেজনার মুহূর্ত তৈরি হত, তা আকর্ষণ করত বিধবাদের। আত্মীয়দের মিথ্যে শুভকামনা, অনিশ্চিত ও দুঃসহ ভবিষ্যতের ভয় এবং স্বর্গের উজ্জ্বল ভবিষ্যত, সামাজিক গরিমা লাভের আকাঙ্ক্ষা - এই সব কিছুই কাজ করেছে সতীদাহের কারণ হিসেবে। সতীদাহ - অর্থাৎ সতী কে দাহ করা হচ্ছে। দাহ কি কেউ নিজের করে? তাহলে সতীদাহের সঙ্গে আত্মহত্যার অনুষঙ্গ যোগ হচ্ছে কীভাবে? দাহ শব্দটি কি কোথাও সামাজিক হত্যার

রূপটিকেই ইঙ্গিত করছে না? সম্পত্তি গ্রাস এবং সামাজিক ভাবে সতীত্বের গৌরবকে বাঁচিয়ে রাখতেই মেয়েটিকে চিতায় তোলা হত। মেয়েটির মনেও এই ভ্রান্ত সতীত্বের গরিমা কাজ করত, কাজ করত আফিমের নেশাও, তাও কেউ কেউ যখন সেই নেশা কাটিয়ে উঠে আসতে চেয়েছে চিতা ছেড়ে, বাঁশ দিয়ে চেপে রাখা হয়েছে তাকে চিতায়, শোরগোল কাঁসরঘন্টায় ঢাকা পড়েছে তার আর্তচিৎকার। শাস্ত্রে, পুরাণে, সাহিত্যে এবং সমাজে সতীদাহ প্রথা ছিল কিন্তু পাশাপাশি প্রায় সকল শাস্ত্রেই বিকল্প ব্যাবস্থার কথাও বলা হয়েছে। সহমৃতা না হওয়া বিধবার সংখ্যা সাহিত্যের মতোই সমাজেও অপ্রতুল ছিলনা।[vii]

জহর বা জৌহর ব্রত ছিল ভারতবর্ষে প্রচলিত নারীর অন্য একপ্রকার আত্মহনন। অনেকে মনে করেন ফার্সি শব্দ ‘জউহর’ থেকে শব্দটি এসেছে। যার অর্থ মণিমাণিক্য, পুণ্য অথবা সতীত্ব। যুদ্ধে পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে তখন রাজপরিবারের নারীরা, রাজপ্রাসাদের অন্য নারী এমন কি কখনও সন্তানদেরও সঙ্গে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতেন। শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়া, তাদের ক্রীতদাসী বা শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার পরিবর্তে আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করতেন তারা। অনেকসময় তাদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের এই অগ্নি প্রজ্জ্বলনে সাহায্য করতেন। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চিতোরে রাণী পদ্মাবতী সহ প্রায় ১৬০০ রাজপুত নারী জৌহর ব্রততে প্রাণত্যাগ করে। সাধারণত্ জৌহর ব্রতের পর রাজা ও তার পারিষদেরা যুদ্ধে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও রণক্ষেত্রে প্রবেশ করতেন যা সাকা নামে পরিচিত। রাজস্থানে ছাড়াও কর্ণাটকের কম্পিলি সাম্রাজ্যে জৌহর ব্রতের ইতিহাস বর্তমান। বাংলাতেও বল্লাল সেনের রাজত্বকালে হানাদারদের হাত থেকে

সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজপরিবারের নারীরা বিক্রমপুরের ‘বল্লাল’ দীঘির কাছে এই ব্রত পালন করেছিলেন বলে শোনা যায়।

হিন্দুধর্মে প্রচলিত অপর এক প্রকার আত্মহননের উপায় ছিল প্রায়োপবেশন। প্রায়োপবেশন অর্থাত্ মৃত্যু কামনায় উপবাস করে উপবেশন, অর্থাত্ উপবাস করে বসে থেকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে জৈন ধর্মেও অনুরূপ প্রথা, Santhara প্রচলিত ছিল। জীবনের সমস্ত কামনা বা আকাঙ্ক্ষা যার দূর হয়েছে কেবলমাত্র তারই অধিকার ছিল প্রায়োপবেশনে আত্মত্যাগ করার। এই আত্মহননের পূর্বে সর্বসম্মুখে তা ঘোষণা করার রীতি ছিল। জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করেছে কেবল এমন মানুষেরই এই রীতি অবলম্বনের অধিকার ছিল। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে ভাগবত পুরাণ শোনানোর সময় প্রায়োপবেশনের প্রসঙ্গ আসে। পরবর্তী সময়ে হিন্দু সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই রীতির প্রচলন ছিল। আধুনিক সময়ে সদগুরু শিবায় সুব্রমন্যুস্বামীর প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন। জীবন্ত বৌদ্ধ মমি তথা সকুশিনবুৎসুর কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, জাপান সহ বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের হিমাচল প্রদেশেও লামা সঙ্ঘ তেঞ্জিনের বহু প্রাচীন (মৃত্যু আনুমানিক -১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) জীবন্ত মমি আবিষ্কৃত হয়।

আত্মহননের নানা উদাহরণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আত্মহত্যার মত একটি জরুরি বিষয়কে স্বীকৃতি দিয়েও প্রাচ্য দার্শনিকরা সেভাবে আত্মহননের সামাজিক ও ব্যক্তিগত কারণে নিয়ে আগ্রহ দেখাননি। ধর্মশাস্ত্রকারদের লেখা থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার চেষ্টাকে গুরুতর পাপ বলে মনে করা হত। ব্রহ্মপুরাণে

বলা হয় যে বিষপান করে, আগুনে পুড়ে, গলায় দড়ি দিলে, জলে ডুবলে বা গাছ বা পাহাড় থেকে লাফ মেরে আত্মহত্যা করলে তাদের 'মহাপাতক' রূপে গণ্য করা হবে। তাদের দাহকাজ করা হবে না।[viii]

মহাপ্রস্থানের কথা বারবার এসেছে পুরাণ ও শাস্ত্রে। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী মহাভারতের যে অংশে মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন সেই অংশের নাম 'স্বর্গারোহণ'। স্বর্গারোহণ প্রসঙ্গে ব্রহ্মপুরাণ থেকে ও শৈবপুরাণ থেকে ধার করে লেখক উপেন্দ্র ঠাকুর তাঁর বইতে বলছেন-

"He who is unable to make this journey to Indraloka should give up his life on the snows. When he does so, firmly rooted in truth and courage, his death immediately leads him to heaven. The Saiva Puranas unanimously advocate for the successful suicide a post-mortuary existence of unalloyed sensual pleasure." [ix]

মনু সংহিতায় আত্মহত্যাকারী আত্মাকে জল দেওয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। বিষ্ণু সংহিতাতেও আত্মহত্যা বিষয়ে বক্তব্য অনুরূপ। সমাজ ও সাহিত্যে আত্মহত্যার ঘটনা বারংবার উঠে এলেও ধর্ম শাস্ত্রকারেরা আত্মহত্যাকে পাপ ব্যতীত অন্য কিছু মনে করেন নি। এক্ষেত্রে আমরা ভাবতে পারি যে হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রে 'আত্মা' অবিনশ্বর। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বারবার বলা হয়েছে যে আত্মা অবিনাশী,আত্মা কখনো জন্মায় না, তার মৃত্যু নেই। আত্মা শাশ্বত ও চিরপুরাতন - দেহ হত হলেও আত্মা হত হয়না- আত্মা সর্বদাই এক প্রকার জন্ম -বৃদ্ধি-ক্ষয়হীন। এই ভাবনার থেকেই হয়ত হিন্দু ধর্ম বা

শাস্ত্র আত্মহনন বিরোধী। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ 'সাংখ্যযোগঃ'- এর উনিশ ও কুড়ি নম্বর শ্লোকদুটি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

১৯ নম্বর শ্লোক-

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হণ্যতে।। [x]

(যে ব্যক্তি আত্মাকে হন্তা বা হত বলেন, তাঁহারা উভয়ই কিছু জানেন না। কারণ, আত্মা কাহাকেও বধ করে না বা কাহারো দ্বারা হত হয় না)

২০ নম্বর শ্লোক-

ন জায়তে মৃয়তে বা কদাচি-

নায়ক ভূত্বাহভবিতা বা ন ভূয়ঃ

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হনমানে শরীরে।। [xi]

(এই আত্মা কখনো জন্মে না বা মরে না। বারবার জন্মিয়া সে বৃদ্ধি পায় না। ইঁহার ক্ষয়ক্ষতি কিছুই নাই । ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও চিরপুরাতন। ইহার দেহ হত হইলে আত্মা হত হয়না।)

মনুসংহিতা তেও আত্মার এই শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বত্র তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।

সর্বমাত্মনি সম্পশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিত ।

সর্বং হ্যাত্মানি সম্পশ্যন্ না ধর্ম্মে কুরুতে মনঃ ।। [xii]

(সংযত চিত্তে সৎ অসৎ সব কিছুতে আত্মাকে দেখবে কারণ সব কিছু আত্মাকে দেখে কেউ অধর্মে মনোনিবেশ করেনা।)

এবং আত্মাকে দেবতা বলেই এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্তিতম্ ।

আত্মা হি জনয়ত্যেষাং কর্ম্মযোগং শরীরিণাম্ ।।[xiii]

(আত্মাই সকল দেবতা, সবই আত্মায় অবস্থিত। আত্মাই এই শরীরধারীগণের কর্ম সম্বন্ধ জন্মিয়ে দেয়।)

সোহমাবতীন্দ্রিয় গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোহব্যক্তঃ সনাতনঃ।

সর্ব্বভূতোময়োহচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ।। [xiv]

(ঐ যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, শাশ্বত, সকল জীবের আত্মা এবং অচিন্ত্যনীয়, তিনি নিজেই আবির্ভূত হলেন।)

সুতরাং 'আত্মা'-র হনন শাস্ত্রবিরোধী এবং হয়তো সে কারণেই দার্শনিকরাও আত্মহত্যার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এড়িয়ে গেছেন, তার কোন তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করা দরকারি মনে করেন নি।

এই আত্মার শাশ্বত ধর্মকে মনে রেখেই হয়তো বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আত্মহত্যার তুলনায় জীবনের প্রতি বিশ্বাস বেশি এবং অসফল আত্মহত্যার সংখ্যাও প্রচুর। আয়েষা, রোহিণী, বিমলা ও কমলা দের আত্মহত্যার উদ্যোগ লেখক ব্যর্থ করেন আত্মার অবিনশ্বরতা বা সদর্থক জীবনবোধ থেকে যা আসলে হিন্দু ধর্মের আত্মার ভাবনার

পরিপূরক। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের *শান্তিনিকেতন*-এর *আত্মার প্রকাশ* প্রবন্ধটির একটি বক্তব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা দেখে নেওয়া যায়।

“আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে....”[xv]

রবীন্দ্রনাথ আত্মা ও অহংকে আলাদা করে দৈনন্দিন আমিত্বকে ‘অহং’ বললেও আত্মার অমরত্বকে মেনে নিয়েছেন। তাই *জন্মদিন*-এর ২৩ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর অতীত আত্মার কথা বলেন।

“..............

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ,

করো অপাবৃত,

সেই দিব্য আবির্ভাবে

হেরি আমি আপন আত্মারে

মৃত্যুর অতীত।” [xvi]

১.৮ কালোত্তীর্ণ কিছু চরিত্রের আত্মহত্যার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

আত্মহত্যার ইতিহাস নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আমরা এমন কিছু আত্মহত্যার ছবি তুলে ধরব এই অংশে যা আমাদের মত মানুষ ও সাধারণ পাঠককে বহু বহু যুগ ধরে আত্মহত্যাকে অস্বীকার করতে দেয় নি। বহু চর্চিত, অমর হয়ে থাকা নানা চরিত্র, যাঁরা বিত্তে,মেধায়,গ্ল্যামারে,রাজনীতিতে, শিল্পসত্তায় অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী, তাঁরাও যখন

আত্মহননের পথ বেছে নেয় তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমরা নিত্যদিনের তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ার উপরে উঠে আত্মহত্যাকে দেখতে বুঝতে চাই।

হ্যানিবাল

কার্থেজিয়ান সৈন্যের প্রধান (হস্তীবাহিনী) হ্যানিবাল (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭- খ্রিস্টপূর্ব ১৮৯) দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় আল্পস এবং দক্ষিণ ইউরোপে রোমান বাহিনীকে পরাজিত করেন বারবার কিন্তু কখনোই শহর জয় করতে পারেন না। হ্যানিবালের শক্তি বৃদ্ধির খবর পৌঁছায় রোমান সম্রাটের কাছে তাই কার্থোজিয়ানদের সঙ্গে শক্তি চুক্তির পর তাকে তুর্কি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয় রোমের পক্ষ থেকে। খ্রিস্ট পূর্ব ১৯০ সালে হ্যানিবাল, গ্রিক রাজার সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং রোমের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর বাহিনী পরাজিত হয়। রোমানরা হ্যানিবালকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার আবেদন জানালে, শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়তে অনিচ্ছুক হ্যানিবাল খ্রিস্ট পূর্ব ১৮৯ সালে নিজেকে বিষপ্রয়োগ করে আত্মহত্যা করেন।

ক্লিওপেট্রা ও মার্ক অ্যান্টোনি

ম্যাসিডোনিয়ান রাজত্বের শেষ শাসক ক্লিওপেট্রা(খ্রিস্টপূর্ব ৬৯- খ্রিস্টপূর্ব ৩০)। পিতা টলেমি XII-এর মৃত্যু হয় খ্রিস্ট পূর্ব ৫১তে। ক্লিওপেট্রা তার দশ বছরের ভাইকে বিবাহ করেন ।কিছুদিনের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ের কারণে ক্লিওপেট্রা ও টলেমি XIII এর মধ্যে অশান্তির উদ্রেক হয় ও তিনি নিজস্ব সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইজিপ্টে ফিরে আসেন। অন্যদিকে জুলিয়াস সিজার ইজিপ্টে পৌঁছলে ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং সিজারের

সৈন্যের সাহায্যে ক্লিওপেট্রা তার ভাইকে সিংহাসনচ্যুত করেন। সিজার তাকে ইজিপ্টের সিংহাসনে বসান। খ্রিস্ট পূর্ব ৪৭-এ সিজারের ঔরসে ক্লিওপেট্রা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। ক্লিওপেট্রা এরপর জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে রোমে গেলেও সিজারের মৃত্যুর পর ইজিপ্টে ফিরে আসেন। সিজারের পরবর্তী রোমের শাসক মার্ক অ্যান্টোনির ডাকে ক্লিওপেট্রা টরাস শহরে পৌঁছলে তার রূপ এবং ব্যক্তিত্ব মুগ্ধ অ্যান্টোনি তার প্রতি প্রেম নিবেদন করেন। তাদের সম্পর্ক গভীর হয় এবং পরবর্তীতে তাদের তিনটি সন্তানও হয়। পরে অ্যান্টোনি রোমের সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে ক্লিওপেট্রা সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটে, অ্যান্টোনি এবং ক্লিওপেট্রা ইজিপ্ট ফিরে আসেন। অ্যান্টোনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলে তাকে মিথ্যা খবর দেয়া হয় যে ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হয়েছে। খবরটিকে সত্য মনে ক'রে অ্যান্টোনি বুকে ছোরা ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করেন। প্রেমিকের মৃত্যুসংবাদে ক্লিওপেট্রা একটি ইজিপ্সিয়ান কোবরার ছোবলে প্রাণত্যাগ করেন। অন্য একটি মতবাদ হলো এই যে শত্রুপক্ষ অর্থাৎ Octavian-এর সৈন্যবাহিনী আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রবেশ করলে অ্যান্টোনিও নিজের তরবারিতে আত্মহত্যা করেন এবং তার মৃত্যুতে আত্মঘাতিনী হন ক্লিওপেট্রা।

নিরো

নিরোর (এডি ৩৭- ৬৮) পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা তাঁর গ্রেট আঙ্কলকে বিবাহ করেন। পরবর্তীতে তিনি নিরোকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে নিরো তাঁর মাতাকে হত্যা করান। মা Agrippina তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করতেন। প্রথম জীবনে উদার এবং কর্তব্যপরায়ণ রাজা হলেও পরবর্তীতে তিনি শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপের জন্য রাজকোষের বহু

অর্থ ব্যয় করেন। নিরো নিজের স্ত্রী Octavia- কে পরিত্যাগ ও হত্যা করেন। জনরোষ তৈরি হতে থাকে তাকে ঘিরে। এই সময় সমস্ত শহর জুড়ে হঠাৎ আগুন লাগে এবং শহরের ৭৫ শতাংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। মনে করা হয় এই আগুনের হোতা ছিলেন নিরো। পরবর্তীতে নিরো,আগুন লাগার জন্য খ্রিস্টানদের দায়ী করেন এবং বহুবিধ অত্যাচার করেন। এরপর নিজের প্রয়োজনে তিনি কর বাড়াতে থাকেন, বহু সরকারি অফিস বিক্রি করে দেন। এই সময়ে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হতে থাকে। বহু রোমান পরিবার ও নিরোর পূর্ববর্তী সহায়ক Sereca, Senator, Knight-রা এই ষড়যন্ত্রে সামিল হোন। Piso কে রোমের সম্রাট করার সিদ্ধান্ত হয়। অবস্থা হাতের বাইরে যেতে দেখে নিরো পলায়নের চেষ্টা করলেও তা বিফল হয়। তখন তিনি জানতে পারেন যে Senate তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ও তিনি আত্মহত্যার পরিকল্পনা করেন। তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকারি Epaphroditos, মৃত্যুর সময় তিনি (Nero)বলেছিলেন- “ What an artist dies in me.”

মার্কাস জুনিয়াস ব্রুটাস

মার্কাস জুনিয়াস ব্রুটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৮৫- খ্রিস্টপূর্ব ৪২) নামটি ইতিহাসের সুপ্রসিদ্ধ কারণ তিনি ছিলেন জুলিয়াস সিজারের হত্যার চক্রান্তকারীদের অন্যতম। সিজারের স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদে ব্রুটাস সিজারের হত্যার পরিকল্পনার সামিল হন। খ্রিস্ট পূর্ব ৪২-এ ফিলিপিতে একটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ব্রুটাস আত্মঘাতী হন।

চায়কোভস্কি

রাশিয়ার বিখ্যাত মিউজিক কম্পোজার Pyor Ilych Tchaikovsky (১৮৪০-১৮৯৩ খ্রিঃ) মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে পিয়ানো শিখতে শুরু করেন। ২১ বছর বয়সে তিনি রাশিয়ান মিউজিক সোসাইটিতে ভর্তি হন। পরবর্তীতে তিনি Moscow Conservetory- র Professor of Harmony ও হন। তিনি তাঁর সমকামী সত্তাকে সামাজিক চাপে লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হন এবং তাঁরই এক ছাত্রীকে বিবাহ করেন। কিন্তু বিয়ের মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই নার্ভাস ব্রেকডাউন এর কারণে তিনি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন এবং তাকে বিদেশ পাঠানো হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গে তাঁর মৃত্যু হয়। সরকারিভাবে তাঁর মৃত্যুর কারণ কলেরা বলা হলেও তাঁর জীবনী রচয়িতাদের অনেকেই মনে করেন যে যৌনজীবন নিয়ে সামাজিক কেচ্ছা ও মানসিক অবসাদের কারনে তিনি আত্মহত্যা করেন।

ভিনসেন্ট ভ্যান গগ

নেদারল্যান্ডের বিখ্যাত চিত্রকর ভ্যান গগ (১৮৫৩- ১৮৯০) মাত্র ১৫ বছর বয়সে অর্থনৈতিক কারণে স্কুল ছেড়ে তাঁর কাকার আর্ট ডিলারশিপে কাজ নেন। পরবর্তীতে তাঁকে লন্ডনের Groupil Gallery তে ট্রান্সফার করা হয়। ১৮৮০-তে ভ্যান গগ, ব্রুসেলে যান শিল্পী হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। তাঁর ভাই থিও সেখানে আর্ট ডিলারের কাজ করতেন। তাঁর সাহায্যে ভ্যান গগ শিক্ষা নিতে থাকেন। ভ্যান গগ খুব সহজেই দুঃখী মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁর বিধবা কাজিন এবং একজন মদ্যপ বেশ্যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হয়। এই বেশ্যাই ছিলেন ভ্যান গগের মডেল। কিন্তু এই মহিলা আবার তার পুরনো

পেশায় ফিরে গেলে ভ্যান গগ অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এরপর তিনি তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলি আঁকেন। জাপানি আর্টের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন। ফ্রান্সে থাকাকালীন ভ্যান গগ একটি বেশ্যালয় গিয়ে একজন বেশ্যাকে তাঁর রক্তমাখা কানটি দিয়ে তা সযত্নে রক্ষা করতে বলেন, যা ভ্যান গগ নিজেই নিজের রেজার দিয়ে কেটেছিলেন । এই ডিপ্রেশনের সময় তিনি অসংখ্য ছবি আঁকেন। ১৮৯০ তে ছবি আঁকতে বেরিয়ে তিনি নিজের বুকে নিজে গুলি চালান, তাতে তখনই তাঁর মৃত্যু হয় না। পরবর্তী কালে একটি হাসপাতালে ভাই উপস্থিত থাকাকালীন ভ্যান গগ মৃত্যুতে ঢলে পড়েন।

হোরেশিও

উরুগুয়ের এই কবি গল্পকার Horacio Quiroga (১৮৭৮- ১৯৩৭ খ্রিঃ) প্রায় তিরিশ বছর ধরে প্রায় ২০০ টিরও বেশি ডার্ক স্টোরি লিখেছেন। Quiroga তারই এক ছাত্রী Ana Maria Cires কে বিয়ে করেন এবং Misiones-এর একটি জঙ্গলে থাকতে শুরু করেন। তাঁদের দুটি সন্তানও হয় কিন্তু ওই জনবর্জিত, ভয়ঙ্কর জঙ্গলে থাকতে থাকতে Ana বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। Quiroga তার সন্তানদের নিয়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা শুরু করেন, একটি নতুন বিবাহ করেন। ১৯৩৭ খ্রিঃ কুইরোগার প্রোস্টেট ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং এই বছরই তিনি বিষপান করে আত্মহত্যা করেন।

ভার্জিনিয়া উল্ফ

লেখক ভার্জিনিয়া উল্ফ (১৮৮২- ১৯৪১ খ্রিঃ) অত্যন্ত কম বয়সে লেখালেখি শুরু করেন। তাঁর পিতা এবং মাতার পূর্ববর্তী বিবাহের সন্তান এবং তাঁরা একই সঙ্গে বসবাস করতেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তার সৎ ভাই George এবং Gerald তাঁর উপর যৌন অত্যাচার করেন। এই ঘটনা তাকে মানসিকভাবে যে আঘাত দেয় তা আরো গভীর হয় মায়ের হঠাৎ মৃত্যু এবং তার দু বছরের মধ্যে তার সৎ বোন Stella-র মৃত্যুতে। পরবর্তী কালে ভার্জিনিয়া লিওনার্ড নামের এক ইহুদীকে বিয়ে করেন । তাঁর সম্পূর্ণ জীবনে তিনি নভেল লেখেন, নানা কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দেন, প্রবন্ধ লেখেন, ছোটগল্প লেখেন এবং তিনি একজন বুদ্ধিজীবী ও অনন্য চিন্তাবিদ রূপে খ্যাতি পান। কিন্তু কাজের জগতে সাফল্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিয়মিত ডিপ্রেশন এবং নাটকীয় মুড সুইংয়ের শিকার ছিলেন। তাঁর স্বামী লিওনার্ড সর্বদাই নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে থাকতেন। অন্যদিকে তাঁদের দুজনের লন্ডনের বাড়িটি ধ্বংস করা হয়। এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন, ১৯৪১ এর ২৮শে মার্চ উল্ফ Ouse নদীর ধারে বেড়াতে যান। ওভারকোটের পকেটে তিনি ভরে নেন পাথর এবং জলে ঝাঁপ দেন, নদীর স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বহুদূর। এভাবেই আত্মহত্যা করেন ভার্জিনিয়া উল্ফ।

অ্যাডলফ হিটলার ও ইভা ব্রাউন

অস্ট্রিয়াতে জন্মগ্রহণ করে অ্যাডলফ হিটলার (১৮৮৯- ১৯৪৫ খ্রিঃ) জার্মানির একজন রাজনৈতিক নেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। নাৎসি জার্মান পার্টির নেতা অ্যাডলফ হিটলার ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন এবং তিনি একজন স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থাতেই সমগ্র বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্মুখীন হয়। এই সময় নাৎসিরা বহু লক্ষ মানুষকে কেবলমাত্র ইহুদী হওয়ার অপরাধে হত্যা করে। এছাড়াও গোপনে কমিউনিস্ট, সমকামী, ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের নির্বিবাদে হত্যা করা হয় জার্মানির কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে বুঝতে পেরে যান হিটলার। বার্লিনে বাংকারে তাঁর ছায়াসঙ্গী ছিলেন তাঁর প্রেমিকা ইভা ব্রাউন। এপ্রিল মাসের ২৯ তারিখে হোটেলের তাঁকে বিবাহ করেন এবং তার পরেই তাঁরা একসঙ্গে আত্মহত্যা করেন।

ইভা ব্রাউন (১৯১২- ১৯৪৫ খ্রিঃ) ছিলেন একজন জার্মান মডেল, পরবর্তী সময়ে তিনি ছিলেন হিটলারের প্রেমিকা ও সঙ্গিনী। তারা সর্বদা তাঁদের সম্পর্কের কথা গোপন রাখতেন। ১৯৩২ ও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইভা আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজেকে বিষপ্রদান করেন এবং হিটলার বিষপ্রয়োগ ও বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১ খ্রিঃ) ১৯৬১ খ্রিঃ, ৬১ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। বিশ শতকের এই আমেরিকান লেখক ১৮৯৯ খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর Old Man and The Sea, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে পুলিৎজার পুরস্কার পায়। ১৯৫৪ খ্রিঃ তিনি নোবেল পুরস্কারও পান। হেমিংওয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালিতে সৈন্যদলে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার ছিলেন। লেখার পাশাপাশি তিনি আফ্রিকাতে নানা অ্যাডভেঞ্চারে মত্ত ছিলেন এবং বেশ কিছু প্লেন ক্র্যাশ-এর হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি যখন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন সেই সময়েই তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন। উচ্চ রক্তচাপ, লিভারের সমস্যা প্রভৃতি নানা কারণে তিনি ডিপ্রেশনের শিকার হন। যুদ্ধক্ষেত্রে Agnes Von Kurowsky- র প্রতি আকর্ষণ, অবজ্ঞা, পরবর্তী সময়ে প্রথমা স্ত্রী Hadley Richardson এবং দ্বিতীয় স্ত্রী Pauline Pfeiffer- এর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ তাকে আরও একাকিত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তৃতীয় স্ত্রী Gellhorn- এর সঙ্গে তিনি কিউবাতে বসবাস শুরু করেন। Mary Welsh ছিলেন তাঁর চতুর্থ স্ত্রী। বোঝাই যায় যে দাম্পত্য জীবনে অসুখী ছিলেন তিনি। ১৯৬১ খ্রিঃ ২রা জুলাই তাঁর Ketchurm এর বাড়িতে তিনি আত্মহত্যা করেন।

১৯৬১ খ্রিঃ আর্নেস্টের মৃত্যুর মাত্র একমাস বাদে জন্ম নেয় তাঁর পৌত্রী Mariel Hemingway। Mariel-এর মতে Earnest তাঁর লেখায় যে আদর্শ জীবনের কথা বলতেন, সেটা আসলে ছিল তার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস,

মদ্যাসক্তি এবং যুদ্ধের প্রতি আকর্ষণকে ঢাকার এক প্রয়াস। Mariel-এর মতে আর্নেস্টের জীবনে তাঁর পিতার আত্মহত্যার ঘটনা সুগভীর প্রভাব ফেলে।

তবে এখানেই শেষ নয়, Mariel এর দিদি Margaux Hemingway, যিনি ছিলেন একজন মডেল ও অভিনেত্রী, তিনি ডিপ্রেশনের শিকার ছিলেন এবং ১৯৯৬ খ্রিঃ মাত্র ৪২ বছর বয়সে ড্রাগের অতিরিক্ত প্রয়োগে তার মৃত্যু হয়। Mariel তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন যে তাঁর দুই দিদিকে শৈশবে তাঁর পিতা Jack Hemingway যৌনভাবে অত্যাচার করেন। নিজের পরিবার বিষয়ে Mariel-এর বক্তব্য এই যে তারা মদ্যাসক্তিতে ও মানসিক অবসাদে ভুগত। ছোট বোন Muffet কৈশোরে ড্রাগের নেশায় আসক্ত হয়ে স্কিৎসোফ্রেনিয়া এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডার-এর রোগী হয়ে পড়ে এবং মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হয়। Mariel-এর মা ছিলেন ক্যান্সারের রোগী এবং তিনিও পরবর্তী সময়ে ড্রাগ ওভারডোজে মারা যান। সুতরাং Mariel-এর কাছে ব্যক্তিগত জীবনে অবসাদ মুক্ত থাকাটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জের মত। আর্নেস্টের পরিবারে আত্মহত্যা, অবসাদ ও বাইপোলার ডিসঅর্ডারের যে ক্রম ইতিহাস তা পরবর্তী সময়ে আত্মহত্যার সঙ্গে জেনেটিক্সের সম্পর্কে খতিয়ে দেখতে বাধ্য করেছে।

মায়কোভস্কি

রাশিয়ার বিখ্যাত কবি Vladimir Mayakovsky (১৮৯৩- ১৯৩০ খ্রিঃ) ছিলেন রাশিয়ার ফিউচারিস্ট আন্দোলনের এক বিশিষ্ট কর্মী। রাশিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে ও মুখপত্র হিসেবে লিখেছেন অজস্র কবিতা। এছাড়াও তিনি নাটক লিখেছেন কখনো তাতে অভিনয়ও করেছেন। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবী মহলে অতি জনপ্রিয় লিলি ব্রিকের

সঙ্গে আলাপ হয় মায়কোভস্কির, যদিও প্রথমে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল লিলির বোন এলসার সঙ্গে, পরবর্তী সময়ে মায়কোভস্কি, লিলি ব্রিক ও তাঁর স্বামী ওসিপ ব্রিককে কেন্দ্র করে এক অদ্ভুত সম্পর্কের জটিল বিন্যাস গড়ে ওঠে। তাঁরা একইসঙ্গে বাস করেন বহুদিন। তাঁদের মিলিত যৌনজীবন একসময় আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। জীবনে আরও বহু নারীর সংস্পর্শে এসেছেন কবি, মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্পর্ক ছিল পলোনস্কায়ার সঙ্গে, কিন্তু তাঁর আত্মহত্যার সঙ্গে বারবার জড়িয়েছে লিলিরই নাম। ১৯৩০ সালের ১৪ই এপ্রিল তিনি বন্দুকের গুলিতে আত্মহননের পথ বেছে নেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি এই ইতিহাসকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, লিলি কারো কারো হয়ে উঠেছে মায়কোভস্কির মিউজ, কারো কাছে উইচ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ৮৬ বছর বয়সে ১৯৭৮ সালে বয়সজনিত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতেই লিলি ঘুমের ওষুধ খেয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন।

মেরিলিন মনরো

অভিনেত্রী মেরিলিন মনরোর (১৯২৬- ১৯৬২ খ্রিঃ) বাল্য ও কৈশোর জীবন ছিল ভয়াবহ। তিনি কোনদিন জানতে পারেননি তাঁর পিতার পরিচয়, মা মানসিক রোগগ্রস্ত ছিলেন। মাত্র ৭ বছর বয়স থেকে মনরো ফস্টার হোমে জীবন কাটান। তিনি জানিয়েছেন সেখানে তিনি নানাভাবে যৌন হেনস্থার সম্মুখীন হন। ১১ বছর বয়সে তাকে ধর্ষণ করা হয়, মাত্র ১৬ বছর বয়সে ওই ফস্টার হোম ত্যাগ করে মনরো তার প্রেমিক Jimmy Doughrety-কে বিবাহ করেন। পরে জিমি ক্যালিফোর্নিয়া চলে যান, এ সময় মনরো এক ফটোগ্রাফারের নজরে পড়েন এবং জিমির ফেরার আগেই মনরো এক সফল মডেল

রূপে পরিচিতি পান। এরপর তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে এবং সেই বছরে মনরো তাঁর জীবনের প্রথম ছবির চুক্তিপত্রে সাক্ষর করেন। খুব শীঘ্রই তিনি হলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী ও 'sex symbol' রূপে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সিনেমায় গ্ল্যামারাস, অর্থহীন ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত মনরো অভিনয়ের শিক্ষা লাভ করতে আমেরিকায় পাড়ি দেন, পরবর্তী কালে তাঁর 'Buo Stop' সিনেমায় তিনি অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হন। তাঁর তিনটি বিবাহ অসফল হয় এবং আরো নানা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে তিনি সর্বদাই চর্চায় থাকতেন।তবে তাঁর জীবনের শেষ দুটি ছবিও ব্যর্থ হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে ৩৬ বছর বয়সে মনরোর মৃত্যু হয় ড্রাগ ওভারডোজের কারণে। শোনা যায় সেসময় তিনি প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির সঙ্গে সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুটি আত্মহত্যা না খুন তা নিয়ে যদিও মতভেদ আছে।

সিলভিয়া প্লাথ

আমেরিকার কবি ও লেখক সিলভিয়া প্লাথ (১৯৩২- ১৯৬৩ খ্রিঃ) অত্যন্ত কম বয়সে লেখালিখি শুরু করেন। তিনি যখন ছাত্রী ছিলেন, তখন নিউ ইয়র্ক শহরে Madmoiselle নামক ম্যাগাজিনে গেস্ট এডিটর ছিলেন। সেইসময়েই প্লাথ ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সেরে উঠলে বেশ কিছুদিন একটি মানসিক চিকিৎসালয়ে তাঁর চিকিৎসা চলে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Newham কলেজে পড়ার সময় প্লাথের সঙ্গে পরিচয় হয় কবি Ted Hughes -এর। পরবর্তীতে তারা বিয়েও করেন। এরপর সিলভিয়া প্লাথের প্রথম কবিতা সংকলন বেরোয় ১৯৬০ সালে। Plath এবং Hughes এর দুটি সন্তান হয়। কিন্তু ১৯৬২সালে Hughes অন্য একটি সম্পর্কের খাতিরে প্লাথকে ত্যাগ করলে

তিনি গভীর ডিপ্রেশনের শিকার হন। এই সময়েই প্লাথ তাঁর বিখ্যাত novel 'The Bell Jar (1963)' লেখেন, যার কাহিনী ছিল এক যুবতীর যে গভীর মানসিক অবসাদে আক্রান্ত। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দেরই **১১**ই ফেব্রুয়ারি তিনি আত্মহত্যা করেন।

কার্ট কোবেন

গায়ক, গীতিকার কার্ট কোবেন (১৯৬৭- ১৯৯৪ খ্রিঃ) **২১** বছর বয়সে নির্বাণা নামক ব্যান্ডটি তৈরি করেন যা বহুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়। বাবা-মার ঝগড়া, সম্পর্ক, বাবার পুনর্বিবাহ- এই সমস্ত ঘটনায় অবসাদগ্রস্ত কোবেন তাঁর সঙ্গীতেই নতুন জীবন খুঁজে পান। ১৯৯০ সালে Courtney Love-এর সঙ্গে পরিচয় একটি অনুষ্ঠানে এবং পরবর্তীতে দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক গভীরতা পায়। এরইমধ্যে নির্বাণা জনপ্রিয়তার শিখর ছোঁয় এবং গীতিকার রূপে কার্ট কোবেন অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। কোবেন এবং Love বিবাহ করেন। তাঁদের দুজনের দুটি গানের ব্যান্ড ছিল, Nirvana এবং Hole। দুজনেই মাদক আসক্ত ছিলেন এবং শোনা যায় একত্রে ড্রাগ নিতেন। ১৯৯৪ সালে একটি মিউজিক্যাল সফর থেকে বিশ্রাম নিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে এসে ড্রাগ ওভারডোজ নিয়ে কোবেন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। সঙ্গে একটি সুইসাইড লেটারও পাওয়া যায়। এরপর ইউএসএ-তে ফিরে গিয়ে কোবেন একা নিঃসঙ্গ সময় কাটাতে থাকেন। Love তাকে মাদক ছাড়ার জন্য অনুরোধ ও নানা প্রকার চেষ্টা করেন। ১৯৯৪ সালেই এপ্রিল মাসে কোবেন নিজের মুখে বন্দুক চালিয়ে আত্মহত্যা করেন এবং এক্ষেত্রেও তাঁর একটি দীর্ঘ সুইসাইড লেটার পাওয়া যায়। যদিও এটিকে অনেকে হত্যা বলেও মনে করেন।

রবিন উইলিয়ামস

অভিনেতা রবিন উইলিয়ামস (১৯৫১- ২০১৪ খ্রিঃ) তাঁর নিজস্ব অভিনয় ধারা ও কমেডির জন্য বিখ্যাত। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মাদকাসক্তিতে ভুগতেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও নানা সম্পর্ক ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো ঘটনা তাঁকে বিচলিত করেছিল। ১১ ই আগস্ট, ২০১৪ সালে ৬৩ বছর বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন। পরবর্তী সময়ে জানা যায় যে তিনি হাতের শিরা কেটে এবং গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর স্ত্রী Susan Schneider পরে জানান যে রবিন পারকিনসন রোগে ভুগছিলেন এবং এ কারণেই তিনি মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন, এছাড়াও তিনি Lewy Body Dementia নামক রোগটিতে ভুগছিলেন যা পারকিনসনেরই একটি পরিণাম বলে মনে করা হয়।

তথ্যসূত্র

[i] Evans, Glens, Farberow, Norman L, Kennedy Associates, *The Encyclopedia of Suicide (2nd edition)*, Fasts on File, Inc, New York, 2003, P.XV

[ii] Ibid, P.XVI

[iii] Ibid, P XX

[iv] Ross, Christopher- *Mishima's Sword*, Travel in Search of a Samurai Legend, Fourth Estate- HarperCollins, London – P- 68

---

v Turnball, Stephen R (1977), *The Samurai: A Military History.* New York, MacMilan Publishing Co. P- 47

vi *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ, চৌধুরী, ডঃ সুকোমল (সম্পা.)– গ্রন্থমালা ২, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩ পৃষ্ঠা- ১৮৯

vii ভট্টাচার্য, সুকুমারী – *সতী* , *প্রবন্ধসংগ্রহ ১,* গাঙচিল, 'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা ৭০০০১১, ২০১৪, পৃষ্ঠা – ১৭৫-১৮৮

viii Thakur, Upendra - *The History of Suicide in India, An Introduction*, Oriental Publishers and Booksellers, Nai Sarak, Delhi, P- 55

ix Ibid, P- 60

x ভট্টাচার্য, বামনদেব (বঙ্গানুবাদ) – *শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা,* ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা, পৃষ্ঠা – ২২

xi তদেব

xii গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা) – *মনুসংহিতা,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭, পৃষ্ঠা – ৩৪২

xiii তদেব

[xiv] তদেব, পৃষ্ঠা – ৪৪

[xv] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র রচনাবলী* (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা- ৬৪১

[xvi] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র রচনাবলী* (পঞ্চবিংশ খন্ড), কলিকাতা, ১৩৮৩, পৃষ্ঠা- ৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আত্মহত্যার ধারণা; অতীত থেকে বর্তমান

সপ্তদশ শতকে ইউরোপে রেনেসাঁর সময় থেকে আত্মহত্যা বিষয়ে মনোভাব অনেকটাই বদলে যেতে থাকে, ইন্ডিভিজুয়াল বা ব্যক্তিমানুষের ধারণার সম্প্রসারণের ফলে এই ভাবনা তৈরি হয় যে প্রত্যেকের ভাগ্য বা পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী। শিল্পের প্রসারের ফলে একদিকে যেমন জন্ম নেয় এই ব্যক্তিতাবোধ, অন্যদিকে তারই সূত্র ধরে হাজির হয় বিচ্ছিন্নতা। একদিকে অর্থনৈতিক বৈষম্য, গরীবী, যথাযথ ভবিষ্যতের অভাব – মানুষকে চিন্তিত করে তোলে, এই সময় থেকে আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে ধারণাও বদলাতে থাকে। আত্মহত্যায় শাস্তি, প্রায়শ্চিত্তের পাশাপাশি মানসিক ভারসাম্যহীনতার কথাও আসে। মনোদর্শন ক্রমাগত আলোচনায় ঢুকে পড়ে। রেনেসাঁর সময় একদিকে ইংল্যান্ডে আত্মহত্যার সংখ্যা যথেষ্ট বাড়তে থাকার পাশাপাশি ক্যাথলিক চার্চ কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট কঠোরতা বজায় রাখে। এই সময় মূলত দারিদ্র্যকেই আত্মহত্যার প্রধান কারণ মনে করা হত।

আঠারো শতকেও আবার আত্মহত্যাকে দেখার ধরণ বদলায়, এই সময় ফরাসী দার্শনিক যেমন রুশো, ভলতেয়ার – এঁরা আত্মহত্যা ঠিক কী ভুল এই পথে না গিয়ে একে দেখতে চাইলেন যৌক্তিক দিক থেকে। ১৭৬৬ সালে ভলতেয়ার আত্মহত্যাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করলেন, পাশাপাশি ১৭৬১-তে রুশো আত্মহত্যাকে দেখলেন রোমান্টিক ভঙ্গীতে। ১৭৮৩ সালে ডেভিড হিউম তাঁর 'Essay on Suicide'- এ দেখালেন যে আত্মহত্যা আসলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কোনরূপ ক্রিয়া নয় কারণ মানুষকে এই ক্ষমতা আসলে ঈশ্বরই

দিয়েছেন যাতে সে আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে। তাছাড়া তিনি এও বলেন যে কোনো মানুষ যদি মনে করে তার জীবন যথেষ্ট প্রয়োজনীয় তাহলে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে না।[i] ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে Merian আত্মহত্যাকে নৈতিকতার দিক দিয়ে বিচার না করে চিকিত্সকের দৃষ্টিতে দেখলেন।[ii] আত্মহত্যাকে অপরাধ বলে দাগিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তিনি একে মানসিক অসুস্থতা বলে চিহ্নিত করতে চাইলেন।

আঠারো শতকের শেষ ভাগে এবং উনিশ শতকের শুরুতে রোমান্টিক কবিদের মধ্যে মৃত্যুভাবনা একটা বড় স্থান করে নেয়। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে গ্যেটে লিখছেন *The Sorrows of Young Werther*, নায়ক ওয়ের্থারের জীবনে ত্রিকোণ প্রেমের সংঘাত, জীবনসংকটের সমাধান হিসাবে আসছে আত্মহত্যার কথা। এই মৃত্যুর পেছনের কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখবো – বিচ্ছিন্নতাই এদের মৃত্যু বা আত্মহত্যার কারণ। ১৭৭০ সালে Thomas Chatterton মাত্র সতেরো বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। John Keats একাধিকবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন নানা কারণে। সারা পৃথিবীতেই আত্মহত্যাপ্রবণ কবির সংখ্যা অপ্রতুল নয়। গোর্কি আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও তা অসফল হয়।

২.১ ব্যক্তিতাবোধ ও বিচ্ছিন্নতা

আঠারো শতক থেকে সমাজে নানা পরিবর্তন হয়, ধনতন্ত্রের প্রসারে ব্যক্তিগত মালিকানা, ব্যক্তিতা ও বিচ্ছিন্নতা সমাজে ক্রমশ বাড়তে থাকে। পণ্যই হয়ে ওঠে সমাজের প্রধান অবলম্বন। ধর্মীয় বা সামাজিক মূল্যবোধ ক্রমশ তার স্থান হারায়। মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। আত্মহত্যাকে মানসিক অস্থিরতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি

সময় থেকে বারবার দার্শনিকদের মধ্যে এই আলোচনা উঠে আসে যে আত্মহত্যাকে মনোবিকলন বা অসুস্থতা হিসাবে দেখা হবে কি না। বহু ইউরোপীয় দার্শনিক এই সময় আত্মহত্যা নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেন যার বেশ কয়েকটি নিয়ে পরবর্তী অংশে আলোচনা করব আমরা। ডুর্খেইম আত্মহত্যাকে দেখলেন একটি 'Collective Phenomenon' হিসাবে,তাঁর ও মাসারিকের লেখায় আত্মহত্যায় সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত দিকের পাশাপাশি সামাজিক ভূমিকার কথা স্পষ্ট হল। অন্যদিকে উইলিয়াম জেমস বলতে চাইলেন যে মানুষ কোন ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নয় বরং কোন রকম বিশ্বাসহীনতা থেকেই আত্মহত্যা করে। বিশ শতকে ফ্রান্সের Maurice Halbaws, ইংলন্ডের Ruth Cavan, Bessie Bunzel প্রমুখেরা আত্মহত্যা বিষয়ে নানা গবেষণামূলক কাজ করেন। ফ্রয়েড বা কার্ল মেনিঙ্গার আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পৌঁছোলেন 'Death Instinct'-এ। এই Death Instinct ও Insanity যে এক নয় তা ক্রমশ আলোচিত হতে থাকল। ধর্ম, পাপ, প্রায়শ্চিত্ত, পাগলামি বা অসুস্থতার বদলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার ভয়াল রূপটিকেই আত্মহত্যার জন্য দায়ি করতে চাইলেন দর্শিনকেরা। এই বিচ্ছিন্নতাকে বিভিন্ন দার্শনিক কিভাবে দেখেছেন, বিচ্ছিন্নতার কারণ, রূপ নিয়ে তাঁদের যা বক্তব্য তা অতি সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক।

কান্ট (১৭২৪-১৮০৪)

বিচ্ছিন্নতা কী? প্রকৃত আমির সঙ্গে আমির দূরত্বই কি বিচ্ছিন্নতা? কান্টের পূর্বের ভাববাদীরা মনকেই একমাত্র গুরুত্ব দিতেন, তাঁদের মতে বিশ্বজ্ঞান ততটুকুই যতটা আমাদের মনের আয়নায় ধরা পড়ছে। অন্যদিকে লক হিউমের মতো অভিজ্ঞতাবাদীরা

মন নিরপেক্ষ জগতের কথা বলছিলেন। কান্ট এদের মেলাতে চাইলেন। তিনি মানুষের দুটো দিকের কথা বললেন, একটা তার সাধারণ আমি বা নিজস্ব পরিচয়(phenomenal form) এবং আরেকটা তার নিজের বিষয়ে উচ্চ ধারণা (noumenal form)। আমার মধ্যের এই দুই প্রবণতার বিরোধ। কান্ট আসলে নৈতিকতা দিয়ে 'আত্ম'র ধারণায় পৌঁছতে চাইছেন। আমরা মন দিয়ে বস্তুর বাহ্যিক অংশকে বুঝতে চাইলেও তার প্রকৃত রূপকে ছুঁতে পারিনা। কান্টের মানুষের মানব সত্তাটি মনে মনে ভাবছে যে তার মধ্যে একটি ঐশ্বরিক সত্তা রয়েছে, সে নিজের ওই সত্তাটি বিকশিত করতে চাইছে। সেই অর্থে দেখতে গেলে কান্টের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষের বিকাশ বা পরিবর্তন চাওয়ার এই স্বাধীনতা আসলে আত্মনির্যাতনও বটে। পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে এই স্বাধীনতার গভীর সম্পর্ক আছে।

হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)

কান্টের দর্শন ও তাঁর পূর্ববর্তীদের দর্শনকে মেলালেন হেগেল, তিনি দুটো শব্দের কথা বললেন Geist(মানব সত্তা)ও Idee(যুক্তি)। তিনি বললেন মন বিকশিত হলেই জ্ঞান বিকশিত হয়। তিনি বাস্তব-যাত্রা(objectification) ও বিচ্ছিন্নতা(alienation) শব্দদুটি ব্যবহার করলেন geist ও idee এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। কান্টের মত তিনিও মানুষের দুটো সত্তার কথা বলেন। একটা তার বাস্তব ও অন্যটা তার আদর্শ। এই আদর্শ সত্তার মধ্যেই থাকেন ঈশ্বর এবং সেই ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বাস্তব সত্তা। এইভাবেই বিচ্ছিন্নতার ভাবনা আসে হেগেলীয় দর্শনে। কিন্তু হেগেলের এই ঈশ্বর আর মন আসলে একই, সাধারণ ঈশ্বরের থেকে তা আলাদা। হেগেলের বাস্তব সত্তাটি নিজের থেকে

বিচ্ছিন্ন এবং সে আবার তার আদর্শ সত্তায় ফিরতে চায়। এই মানব সত্তাটি সচেতনভাবে মানুষকে জানছে এবং অচেতনভাবে প্রকৃতিকে জানছে, এই সচেতন সাবজেক্ট ও অচেতন অবজেক্ট হওয়ায় সত্তার মধ্যে বৈপরীত্য তৈরি হয় ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়। কান্টের মতোই হেগেলের বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বে মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিকলন খুঁজে পেয়েছেন।

ফয়ারবাখ (১৮০৪-১৮৭২)

হেগেল অসুখী চৈতন্য ও ঈশ্বরের কথা বলেন।ফয়ারবাখ দেখালেন যে হেগেলের ঈশ্বর আসলে মাটির অনেক কাছাকাছি অবস্থান করেন। হেগেলের তত্ত্ব দিয়ে তিনি প্রকৃত সত্যকে বিচার করতে চাইলেন না বরং ইতিহাসকে বুঝতে চাইলেন। তিনি বললেন হেগেলীয় সত্তার আত্মবিচ্ছিন্নতা আসলে মানুষের আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিফলন। মানুষ আসলে নিজেকে আদর্শ চরিত্র মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে তা নয়, এই মিথ্যে ধারণা থেকেই জন্ম নেয় আত্মবিচ্ছিন্নতা। প্রাবন্ধিক পথিক বসুর কথা ধার করে বলতে পারি,

'ঈশ্বর আর মন প্রায় একই, যেমন ঈশ্বর আর পৃথিবী এক' [iii] হেগেলের মতে মানুষ আসলে ঈশ্বরের আত্মবিচ্ছিন্নতার ঘোরে ঈশ্বরই এবং ঈশ্বরীয় ধ্যানে তার আসা-যাওয়া ওঠা-বসা। অন্যদিকে ফয়ারবাখের মতে ঈশ্বর হচ্ছে সেইসব মানুষ যারা বাস্তব জগতে আত্মবিচ্ছিন্ন। ফয়ারবাখের দর্শন থেকেই বিচ্ছিন্নতার আলোচনা ঈশ্বরকে ছেড়ে পুরোপুরিভাবে মানুষকে অবলম্বন করল, পরবর্তিতে এই আলোচনারই বিস্তার ঘটাবেন মার্ক্স।

মার্ক্স (১৮১৮-১৮৮৩)

মার্ক্স বিচ্ছিন্নতাকে দেখতে চাইলেন অন্যভাবে, মার্ক্স হেগেলের দর্শনকে অর্থনীতির সঙ্গে মেলালেন। তিনি বললেন শ্রমিকের শ্রম যখনই বাজারে যায় ও বিনিময় চুক্তিতে জড়িয়ে পড়ে এবং শ্রম পণ্যে পরিণত হয়, শ্রম আর নিজের থাকে না, তা বিচ্ছিন্ন শ্রমশক্তিতে পরিণত হয়। আগেই বলেছি মার্ক্স আসলে দর্শন ও অর্থনীতি দুই দিয়েই মানুষের মুক্তিকে বোঝেন। অর্থনৈতিক উপায়ে সমাজ মানুষকে শোষণ করে ও ফলে সে মানসিক বিকৃতিতে ভোগে। মানুষের পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্ব(separation) ও মানুষ শোষণসর্বস্ব অর্থনৈতিক চক্রে আটকে পড়ছে(surrender)। হেগেলের এই separation but surrender-কেই মার্ক্স বলছেন বিচ্ছিন্নতা। মার্ক্স শ্রম বলতে দেহ ও মনের সংমিশ্রণে গড়া ক্রিয়াশীলতাকে বুঝিয়েছেন। ধনবাদ ক্রমাগত মানসিক শ্রমশক্তিকে শুষে নেয়। মার্ক্স দুরকম বিচ্ছিন্নতাকে দেখালেন, একটি আসে অমানুষী শক্তির মধ্যমে, অপরটি মানুষী শক্তির মধ্যমে। শ্রমিকের তৈরি শ্রমজাত দ্রব্যের সঙ্গে তার বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে, পরবর্তীতে সেই দ্রব্যকেই নানাভাবে সাজিয়ে পণ্য হিসেবে তার সামনে আনা হচ্ছে। এভাবেই বিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণ হচ্ছে। বিচ্ছিন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে শ্রমজনিত সৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞানতাই এর প্রধান কারণ। মার্ক্সের উল্লেখিত এই Separation but surrender জনিত বিচ্ছিন্নতার ফলে মানুষ মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এখান থেকেই সার্বিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। মৃত পণ্য নির্ভরতার মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতা ও অসামাজিকতা বাড়ছে। এই বিচ্ছিন্নতাই মনোবিকলনের প্রধান কারণ।[iv]

ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)

বিচ্ছিন্নতা ও মনোবিকলন নিয়ে আলোচনা করেন ফ্রয়েড। মার্ক্স দেখালেন মানুষ আর তার শ্রমের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতা, ফ্রয়েড দেখালেন প্রকৃত 'আমি' ও বাহ্যিক 'আমি'র বিচ্ছিন্নতা। মূলত বিকৃতি নিয়ে কাজ করেন ফ্রয়েড। অবদমনের কথা বলেন। মানুষের আদি প্রবৃত্তি হিসাবে তিনি দেখালেন Eros ও Thanatos । শ্রমের কথা বললেন না তিনি। Thanatos-এর মাত্রা বৃদ্ধির নানা রকম ফলাফল দেখান - Authoritarian Personality, Inferiority, Idolism বা False Consciousness, সচেতন 'আমি', অচেতন 'আমি' ও মগ্নচেতন 'আমি'র ফলে 'আমি'র যে বিভাজন তাতে 'আমি'কে চিনে ওঠা কঠিন। ফলত নিজের সম্পর্কে অজ্ঞতাই স্বাভাবিক। এতে ইচ্ছাকে ধারণ করা বা ইচ্ছাশক্তিকে প্রবাহিত করার অক্ষমতা তৈরি হওয়া অসম্ভব নয়। এভাবে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা দেখিয়েছেন ফ্রয়েড কিন্তু ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা যে আসলে সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়, হতে পারে না, তা দেখান নি তিনি।[v]

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল (জার্মানি, ১৯২৩)

১৯২৩ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল, মার্ক্সবাদের অসঙ্গতিকে দেখতে চাইলেন, ফ্রয়েডকেও নতুনভাবে পড়লেন। তাঁরা বললেন আত্মসংযোগের বিনাশে তৈরি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা এবং ঘটনাটি ঘটছে টেকনোলজির মাধ্যমে। ফ্রয়েডের Pleasure Principal ও Reality Principal-এর দ্বন্দ্বকেও তাঁরা মেনে নিলেন। ফ্রয়েডের Thanatos-কে যদি আদি প্রবৃত্তি হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে মানুষের মুক্তি চাওয়ার যুক্তি কী? ভিলহেল্ম রাইখ দেখালেন যে Thanatos আসলে প্রবৃত্তিগত (Instinctual) নয়, বরং আহৃত

(Derivative) প্রবণতা। ফ্রয়েড শ্রমকে কেবলমাত্র যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়া ভেবেছিলেন, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল বলল শ্রম আসলে একটা চাহিদা বা Instinct । হারবার্ট মার্কুস তাঁর 'Eros and Civilization'-এ বিচ্ছিন্নতাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন তাঁর মতো করে। তিনি শ্রমকে যৌনতার বিকল্প বা বি-যৌন (De-sexualised) বললেন এবং সে কারণেই তার মূলে থাকে যন্ত্রণা। মার্কুস এও দেখালেন যে Pleasure Principal ও Reality Principal-এর দ্বন্দ্বে মানুষের মনে মৃত্যুর ইচ্ছে জন্ম নেয়। অর্থাৎ, Eros বহির্দুনিয়ার চাপ সামলাতে না পেরে তৈরি করছে Thanatos, এটি কোন মূল প্রবৃত্তি নয় এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার একমাত্র উপায় হল শ্রম। তিনি Thanatos দিয়ে মর্ষকাম ও ধর্ষকামকে বিচার করে, শোষক ও শোষিতের ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিলেন। মার্কুস দেখাচ্ছেন যে সুখনীতি ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বের ফলে তৈরি হচ্ছে শোষক শোষিত। সমাজ অর্থনীতির চাপে শ্রম বিচ্ছিন্ন এবং পাশাপাশি 'আমি'র আমিত্ব মারা যাচ্ছে। আমি আমার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছি না। এটাই তৈরি করছে ঘাতক আত্মবিচ্ছিন্নতা।[vi]

২.২ আত্মহত্যা ও কয়েকটি তত্ত্ব

আধুনিক সময়ে পৌঁছনোর আগে প্রাচ্যের দার্শনিকরা কখনোই আত্মহত্যাকে খতিয়ে দেখতে চাননি। কিন্তু পাশ্চাত্যে এই আলোচনার ধারাবাহিক ইতিহাস আছে।

২.২.১ জ্যঁ পিয়ের ফ্যালরেট

১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের মনোবিদ Jean -Pierre Falret প্রথম আত্মহত্যাকে যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধার চেষ্টা করেন।[vii] তিনি আত্মহত্যার কারণ হিসেবে মূলত চারটি দিকের কথা বলেন।

১. বংশ-পরম্পরা জনিত (Heredity predisposing)

২. আবেগজাত তাৎক্ষণিকতা জনিত (Accidental direct - passion)

৩. শারীরিক অসুস্থতা / যন্ত্রণা জনিত (Accidental Indirect (body pain, disease)

৪. সংস্কৃতি বা ধর্মোন্মাদনা জনিত (Civilization or religious fanaticism)

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এই সময় বারবার দার্শনিকেরা আলোচনা করতে থাকেন আত্মহত্যাকে অসুস্থতা বা উন্মাদনা হিসাবে দেখা হবে কি না? Jean-Etienne Dominique Esquirol, Alexandre-Jacques-Francois, Brierre de Boismont, Lisle, Adolph Wagner, Enrico Morselli, Thomas Cr Masaryk প্রভৃতি বহু ইউরোপীয় দার্শনিক এই সময় আত্মহত্যা নিয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করেন এবং আলোচনা করেন। আত্মহত্যা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটো কাজ হলো উনিশ শতকের একদম শেষার্ধে এসে -

১. Emile Durkheim -এর 'Le Suicide' (১৮৯৭)[viii]

২. William James-এর 'Is Life Worth Living?' (১৮৯৫)[ix]

২.২.২ মার্ক্স

আত্মহত্যা বিষয়ে মার্ক্সের ধারণা: স্বাধীনতা বিষয়ে মার্ক্সের আগ্রহ ছিল এবং সামাজিক নানা পরিস্থিতিতে সেই স্বাধীনতা খর্ব হলে তার পরিণাম হিসেবেই আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আসে মার্ক্সের লেখায়। ১৮৪৬ সালে মার্ক্স আত্মহত্যা বিষয়ে একটি লেখা লেখেন। ফরাসী পুলিশ অফিসার Jacques Peuchet প্যারিসের মহিলাদের আত্মহত্যা নিয়ে যা লিখেছিলেন তার অনুবাদ সহযোগে নিজের কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন এতে মার্ক্স, যা পরে

Eric Plaunt ও Kevin Anderson সম্পাদিত 'মার্ক্স অন সুইসাইড' হিসেবে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই লেখাটি জনপ্রিয় নয় খুব একটা, কিন্তু কোনরকম ব্যক্তিগত ডিপ্রেশন থেকে তিনি এই রচনাটি লিখেছেন বলে জানা যায় না। যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ আত্মহত্যায় উদ্যত হয় তা বদলাতে চেয়েছেন মার্ক্স। এই Alteration of system-এর বিষয় থেকেই তিনি আত্মহত্যার আলোচনায় ঢোকেন। সামাজিক অবস্থা ও সম্পর্কগুলি কিভাবে ব্যক্তিমানুষকে অন্যের সম্পত্তিতে পরিণত করে, তা তুলে ধরেন তিনি। Peuchet-এর একটি প্রতিবেদন তুলে ধরেন তিনি –

"The unfortunate woman was condemned to unbearable slavery and M. de M. exercised his slaveholding right, supported by the civil code and the right of property. These were based on social conditions which deem love to be unrelated to the spontaneous feelings of the lovers, but which permit the jealous husband to fetter his wife in chains, like a miser with his hoard of gold, for she is but a part of his inventory" [x]

পারিবারিক হিংসার ফলস্বরূপ দাম্পত্যে স্বামীর ভয়াবহ আচরণের কথা বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কিভাবে মানুষ একটি অধিকৃত 'বস্তু'তে পরিণত হয়।

আমরা আগেই দেখেছি হেগেলের তত্ত্ব অনুসরণ করে মার্ক্স তাঁর রচনায় বিচ্ছিন্নতার কথা এনেছেন। এই বিচ্ছিন্নতা মানুষের নিজের থেকে বিচ্ছিন্নতা, শ্রমজাত ফসল থেকে বিচ্ছিন্নতা। Peuchet-এর প্রতিবেদনে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতার প্রভাব আত্মহত্যাকারীর

উপর দেখা যায়। মার্ক্স তাঁর এই রচনায় বুর্জোয়া সমাজের লিবার্টির ধারণার সমালোচনা করেন। লিবার্টির ধারণা অনুযায়ী যা অন্যকে আঘাত করে না, তা করা আমার অধিকার। এই ধারণা মানুষের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং মানুষের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। Peuchet-এর এই প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে মার্ক্স মানুষের মানসিক দিক নিয়ে যে বক্তব্যটি রাখেন তা অনেকটা এইরকম,-

"Those who are most cowardly, who are least capable of resistance themselves, become unyielding as soon as they can exert absolute parental authority. The abuse of that authority also serves as a cruel substitute for all of the submissiveness and dependency people in bourgeois society acquiesce in, willing or unwillingly"[xi]

এরিক ফ্রমের মত অনুসরণ করে মার্ক্সের এই বক্তব্য অনুযায়ী sadomasochistic চরিত্রের কথাই উঠে আসে। মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে বুর্জোয়া সমাজ জেনে বা না জেনে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে। এই বুর্জোয়া সমাজ কিভাবে মহিলাদের সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং আত্মহত্যা প্রসঙ্গে পিতৃতন্ত্র ও মেল ডমিনেশনের কথা আসে।

২.২.৩ থমাস জি মাসারিক

আত্মহত্যার সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক বারবার বদলেছে। উনিশ শতকের আগে আত্মহত্যা নিয়ে মূলত নীতি বিষয়ক আলোচনা হয়েছে। নৈতিক ভাবে আত্মহত্যা সমর্থন যোগ্য কি না, সেই আলোচনাই বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। উনিশ শতকের পরেও আত্মহত্যার সঙ্গে ব্যক্তিগত মাত্রা জুড়ে থাকে ঠিকই কিন্তু ক্রমশ আত্মহত্যার পেছনে থাকা বাহ্যিক

কারণগুলির দিকেও নজর পড়ে দার্শনিকদের। আত্মহত্যার সঙ্গে কোন সামাজিক বা মনস্তাত্ত্বিক কারণ জুড়ে আছে কি না, সেদিকেও নজর পড়ে। এইসময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাম অবশ্যই Durkheim, কিন্তু তাঁর আগেই ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রবন্ধে এই নিয়ে জরুরি আলোচনা করেন মাসারিক। দরিদ্র চেকোশ্লোভাকিয়ার পরিবারে জন্ম নেওয়া মাসারিক প্রথম থেকেই সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে সমাজের নৈতিকতা ও স্বাভাবিকতার ভিত্তি বলে মনে করেন ধর্মকে। ধর্মের প্রতি ভরসা কমার ফলেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় এবং মানুষের দুঃখবোধ বাড়ে। ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে ধ্বংস করে অথচ ধর্মের মত কোন ধারণ করার ভিত্তি তৈরি করতে পারে না মানুষের মনে, বিজ্ঞান যেহেতু নৈতিকতার কোন পাঠ দিতে পারে না তাই মানুষ দিশা হারিয়ে,মানসিক অবসাদের শিকার হয় ও আত্মহননের মত সিদ্ধান্ত নেয়- এটিই ছিল তাঁর মূল উপজীব্য। ডুর্খেইমের মত তিনিও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের উপর পরীক্ষা করে আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেছেন যে আত্মহত্যা মোটেই উন্মাদ অবস্থায় নেওয়া কোন হঠকারী সিদ্ধান্ত নয় বরং তিনি আত্মহত্যাকে সচেতন সিদ্ধান্ত বলতে চেয়েছেন -

“who longs for death as such and is certain that his death will be brought about by his own action or failure to act.” [xii]

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে লিঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মাসারিক মনে করেছেন মহিলারা যেহেতু অধিক নীতিবাদী ও ধার্মিক এবং পুরুষের তুলনায় কম রাজনীতি সচেতন তাই তাদের মধ্যে আত্মহত্যার হার কম। অর্থনৈতিক চিন্তাও তাদের কম -এটিকেও তিনি

কারণ দেখান। বলা বাহুল্য তিনি মূলত ঘরে সংসার কর্মে লিপ্ত, সন্তান পালনে ব্যস্ত এমন এক মহিলাদের কথা বলেন যারা পুরুষের থেকে কম শিক্ষিত এবং যাদের নিজের রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কোন জীবন নেই। বিবাহ প্রসঙ্গেও তাঁর বক্তব্য খানিকটা সেকেলে,নীতিবাগিশ। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যায় -

"Women living in concubinage show a suicide frequency three times as large as men" [xiii]

তিনি এবং ডুর্খেইম দুজনেই মনে করেছেন যে পরিবারের মধ্যে থাকা মানুষ আত্মহত্যার মত ঘটনার থেকে খানিকটা সুরক্ষিত, বিবাহ পুরুষকে এ বিষয়ে যতটা সুরক্ষা প্রদান করে মহিলাদের ক্ষেত্রে তথ্য ততটা ইতিবাচক নয় বলেই মনে করেছেন তিনি।

আগেই বলেছি উচ্চ শিক্ষাকে তিনি আত্মহত্যার উচ্চ হারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছেন। এর কারণ হিসেবে তিনি অসম্পূর্ণ শিক্ষার কথা বলেন যা মানসিক বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। যে সকল দেশে শিক্ষা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়, এবং নেহাতই তাত্ত্বিক সেখানে আত্মহত্যার হার অনেক বেশি বলে দাবি করেন তিনি।

লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থান, শিক্ষার পাশাপাশি তিনি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সঙ্গে আত্মহত্যার সম্পর্ককেও খতিয়ে দেখতে চান। গোঁড়া চার্চগুলির কর্তৃত্ব ভক্তদের ধর্মবিশ্বাসকে দৃঢ় করে বলে মনে করেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে তুলনা টানেন তিনি।

২.২.৪ এমিল ডুর্খেইম

আগেই বলেছি Durkheim তাঁর গ্রন্থে আত্মহত্যা কে দেখলেন একটি ‘Collective Phenomenon’ হিসাবে। আত্মহত্যার নানারকম কারণ ও বৈশিষ্ট্য কে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তার বিপরীত দিকের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি দেখালেন যে সমাজে ট্র্যাডিশনাল ভ্যালুর অভাবেই তৈরি হয় Anomic Suicide। তিনি তার গবেষণার ফলাফল রূপে দেখছেন Egoistic Suicide, Altruistic Suicide, Anomic Suicide ও Fatalistic Suicide। প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফল হল Egoistic Suicide, আর এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পিছনে রয়েছে যুক্তিবাদ ও যে কোনো বিষয়কে নিজস্ব ভাবনা দিয়ে বিচার করার অধিকারবোধ। শিক্ষার প্রসারও মানুষকে তার নিজস্বতা বিষয়ে সচেতন করে। Egoistic Suicide-কে ডুর্খেইম মূলত তিনটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেন - ক) ধর্মীয় সমাজ, খ) পারিবারিক সমাজ এবং গ) রাজনৈতিক সমাজ। তিনি নানা বয়স, লিঙ্গ, দেশ ভেদে আত্মহত্যার কারণগুলি খুঁজবার চেষ্টা করেছেন। আত্মহত্যার পিছনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়াও সমাজের প্রভাব কত গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি দেখিয়েছেন।

এছাড়া তিনি Altruistic Suicide হিসেবে দেখান সেইসব আত্মহত্যার ঘটনাকে যা প্রকৃত সমাজ, ধর্ম বা ব্যক্তিমানুষের জন্য আত্মোৎসর্গ হিসাবেই পরিচিত। যেমন কৌমের বয়স্ক মানুষেরা, খাদ্যোৎপাদন বা অর্জনে অক্ষম, তাই তাঁরা অন্যের ওপর বোঝা না হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতেন, কিংবা স্বামীর স্ত্রীর সহমরণ এবং মালিকের মৃত্যুতে তার সহচরের মৃত্যুর পথ অনুসরণ। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে এই ধরণের আত্মহত্যায় সমাজের ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ এক্ষেত্রে হত্যার আদেশ দেয় না

ঠিকই কিন্তু তা যেন ব্যক্তিতে একপ্রকার বাধ্য করে আত্মহননে। ব্যক্তি মানুষ কখনও তার দায়িত্ব বা কর্তব্যজ্ঞানে, কখনো নিছক আত্মত্যাগের আনন্দে আত্মহননে প্রবৃত্ত হয় না এমন নয়, কিন্তু বেশিরভাগ উপায়ান্তর থাকে না। এছাড়াও থাকে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের হাতছানি।

Altruistic Suicide-কে তাই ডুর্খেইম দেখলেন তিনরকম ভাবে -

ক) বাধ্যতামূলক আত্মহত্যা (Obligatory Altruistic Suicide)

খ) ঐচ্ছিক আত্মহত্যা (Optional Altruistic Suicide)

গ) স্বার্থহীন আত্মোৎসর্গ (Acute Altruistic Suicide)

এছাড়া তিনি বললেন Anomic Suicide-এর কথা। তিনি দেখালেন যে দারিদ্র্য নয় আসলে সমাজের নড়বড়ে অবস্থান কিভাবে মানুষের আত্মহত্যাকে প্রভাবিত করে। পুঁজি যখন সমাজের সমস্ত কিছুর চালক হয়ে ওঠে তখন মানুষের ক্রমাগত বেড়ে ওঠা চাহিদা তাকে এক ঠিকানাহীন লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দেয়। সমাজও কোনো রকম উপায় বা নৈতিক ডিসিপ্লিন ব্যক্তিমানুষকে দিতে পারে না। ফলত ইন্ডিভিজুয়ালের অর্থনৈতিক চাহিদা এবং পণ্যের প্রতি আগ্রহ তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় নিজের থেকে এবং সমাজের অন্যদের থেকে, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হয় আত্মহত্যার মত চরম আত্মকেন্দ্রিক একটি সিদ্ধান্ত। Anomic Suicide-এর একদম সম্পূর্ণ বিপরীত ধরন হিসাবে ডুর্খেইম Fatalistic Suicide-এর কথা বলেন। সমাজ যদি ব্যক্তিমানুষের মনে কোনো নৈতিকতার বোধ তৈরি করতে না পারে তখন তা থেকে তৈরি হওয়া আত্মহত্যা হল

Anomic Suicide, আর সামাজিক রীতি, নিয়মে জর্জরিত মানুষের বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে আত্মহত্যা তাকে ডুর্খেইম বলছেন Fatalistic Suicide।

তিনি মনে করেছেন একীভবন(ইন্টিগ্রেশন) ও নিয়ন্ত্রণ(রেগুলেশন),সমাজের এই দুইটি বৈশিষ্টের প্রভাবেই আত্মহত্যার হার বাড়ে বা কমে। সমাজে একীভবন ও নিয়ন্ত্রণ কম বেশি হলে আত্মহত্যার কোন একটি ধরণ বাড়ে বাসামাজিক একীভবন কমলে Egoistic Suicide বাড়ে, আবার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কমলে Anomic Suicide বাড়ে। মাসারিকের মত তিনিও যে আত্মহত্যাকে সচেতন সিদ্ধান্ত বলে মনে করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

".. the term suicide is applied to all cases of death resulting directly or indirectly from a positive or negative act of the victim himself, which he knows will produce this result." [xiv]

ডুর্খেইমের বইটি নিয়ে কথা প্রসঙ্গে টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটির Cristina Bradatan বেশ কিছু জরুরি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। পূর্ব ইউরোপের বেশ কিছু দেশের তথ্যের উপর ভিত্তি করে ডুর্খেইম সিদ্ধান্তে আসেন যে -

ক) জোরদার রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যে সমবেত অনুভূতি সৃষ্টি হয় তা থেকে সামাজিক একীভবন সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায় ও তারই পরিণতি হিসেবে আত্মহত্যার হার কমে।

খ) মহিলা ও পুরুষদের মধ্যেকার আত্মহত্যার হারের পার্থক্যের জন্য তিনি দুজনের ভিন্ন প্রকৃতির কথা বলেন, মহিলারা অনেক বেশি গোঁড়া এবং কিছু নির্দিষ্ট

বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন তিনি। Bradatan উদাহরণের মাধ্যমে দেখান যে মাসারিকের মত ডুর্খেইমও আসলে বুর্জোয়া ব্যবস্থার বাড়িতে থাকা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির মহিলাদের কথাই বলতে চেয়েছেন।

গ) যেহেতু তিনি মনে করেন যে ইন্টিগ্রেশনের ফলে আত্মহত্যার হার কমে সুতরাং পরিবারের ভাবনা তাঁর ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। তিনি মনে করেছেন পরিবারের থেকেই আত্মোৎসর্গের ধারণা জন্ম নেয়।

বিবাহ, উচ্চশিক্ষা বা ধর্মের সঙ্গে আত্মহত্যার সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর বক্তব্য মাসারিকের বক্তব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

২.২.৫ কার্ল মেনিঙ্গার

আমেরিকার মনোসমীক্ষণের যে ধারা তার প্রায় আদিপুরুষ বলা যায় কানসাসের মনোবিদ কার্ল মেনিঙ্গারকে। তাঁর বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল *Man Against Himself* (১৯৩৮)

এই বইতে তিনি ফ্রয়েডের এরস ও থ্যানাটস-এই দুই প্রবৃত্তির ধারণাকে মেনে নিচ্ছেন। তিনি বলছেন ওই সময়ে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা শুধু নয় ওই শব্দটি উচ্চারণ করাও ছিল একটা ট্যাবু।

"...some people will not say the word, some newspapers will not print accounts of it, and even scientists have avoided it as a subject for research." [xv]

তিনি এ কথাও বলেন যে কাল্পনিক আত্মহত্যা নিয়ে বহু সাহিত্য, নাটক তৈরি হলেও আত্মহত্যাকে যুক্তিযুক্তভাবে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বা মনোবিজ্ঞান দিয়ে কেউ ব্যখ্যা করতে চান নি, এর পেছনেও কারণ হিসেবে তিনি ট্যাবুর কথাই বলেন।

আত্মহত্যা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিঙ্গ অনুযায়ী এর নানা দিক তুলে ধরেন। পরিসংখ্যান বিচার করে তিনি দেখান যে মহিলাদের তুলনায় তরুণ পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি, যদিও মহিলারা অনেক বেশি সংখ্যায় আত্মহত্যায় উদ্যত হয়। তিনি বলেন যে বিশ বছরের তরুণের তুলনায় চল্লিশ বছরের পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা প্রায় দ্বিগুণ। মহিলাদের মধ্যে এই ধরনের কোন বয়সজনিত পরিসংখ্যানের পার্থক্য দেখা যায় না। পুরুষ মহিলাদের এই তুলনামূলক পরিসংখ্যান ছাড়াও তিনি বলেন যে বসন্তে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি হয়, বিবাহিতদের তুলনায় অবিবাহিতদের মধ্যে, শান্ত সময়ের চেয়ে যুদ্ধপরিস্থিতিতে এবং ক্যাথলিকদের তুলনায় প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি।

আত্মহত্যার কারণ খুজতে গিয়ে তিনি কোন সহজ পন্থা গ্রহণ করতে চান নি। তিনি বলেছেন যে আত্মহত্যাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে বারবার অসুস্থতা, অসহায়তা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অপমান, হতাশা বা প্রেমে ব্যর্থতার মত পার্থিব কারণ খোঁজার চেষ্টা করা হলেও এইভাবে সুস্পষ্ট কোন কারণ দিয়ে একে বেঁধে ফেলা সম্ভব নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে প্রচলিত একটি ফর্মুলার কথা বলেন-

"Suicide is an escape from an intolerable life situation. If the situation be external,visible one, the suicide is brave; if the struggle be an internal, invisible one, the suicide is crazy." [xvi]

কিন্তু এস্কেপের এই ধারণাকে তিনি প্রশ্ন করেছেন। তিনি বলছেন আত্মহত্যার পর কিছুই থাকে না, তাহলে 'কিছু না' এর এই ধারণা অনুযায়ী পালিয়ে যাওয়ার কোন স্থান বা অবস্থান নেই। সুতরাং বেড়াতে যাওয়া, ঘুমিয়ে পড়া বা নেশার মত এটা পালানোর একটা স্থান বা অবস্থান হতে পারে না। এটা সাময়িক কোন অবস্থা নয়, যদিও আত্মহত্যায় উদ্যত মানুষটি যুক্তিহীন এই ধারণারই বশবর্তী হন অধিকাংশ সময়ে।

মেনিঙ্গার মনে করেন আত্মহত্যার তিনটি উপাদান-

১. হননের ইচ্ছা (wish to kill)

২. খুন হওয়ার ইচ্ছা (wish to be killed)

৩. মৃত্যুর ইচ্ছা (wish to die)

ভিন্ন ভিন্ন আত্মহত্যার ক্ষেত্রে অনেক সময়েই এই তিনটি উপাদানের একেকটি অপরটির তুলনায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

হত্যার ইচ্ছা প্রসঙ্গে তিনি ফ্রয়েড বর্ণিত ডেথ ইন্সটিঙক্ট, ধ্বংসের ইচ্ছা ও থ্যানাটসের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেখান আত্মহত্যা ছাড়াও কিভাবে বহু ক্ষেত্রে নিজের প্রতি একধরনের ধ্বংসের প্রবণতা কাজ করে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সাময়িক ক্ষোভ ও অ্যাংজাইটি পর্বের পরে অন্য কোন দিকে মনোযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু যাদের কথা তিনি

আলোচনা করেন তাদের ভালোবাসা ও ঘৃণার আধারগুলি হারিয়ে যাওয়ায় তারা 'point of origin'-এ, অর্থাত্ 'the individual himself'-এ পৌঁছে গেছে, উদাহরণ স্বরূপ মেনিঙ্গার বলেন –

".. a young boy hanged himself who had been scolded by his father. His hate was so great that he was willing to sacrifice his life. It must have been his father whom he really wished to kill." [xvii]

এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন আইডেনটিফিকেশন বা ইন্ট্রোজেকশনের কথা, যেখানে একজনের শরীরকে অন্যের শরীর মনে করে তদ্রুপ আচরণ করা হয়।

মেনিঙ্গার দেখান যে ক্লিনিকাল পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী যাদের নিজের প্রতি ধ্বংসাত্মক প্রবণতা থাকে তাদের মধ্যে সাইকোলজিক্যাল ইমম্যাচিওরিটি লক্ষ্য করা যায়। যেভাবে দুগ্ধপায়ী শিশু কিছুতেই দুধ খাওয়া বন্ধ করতে চায় না, তেমনিই এই ধরনের মানুষেরা কোন কিছুতে বাধা পেলে তা সহ্য করতে পারে না। চিকিত্সাশাস্ত্রের ভাষায় এদের 'oral' পার্সোনালিটি বলা হয়। এদের রোগ হল মেলানকোলিয়া। এরা নিজেদের যতটা ভালোবাসে, তার চেয়ে বেশি নিজেকে ঘৃণা করে। এরা নিজেদের চিন্তা, দুঃখ, ইচ্ছেকে সাধারণ মানুষের মত দমন করতে পারে না। "wish to kill"-এর ক্ষেত্রেও এরকম ইচ্ছে সকলেরই হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই ইচ্ছেকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এই ওরাল পার্সোনালিটিরা সেটা পারে না। যে মানুষটি আত্মহত্যা করছে সে অবশ্যই একটি মানসিক প্রবৃত্তি দ্বারা চলিত হচ্ছে এবং সেই ইচ্ছেটি হল খুব করবার প্রবৃত্তি।

"....no matter what sophistry is invoked to attempt to justify or glorify suicide the fact remains that it is a murder, a climax of destruction and has purposes, motives and consequences related to that inescapable fact." [xviii]

আত্মহত্যা আসলে এক বিশেষ ধরনের মৃত্যু যেখানে মৃত্যুর পাশাপাশি হত্যার ইচ্ছা ও খুন হওয়ার ইচ্ছার লুকিয়ে থাকে। মৃত্যুর থেকে আলাদা এই খুন হওয়ার ইচ্ছা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন –

"...being killed is the extreme form of submission just as killing is the extreme form of aggression." [xix]

আসলে এক্ষেত্রে বিবেকের গভীর ভূমিকা আছে, সচেতনভাবে না হলেও অসচেতনে থেকে যায় এর একটা অংশ। এই বিবেককে মনে করা হয় আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির একটি অংশ, যা বাইরের দিকে চালিত হওয়ার পরিবর্তে নিজের দিকে নির্দেশিত হয়। আসলে খুন হওয়ার এই ইচ্ছে অসচেতন মনের একটা ইচ্ছে, কখনো কখনো সচেতনভাবে একথা মনে এলেও সে ইচ্ছে অবদমিত হয়। এই অবদমিত আবেগের সঙ্গে অপরাধবোধ যুক্ত হয়ে খুন হওয়ার ইচ্ছে জাগিয়ে তোলে যা থেকে আত্মহননের ইচ্ছে তৈরি হয়।

আত্মহত্যার পদ্ধতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মেনিঙ্গার দেখান যে পুরুষদের মধ্যে সক্রিয় আক্রমণাত্মক (অ্যাক্টিভ অ্যাগ্রেসিভ) ও মহিলাদের মধ্যে নিষ্ক্রিয় ধারনক্ষম (প্যাসিভ রিসেপ্টিভ) পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ সময়েই পুরুষেরা বন্ধুকের গুলি এবং মহিলারা বিষপান বা জলে ডোবার মত পদ্ধতি বেছে নিচ্ছে। নিজে খুন হওয়ার মধ্যে

আসলে সর্বশক্তিমান হওয়ার একটা ইচ্ছে লুকিয়ে থাকে। আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবন মৃত্যুর চালক হয়ে ওঠা যায়। সচেতন ও অবচেতন ইচ্ছের মধ্যে যদিও পার্থক্য আছে। সচেতনভাবে মৃত্যুর ইচ্ছেকে ডেথ ইন্সটিংক্ট বলা যায় না। দার্শনিক ও দুঃখবিলাসী রোগীদের মধ্যে এই মৃত্যু প্রবৃত্তি তীব্রতর হয়।

মেনিঙ্গার তিন ধরনের আত্মহত্যার কথা বলেন

১. ক্রনিক সুইসাইড

২. ফোকাল সুইসাইড

৩. অর্গানিক সুইসাইড

হঠাত্ নিজেকে শেষ করে দেওয়ার বদলে ক্রমশ, ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়াকেই তিনি বলছেন ক্রনিক সুইসাইড। মদ্যাসক্তিকে তিনি অতি ধীর উপায়ে নিজের ধ্বংশসাধন বলে মনে করেছেন। এছাড়াও তিনি শহীদ হওয়ার মত ঘটনগুলির উল্লেখ করে তাকে দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভাগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে নিজের অবচেতনেই মানুষ এমন পরিস্থিতির শিকার হয় যা টিআর ধ্বংস ডেকে আনে। শহীদদের মধ্যে সাধারণত আত্ম ধ্বংসসাধনের পরিবর্তে সামাজিকও উপযোগিতা খোঁজার চেষ্টা করা হয়। মারাত্মক গবেষণায় রত বিজ্ঞানী, দেশের হয়ে লড়াইয়ে যাওয়া সৈনিকরা আসলে আত্মহত্যার বদলে সামাজিকও প্রয়োজনে লাগছে বলে মনে করা হয়। Nietzsche যেমন বলেন যে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে কেবল দুধরনের আত্মহত্যাকে সদর্থক ভাবে দেখা হয়,-

১.শহীদ হওয়া বা আত্মোৎসর্গ

২.যোগীদের ধীর প্রক্রিয়া আত্মত্যাগ

বাস্তব জ্ঞানের তুলনায় তারা তাদের দৃঢ় বিশ্বাসের প্রতি বেশি অর্পিত হওয়ায় অবচেতনভাবেই তারা নাটকীয় ভাবে আত্মহননের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজের চোখে তারা নায়ক বা সাধু হলেও চিকিত্সার পরিভাষায় তারা মনোরোগী এবং খানিকটা বোকাও বটে। এই আত্মহননের পেছনে নিজেকে শাস্তি দেওয়া, ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি, প্রেমের সমস্যা প্রভৃতি নানা উপাদান থাকে। মদ্যাসক্তি সাময়িক ভাবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয় বলে অনেকেই এটিকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। বহু ক্ষেত্রে সাফল্যের উদযাপন করতেও অনেকে মদ খায়। ঠিক তেমনিই সাফল্য অর্জনের পরেও বহু মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

ফোকাল সুইসাইডের ক্ষেত্রে সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ে শরীরের কোন বিশেষ অংশের ওপর। নিজের ধ্বংসসাধনের জন্য এক্ষেত্রে অঙ্গচ্ছেদ, নিজেকে কষ্ট দেওয়া বা অকারণ সার্জারির মত ঘটনা ঘটিয়ে থাকে মানুষ।

মেনিঙ্গার আত্মহত্যাকে একটা মেডিকাল সমস্যা হিসেবে দেখতে চাইছেন। তিনি মনে করছেন এটি মনোবিজ্ঞান ও চিকিত্সা সংক্রান্ত একটি বিষয়। তিনি ইউরোপের জর্জ গ্রডেক ও স্মিথ ফ্লাই জেলাইফের মত তুলে ধরে দেখাচ্ছেন-

"...the deep insistent cravings of the personality which in neurological terms are designated 'endogenous stimuli' are transmitted in various ways to organs as well as to muscles." [xx]

রসায়নিক উপায়ে বা সরাসরি এই ধ্বংসের ইচ্ছে সংক্রামিত হয় মানুষের হরমোন ও স্নায়ুর মধ্যে দিয়ে। মেনিঙ্গার এই 'sense of self destruction via somatic disease' বা অর্গানিক সুইসাইডকে তাঁর নিজের আবিষ্কার বলছেন।

২.২.৬ অ্যান্ড্রু সলোমন

মার্কিন লেখক অ্যান্ড্রু সলোমন তাঁর *দ্য নুনডে ডেমন- অ্যান অ্যানাটমি অফ ডিপ্রেশন* (২০০১) বইতে আত্মহত্যা এবং বিষাদ নিয়ে বিশদ ও যুক্তিযুক্ত একটি আলোচনা করেন। আত্মহত্যাকে তিনি বিষাদের একটি লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেন এবং বলেন যে বহু বিষাদগ্রস্ত মানুষ যেমন আত্মহত্যাপ্রবণ হতে পারে তেমনিই আত্মহত্যায় সামিল মানুষের মধ্যে বিষাদের কোন লক্ষণ নাও থাকতে পারে। [xxi] তিনি জর্জ হাও কোল্টের 'দ্য এনিগ্মা অফ সুইসাইড' বই থেকে দেখান যে বহু চিকিত্সক মনে করেন যে ডিপ্রেশন বা বিষাদের সঠিক চিকিৎসা করতে পারলেই রোগীর আত্মহত্যার প্রবণতা কমানো যায়। অথচ দেখা যায় বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই বা বিষাদ কাটিয়ে উঠেছে এমন মানুষের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বাড়ে। সুতরাং আত্মহত্যাকে আসলে বিষাদের লক্ষণ না বলে বলা যায় এটি কখনো কখনো বিষাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাক একটি স্বতন্ত্র সমস্যা। মরে যেতে চাওয়া ও নিজেকে মেরে ফেলতে চাওয়ার মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে। বিষাদের ক্ষেত্রে মূলত আত্মহত্যা হল তত্কালীন অবস্থা থেকে, সচেতন অবস্থা থেকে, মুক্তির প্রচেষ্টা। কিন্তু কেবল মরে যেতে চাইলেই আত্মহত্যা হয় না, এক্ষেত্রে নিজেকে মেরে ফেলার এক সক্রিয় ভূমিকার প্রয়োজন হয়।

অ্যান্ড্রু সলোমন চার ধরনের মানুষের কথা বলেন যারা আত্মহত্যা করতে চায়,

১. আবেগতাড়িত আত্মহত্যা (ইমপালসিভ সুইসাইড)

এই ক্ষেত্রে কোন রকম চিন্তা না করেই মানুষটি আত্মহত্যায় সামিল হয়, এই ধরনের আত্মহত্যা হঠাত্ করে ঘটে। বাহ্যিক কোন ঘটনা বা কারণ খুব স্পষ্টতই থাকে এই আত্মহত্যার পিছনে।

২. প্রতিশোধ স্পৃহা জনিত আত্মহত্যা (সুইসাইড অ্যাজ রিভেঞ্জ)

এই দ্বিতীয় ধরণের আত্মহত্যায় মানুষ কোন প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা থেকেই আত্মহত্যার সম্মুখীন হয়, এই ধরনের আত্মহত্যা আসলে জীবনের সমাপ্তি ঘটানোর চেয়েও বেশি করে চায় নিজেকে বা নিজের অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দিতে।

৩. সমস্যামুক্তির আশায় আত্মহত্যা (সুইসাইড থ্রু আ ফল্টি লজিক)

এই ধরনের আত্মহত্যায় মানুষের মনে একধরনের ভুল ধারণা তৈরি হয় যে তার এই অসহনীয় সমস্যাগুলির থেকে মুক্তির একমাত্র পথ আত্মহত্যা। এই ক্ষেত্রে মানুষ পূর্ব পরিকল্পনা করে, চিঠি লিখে আত্মহত্যার কারণ বর্ণনা করে, তারা মনে করে যে আত্মহত্যা যে শুধু তাকে সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে তাই নয় বরং যারা তাকে ভালোবাসে তাদেরও স্বস্তি দেবে, যদিও বাস্তবে এর উল্টোটাই হয়।

৪. যৌক্তিক আত্মহত্যা (সুইসাইড থ্রু আ রিজনবল লজিক)

অ্যান্ড্রু সলোমন মনে করেন এই শেষ ধরনের আত্মহত্যার পিছনে থাকে কিছু ন্যায্য কারণ। এর শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক অস্থিরতা বা জীবনের কোন পরিবর্তনের

ফলস্বরূপ আর জীবনযন্ত্রণা ভোগ করতে চায় না। তারা মনে করে জীবনে তারা যে আনন্দ পাবে, যন্ত্রণা পাবে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। হয়ত বা এর এদের ভবিষ্যত্ সম্পর্কে সঠিক বিচার করছে না তবু এদের ভাবনা খানিকটা যুক্তিপূর্ণ এবং কোন ওষুধ বা চিকিত্সা এদের ভাবনার পরিবর্তন ঘটায় না।

যারা আত্মহত্যা করে তারা এ কেবলমাত্র নিরাশার বোধ থেকেই করে এমন নয়, বরং তারা কিছুক্ষণের জন্য নিজস্ব সচেতন ভাবনাকে ভুলে যায়। যদি থাক বা না থাকার ভাবনার কথা বলা হয়, তাহলে বলতে হবে যে না থাকা সম্পূর্ণ নঞর্থক ধারণা, অর্থাত্ এরূপ কোন অবস্থানই প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়।

এইজন্যই অ্যালবার্ট কামু আত্মহত্যাকে ‘truly serious philosophical problem’ বলেছেন।[xxii]

অন্যদিকে সোপেনহাওয়ারের মতে আত্মহত্যা যেন প্রকৃতির প্রতি মানুষের ছুঁড়ে দেওয়া একটি প্রশ্ন যে তার মৃত্যু কী পরিবর্তন বয়ে আনবে প্রকৃতিতে বা সমাজে।

জর্জ স্যান্টায়ন মনে করেন যে মৃত্যু এতটাই অবশ্যম্ভাবী যে বহু মানুষ এর জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে দ্রুত এর নিষ্পত্তি ঘটাতে চায়।

সোপেনহাওয়ারের মতে যৌক্তিক আত্মহত্যা বলে আসলে কিছু হয় না। যদিও তিনি যৌক্তিক আত্মহত্যার পক্ষেই কথা বলেন, তাঁর মতে, কোন আত্মহত্যাটি যৌক্তিক আর কোনটি নয় তা আলাদা করা সম্ভব হয় না সবসময়। অধিকাংশ সময়েই সাময়িক ও সামান্য বিষয়ে মানুষ আত্মহত্যায় সামিল হয় সুতরাং যৌক্তিক আত্মহত্যার সপক্ষে ব্যাখ্যা

ক'রে, কিছু মানুষের আত্মহত্যাকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বহু মানুষের আত্মহত্যাকে আটকানোর মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেন ব্যাহত না হয়, সেটাই ছিল তাঁর বক্তব্য।

থমাস সাজ বলেন আত্মহত্যা একটি মৌলিক মানবিক অধিকার, আত্মহত্যার সপক্ষে তিনি বক্তব্য না রাখলেও এটাই বলতে চান যে সমাজের অধিকার নেই কারো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার।

মনোবিদ এডউইন স্নেইডম্যান আত্মহত্যাকে 'পাগলামি' আখ্যা দিয়ে আত্মহনন বিরোধী আন্দোলন তৈরি করেন। তাঁর মতে আত্মহত্যার সময় আসলে মানুষের ভাবনা ও অনুভূতির মধ্যে একটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়, তাই মানুষের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দেয়, থমাস সাজের একদম বিপরীত বক্তব্য রেখে স্নেইডম্যান আত্মহত্যাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন। স্নেইডম্যানের মতে আত্মহত্যা হল- "murder in the one hundred and eightieth degree"

ডুর্খেমের প্রায় সমসাময়িক ফ্রয়েড বলেন যে আত্মহত্যা আসলে অন্যকে হত্যা করার একটি ইচ্ছে যা নিজের দিকে চালিত হয়। ফ্রয়েড বলেন আমরা যদি মনে করি সাইকোঅ্যানালিসিস আসলে অসম্ভব তাহলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে আত্মহত্যার প্রকৃত ব্যাখ্যাও অসম্ভব। তিনি যে থ্যানাটস বা ডেথ ইন্সটিংক্টের কথা বলেন টা আসলে বাঁচার ইচ্ছে বা এরসের সঙ্গেই বর্তমান থাকে। কিন্তু দুটি প্রবৃত্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে।

সুইসাইডাল ডিপ্রেশন অর্থাত্‍ যেক্ষেত্রে বিষাদ ও আত্মহত্যার ইচ্ছে একসঙ্গে অবস্থান করে তার কয়েকটি স্নায়ুগত বৈশিষ্ট আছে। কেউ কতটা আত্মহত্যাপ্রবণ তা নির্ভর করে

ব্যক্তিত্ব, জিন, শৈশব, প্রতিপালন, মদ্যাসক্তি, অত্যাচার, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার আধিক্যের উপর। আত্মহত্যাপ্রবণ মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে সেরোটোনিনের অভাব লক্ষ্য করা যায়। সেরোটোনিনের মাত্রা কম হলে একধরনের শক্তিশালী স্বাধীনতাবোধ তৈরি হয়, যাতে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে এবং এর কারণে একধরনের আক্রমণাত্মক ব্যবহার তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে হত্যাকারী বা অপরাধীদের মধ্যেও সেরোটোনিনের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও আত্মহত্যাপ্রবণ মস্তিষ্কে নরাড্রেলিন বা নোরেপিনেফ্রিন প্রভৃতি হরমোন কমে যেতে দেখা যায়। তবে এই ধরনের গবেষণার তুলনায় সেরোটোনিন কমে যাওয়া সংক্রান্ত গবেষণায় সাফল্যের সংখ্যা বেশি।[xxiii]

জেনেটিক্স ও আত্মহত্যা

Genetic factor এবং আত্মহত্যা যে পরস্পর সংযুক্ত তার নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রধান মানসিক অসুস্থতা যেমন- বাইপোলার ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেশন, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ও মাদকাসক্তি প্রভৃতি মূলত পারিবারিক সূত্রে পাওয়া আত্মহত্যার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। ইউরোপের নানা গবেষণা সূত্রে এ কথা প্রমাণিত যে জিনঘটিত পরিবর্তন (mutation) আত্মহত্যার সম্ভাবনাকে তিন গুণ বাড়িয়ে দেয়। জিন মস্তিষ্কের কেমিক্যাল, সেরোটোনিন কে আক্রমণ করে এবং তাতে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমে যায়। এর ফলে মুড সুইং, মানসিক অবসাদ হয়, খিদে বা ঘুমের উপর প্রভাব পড়ে। সেরোটোনিনের ডিসঅর্ডারের কারণে মানসিক অবসাদ বা অসুস্থতা বাড়তে পারে। পারিবারিক প্রভাব এর পাশাপাশি গবেষকরা বলছেন যমজ সন্তান, মূলত identical twins-দের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার সম্ভাবনা অধিক, যদি পিতার আত্মহত্যার ইতিহাস থাকে।

ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ডে একটি পরীক্ষা হয় ৫১ জন আত্মহত্যায় উদ্যত মানুষের সঙ্গে ১৩৯ জন মানুষের যারা আত্মহত্যায় উদ্যত হয়নি। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জিনের একটি মিউটেশন ওই আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষদের আত্মহত্যার সম্ভাবনা ৩.৬৩ গুণ বাড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে আত্মহত্যাপ্রবণ নয় এমনি মানুষের ক্ষেত্রে জিন মিউটেশন ১.৭২ গুণ কাজ করে যায়।

সাহিত্যে আত্মহত্যা নিয়ে কথা বলার আগে একদিকে আমরা যেমন আত্মহত্যার ইতিহাসকে বুঝতে চেয়েছি, তেমনই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যাকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর বিবর্তনকেও পড়তে চেয়েছি। নানা দার্শনিক, গবেষক ও চিন্তাবিদেরা যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে আত্মহত্যাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তাকে আত্মস্থ করে নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে যেতে চেয়েছি আমরা যাতে সাহিত্য ও সময়কে বোঝার পাশাপাশি আত্মহননের সামাজিক ও তাত্ত্বিক দিকগুলি নিয়ে একটা ধারণা তৈরি করে নিতে পারি। আত্মহত্যাকে বুঝতে চেয়েই আমরা কথা বলেছিলাম এই সময়কার খ্যাতনামা একজন সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে। আত্মহনন বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্যকে সংক্ষেপে তুলে ধরলাম এই অধ্যায়ের শেষে।

২.৩ কথোপকথন (১)

অধ্যাপিকা **পুষ্পা মিশ্র**

অধ্যাপিকা পুষ্পা মিশ্রের সঙ্গে আলোচনায় আত্মহত্যা প্রসঙ্গে প্রথমেই এসেছে অবসাদের কথা

ডিপ্রেশন

আত্মহত্যার পিছনে বিষাদ বা অবসাদ এর ভূমিকায় সবচেয়ে বড় বা বলা যায় একমাত্র কারণ। দু'ধরনের ডিপ্রেশনের কথা আমরা জানি-

i) রিঅ্যাকটিভ ডিপ্রেশন

কোন অপ্রাপ্তি ও যন্ত্রণা থেকে উৎপত্তি যে ডিপ্রেশনের তারই নাম রিঅ্যাকটিভ ডিপ্রেশন। যদি দু সপ্তাহের বেশি এই অবস্থা স্থায়ী হয় তাহলে তা চিকিৎসকের নজরে আনা প্রয়োজন।

ii) এন্ডোজেনাস ডিপ্রেশন

এটি মূলত জেনেটিক কারণে শরীরের বায়োকেমিক্যাল পরিবর্তন থেকে তৈরি হয়। এরই একটি মূল শাখা বা ধরন হলো বাইপোলার ডিসঅর্ডার।

বাইপোলার ডিসঅর্ডার

এটি সাইকোসিসের মধ্যেই পড়ে। এটি কোন ধরনের নির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটে না। এক্ষেত্রে রোগীর মনে excitement এবং depression দুটিই কাজ করে। দুটির মধ্যে কখনো খুব স্পষ্ট পার্থক্য বা বিরতি থাকতে পারে। কিন্তু কখন excitement আসবে, কখন অবসাদ তা কখনোই নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ওষুধের এক্ষেত্রে খুব প্রয়োজনীয়। খুব বেশি অবসাদে থাকার সময় শারীরিক কার্যক্ষমতা এত কমে যায় যে আত্মহত্যা তখন ঘটে না। বরং অবসাদ একটু কমে আসার সময় ৭৫% মানুষ আত্মহত্যা

করে। পরিবারে পূর্ববর্তী প্রজন্মের কারো মধ্যে বাইপোলার ডিসঅর্ডার থাকলে জিনগত কারণে তা পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। স্কিৎজোফ্রেনিয়া ক্ষেত্রে যেমন পরিবারে কারো থাকলে তার সম্ভাবনা ১৪% বেড়ে যায়। ১০০০ জনে ১ জনের স্কিৎজোফ্রেনিয়া থাকতে পারে। জিনগত প্রভাবে তা ১৪% বেড়ে যায়।

- বাইপোলার বা স্কিৎজোফ্রেনিক জিনগত কারণ ছাড়াও হতে পারে।
- লিথিয়াম নামক একটি বায়োকেমিক্যাল ফ্যাক্টরকে ডিপ্রেশনের কারণ বলে মনে করা হয়।
- বাইপোলার দুধরণের হয় type-a এবং type -b, দ্বিতীয় ধরনের ক্ষেত্রে Excitement কম থাকে এবং Depression দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- অনেক সময়ে সঠিক ডায়াগনসিস হয় না বলে বাইপোলার বোঝা যায় না। মনোযোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসের অভাব ডিপ্রেশনের লক্ষণ হতে পারে। মেয়েরা অনেক বেশি প্রফেশনালদের থেকে সাহায্য নিলেও পুরুষরা মেল ইগোর কারণে তা নিতে চায় না।
- ডিপ্রেশন কখনো দু সপ্তাহের বেশি চলতে দেওয়া উচিত নয়। মুড ডিসঅর্ডার, খাওয়ার ধরন বদলে যাওয়া,এমনকি আনন্দ অবসাদ যদি খুব ঘনঘন পরিবর্তিত হয় তাহলে তা বাইপোলারের লক্ষণ। বাইপোলার ডিসঅর্ডার না হলেও অনেকের পার্সোনালিটি বাইপোলার ধরনের হতে পারে।
- স্কিৎজোফ্রেনিয়া ছেলেদের ক্ষেত্রে ৩০ এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৩৪ এর পর মূলত ঘটে না তবে বাইপোলার যে কোনো বয়সে যে কোনো সময় ঘটতে পারে।

- দারিদ্র্য অবসাদের সবচেয়ে বড় কারণ। কমিউনিস্টরা বলতেন ডিপ্রেশন কেবলমাত্র উচ্চবিত্তের হয় কিন্তু সার্ভেতে প্রমাণিত যে ফসল নষ্ট হওয়া, খাবারের চিন্তা, ধর্ষণের দুশ্চিন্তা প্রভৃতি দারিদ্র্যের কারণেই অবসাদ সবচেয়ে বেশি এবং এটিই আত্মহত্যার মূল কারণ।

মেন্টাল ডিসঅর্ডার

সমস্ত সমস্যাই আসলে মনস্তাত্ত্বিক,যদি ফসল নষ্ট হওয়ার পরে সরকার ভর্তুকি দেয় তা হলেও অনেকে আত্মহত্যা করতে পারে। সেটা তখন egoistic একটা ধরন যে আমার দায়িত্ব state কেন নেবে?

সাইকোসিস মূলত Psycho, Bio এবং social তিনটি কারণেই হয়। যেমন হেরিডিটি হলো psychological factor,দাম্পত্য,যৌনতা এগুলি হল social factor।

বিয়ের অনুষ্ঠানে বিধবাকে আসার অনুমতি না দেওয়া, পোশাকের বিধি নিষেধ, সিঁদুর খেলায় অংশগ্রহণে বাধা প্রভৃতি সামাজিক কারণে একটি মেয়ে গৃহবন্দি হয়ে থাকে, তার ডিপ্রেশন হতে পারে।

বাইপোলার যদিও একটি বায়োকেমিক্যাল সমস্যা কিন্তু অনেক সময় social factor সেই অসুস্থতাকে বাড়িয়ে দেয়। একটি মেয়ে অবসাদের কারণে পড়তে পারছে না, নতুন করে পরের বছর পড়া শুরু করতে গিয়ে তার মনে হচ্ছে যে আমার বন্ধুরা কী ভাববে? তারা সবাই এক বছর এগিয়ে গেছে। ফলত অবসাদ আরো বেড়ে যাচ্ছে সামাজিক সমস্যার কারণে।

মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি হলেও তাদের পদ্ধতি সবসময় ফেটাল নয়।

ডিপ্রেশন যদি রিঅ্যাক্টিভ হয় তাহলে মনে রাখতে হবে যে আত্মহত্যা আসলে এ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানের পথ নয় তাই মৃত্যু ইচ্ছার চেয়েও বড় সমাধান খোঁজা। কিন্তু এন্ডোজেনাস ডিপ্রেশনের রোগীর আত্মহত্যার চেষ্টা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। মেয়েদের কাছে অনেক সময় বন্দুক প্রভৃতি সহজলভ্য হয় না। তাছাড়া ছেলেরা অনেক বেশি আক্রমণাত্মক, ছেলেরা অনেক বেশি বিজ্ঞানমনস্ক। তাই কটা ঘুমের ওষুধ খেলে তা মারাত্মক হবে তারা জানে। যদিও মেয়েরাও কেউ কেউ যথেষ্ট জেনে-বুঝেই আত্মহত্যার দিকে এগোয় যেমন মদ খাওয়ার পর ঘুমের ওষুধ মারাত্মক ফেটাল - মেরিলিন মনরো এই পদ্ধতিতে আত্মহত্যা করেন।

যে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে তার মধ্যে বারবার এই প্রবণতা তৈরি হতে পারে। কাউন্সেলিং এর মধ্যে দিয়ে এই প্রবণতা কমানোর চেষ্টা করা হয়, যদিও তা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আত্মহত্যায় এক ধরনের aggression কাজ করে। পরিস্থিতি পরিজন ঈশ্বরের উপর রাগ থেকে পৃথিবী ধ্বংসের ইচ্ছা জন্মায় এবং তা সম্ভব নয় বলেই নিজেকে ধ্বংস। একইসঙ্গে helplessness এবং hopelessness। এই রাগকে প্রকাশ করতে পারলে আত্মহত্যার প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। কাউন্সেলিং ইরাবতী কমানো হয় এবং এগুলি করতে বলা হয়-

- শরীর চর্চা
- একা না থাকা
- বন্ধুদের সঙ্গে থাকা
- থেরাপি

আত্মহত্যার পদ্ধতি

শহরে ছেলেরা বন্দুক, মেয়েরা ঘুমের ওষুধ বা গলায় দড়ি দেয়। গ্রামে এখনো ফলিডল এর প্রবণতা বেশি। ঘুমের ওষুধের প্রকাশিত হয় না যা অনেকটা বেশি প্রকাশ পায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে থাকা। ট্রেনে আত্মহত্যা করার প্রবণতা পুরুষদের অনেক বেশি। এছাড়া প্রেমীরা একসঙ্গে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ আন বা মেয়েদের মধ্যে হাতের শিরা কাটা ও লক্ষ্য করা যায়।

অসুস্থতা

যে মুহুর্তে কেউ আত্মহত্যা করবে বলে স্থির করে সে তখন অসুস্থ কারণ নিজেকে শেষ করে দেওয়াটা একটা অসুস্থতা। এমন কখনোই হতে পারেনা যে মানুষের বাঁচার কোন উপায় নেই।

ইচ্ছামৃত্যু

যখন রোগ নিরাময়ের কোন উপায় নেই,যন্ত্রণাময় জীবন, এবং চিকিৎসা সম্ভব নয় তখন ইচ্ছামৃত্যু কে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। যেমন নরওয়ে সুইডেন অস্ট্রেলিয়া সুইজারল্যান্ড,আমেরিকাতে passive euthanasiaকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, active euthanasia নেই।

- আত্মরক্ষার খাতিরে হত্যা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু আত্মরক্ষার খাতিরে আত্মহত্যা হয় না কারণ প্রথম ক্ষেত্রে আমরা বাঁচছি কিন্তু দ্বিতীয়টিতে মরছি।

- অনেক সময় হিস্টিরিয়ার রোগীরা ভয় দেখানোর জন্য আত্মহত্যার অভিনয় করে কিন্তু অনেক সময়েই মাত্রাজ্ঞানের অভাবে তা আত্মহত্যাতেই পরিণত হয়।
- তাৎক্ষণিক বা পূর্বপরিকল্পিত - দুই ধরনের আত্মহত্যাতেই মনে মূল যে ভাবটি থাকে তা হলো প্রতিশোধ।
- তবে অন্যরকমও হতে পারে স্বামীর চিতায় মরতে চাওয়া যুবতীর মধ্যে ভালোবাসা থাকতে পারে কিন্তু তাতে সামাজিক প্রভাবও থাকে।
- আত্মহত্যা না করলেও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থাকে অনেকের। তারা বাঁচার জন্য কোনও চেষ্টা করে না, যেমন হয়তো জীবনানন্দ।

Freud এর Thanatos-এর কথা মাথায় রেখে বলা যায় যে বর্তমানে গবেষণা বলছে মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ভ্রূণের মধ্যে তার এজিং প্রসেস শুরু হয়ে যায় অর্থাৎ জন্মের মুহূর্তেই শুরু হয় ধ্বংসের প্রক্রিয়া।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১ জুন, ২০১৬

২.৪ কথোপকথন (২)

ডাক্তার দেবাশিস ভট্টাচার্য

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে আত্মহত্যাকারী কি অসুস্থ?

না, সুস্থ মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে, সাইকিয়াট্রিস্টরা এক ধরনের social manipulation এর শিকার। নেশা করার মতোই আত্মহত্যাও একটি ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা

নির্বাচন। তিন ধরনের আত্মহত্যা দেখা যায়। মোটিফের ওপর ভিত্তি করে আত্মহত্যার তিনটি ভাগ করা যায়-

i) আদর্শের কারণে আত্মহত্যা- জাপানের হারাকিরি,ইসলামী টেরোরিস্টদের আত্মহত্যা এই ধরণের আত্মহত্যা। খুব দৃঢ় সামাজিক বন্ধন না থাকলে কিন্তু এটা হয় না। এমন একটা বন্ধন ও বিশ্বাস যে আমি না থাকলেও আমার এই গোষ্ঠী থেকে যাবে, আমার ব্যক্তিগত পরিচয় এক্ষেত্রে গৌণ।

ii) এক্সিসটেনশিয়াল সমস্যা - পাশ্চাত্যে, ভারতে এই ধারণা ছিল যে আসলে আমরা একা, এই একাকিত্বকে স্বীকৃতি না দিতেই হয়তো ঈশ্বরে বিশ্বাস। কিন্তু বানানোটা যদি আমাদের নিজের কাছেই ছলনা বা মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয় তখন সবকিছুই খুব অর্থহীন মনে হতে থাকে, এই অর্থহীনতার বোধ থেকেই জন্ম নেয় আরেকটি বোধ যে মৃত্যু যখন আমার একদিন হবেই তখন তাকে ইচ্ছেমতো উপায়ে, ইচ্ছেমতো সময়ে ঘটাতে পারি আমি। এই ইচ্ছা অবশ্যই এক ধরনের existential crisis। এই আত্মহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই Existential Psychotherapy-র স্কুল অফ থট তৈরি হচ্ছে। তারা বলছেন যে জীবনের তাৎপর্যকে সম্পূর্ণ স্বীকার করার যেমন কোন দরকার নেই, তেমনই জীবনের প্রয়োজন নেই এরূপ ধারণা তৈরি হওয়ার কোন তাৎপর্য নেই। Victor Frankl কে এই Existential Psychotherapy-র জনক বলা যায়। তিনি "Meaning of Life" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। নাৎসি ক্যাম্প থেকে বেরোনোর পরেই গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি প্র্যাকটিস শুরু করেন।

তাঁর কাছে আসা রোগীদের সমস্ত বক্তব্য শোনার পর তিনি তাদের প্রশ্ন করতেন যে তারা এতদিন মরেনি কেন ? তারা চিকিৎসকের কাছে কেন এসেছে? অর্থাৎ তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে রোগীদের মধ্যে জীবনের অর্থহীনতার বোধ ছাড়াও বাঁচার একটা সাধ আছে, এটাই unity of opposite।

iii) ব্যক্তিগত নির্বাচন- আত্মহত্যা আসলে ব্যক্তিগত নির্বাচন। একে অসুস্থতা বলব কিনা তা ভেবে দেখতে হবে কারণ সমাজের বেশ কিছু মনোবিজ্ঞানীরাও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আমাদের যদি Right to Freedom, Right to get Education থাকে, তাহলে Right to death (die) থাকবে না কেন? এটা সম্পূর্ণ মানুষের নিজস্ব ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত, তবে একথা সত্য যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত খুব র‍্যাশনালি নেওয়া হয় না। সেকারণেই একটা ওপেন ডায়লগ তৈরি হওয়া খুবই জরুরি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খানিকটা অভিমান বশত, immaturity বা impulsiveness থেকে আমরা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিই। তাই খোলা মনে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টাকে খানিকটা পিছিয়ে দেওয়া যায়।

নিউরো কেমিস্ট্রি বা সাইকো ফার্মাকোলজির সঙ্গে ফিলোজফির তেমন কোনো বিরোধ থাকার কথা নয়, বরং একটা আদান-প্রদান থাকা উচিত। দেশভাগ বা যে কোনো বড় ক্রাইসিসে তৈরি হওয়া ডিপ্রেশন যদি লাগাতার চলতে থাকে তখন আমাদের বায়োকেমিক্যাল পরিবর্তন হয়। আসলে আমাদের ড্রাইভ গুলো আমাদের দ্বারা খুব

র‍্যাশনালি বাড়ানো বা কমানো যায় না। মানুষের যে অংশটা আমাদের ইমোশনকে নির্ধারণ করে তা খুব নিম্নস্তরের। আমাদের কর্টিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে উন্নত কারণ আমাদের কর্টেক্স অনেক বড়। কিন্তু আমাদের ইমোশন কন্ট্রোল করার জন্য মস্তিষ্কে যে অংশটি তা প্রিমিটিভ। তাই সেটার দ্বারা যখন আমরা চালিত হচ্ছি আমরা সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না।

যদিও আত্মহত্যার কারণ হিসেবে দার্শনিকরা কিছু এনজাইমের কথা বলেন। যেমন- সেরোটোনিন, কিন্তু তার সত্যতা যাচাই যোগ্য। জেনেটিক কারণ কিছু থাকে ডিপ্রেশনের পেছনে ,যার মধ্যে মূল হল বাইপোলার ডিসঅর্ডার, নজরুল বা ঋত্বিক ঘটক বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভুগতেন। ঋত্বিকের ক্ষেত্রে নেশার পাশাপাশি এটি একটি বড় সমস্যা ছিল। এছাড়াও চার্চিল, ভ্যান গগও এর শিকার ছিলেন।

সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ-এর পাশাপাশি আসলে থাকে পার্সোনালিটি, ওটা একটা আলাদা কেমিস্ট্রি। বায়োকেমিস্ট্রি পার্সোনালিটিকে এখনও ব্যাখ্যা করতে পারেননি। এর চিকিৎসা সম্ভব নয়। যেমন ভ্যান গগ নিজের কান কেটে উপহার দিচ্ছেন, এটি নিজস্ব পার্সোনালিটি বা নিজস্ব বিকৃতি, একে সাইকোলজিকাল ডিজিজ-এর আওতায় আনা যায়না।

স্কিৎজোফ্রেনিয়া শুরু হয় ১৫-২০ বছর বয়সের মধ্যে, বাইপোলার শুরু হয় আরেকটু পরে ৩০-৩৫ এর মধ্যে। বাইপোলার আসে ভিন্ন লিঙ্গের থেকে, এটা আজ প্রমাণিত, মায়ের বাইপোলার থাকলে তা যেমন সঞ্চারিত হতে পারে ছেলের মধ্যে তেমনি পিতার বাইপোলার মেয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে যদিও ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

সাইক্রিয়াটিক চিকিৎসা আসলে কোন কেমিক্যাল টেস্টে ধরা পড়ে না অনেকগুলি রোগের চিহ্ন দেখে এটি নির্ধারণ করতে হয় (পলিজেনিক)। বাইপোলার মূলত হেরিডিটি থেকেই সঞ্চারিত হয়।

একথা মনে রাখতে হবে যে ডিপ্রেশন একটা বড় জিনিস। তার নানা রকম কারণ থাকতে পারে। দারিদ্র্য থেকে কারণ তৈরি হতে পারে আবার তার জেনেটিক্যালি বাইপোলার থাকতে পারে, কিন্তু যদি না থাকে তাহলে শুধু দারিদ্র্যের কারণেই এটা হয়েছে এমনটা বলা যায়না।

বর্তমানে যেমন অ্যাম্বিশন, অতিরিক্ত ফোকাস, যুব সম্প্রদায়ের ডিপ্রেশন-এর একটা বড় কারণ। ছোট থেকেই বাবা-মায়ের জন্য, প্রতিবেশীর কারণে, তারা এমন ভাবে তৈরি হচ্ছে যে আত্মকেন্দ্রিকতাতেই তারা অভ্যস্ত। ভবিষ্যতেও তারা তাদের অ্যাম্বিশন থেকে বা তাদের নির্ধারিত উন্নতির চূড়ায় পৌঁছাতে না পারলে ভয়ংকর শূন্যতা বা ডিপ্রেশন তৈরি হয়। এই ধরনের ডিপ্রেশনে অ্যাংজাইটি বেশি থাকে, ক্ষোভ বেশি থাকে।

শুধুমাত্র যে ডিপ্রেশনগুলো এন্ডোজেনাস, শারীরিক অসুস্থতা থেকে যেগুলো শুরু তাদের সমস্যা অন্যরকম। তাদের মুভমেন্ট অনেক কমে যায়, খাওয়া, পায়খানা একদম বন্ধ হয়ে যায়। এটাকে আলাদা করে ডিপ্রেশন বা স্কিৎজোফ্রেনিয়া বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় সাইকিয়াট্রিস্টদেরও। এক্ষেত্রে হ্যালুসিনেশন হতে থাকে, বিড়বিড় করে, "অল্প শোকে কাতর, বেশি শোকে পাথর"-যেন এই প্রবাদটিকেই প্রমাণ করে। তবে স্কিৎজোফ্রেনিকরা সব সময় বিড়বিড় করে না। অনেক সময় স্থানুর মতো বসে থাকে। সেজন্য ডিপ্রেসড আর স্কিৎজোফ্রেনিকদের আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সময় পাওয়া যায়

এরকম ডিপ্রেশডদের, হয়তো যাদের ২-৩ সপ্তাহ চিকিৎসার পর তারা জানায় যে- ওষুধ দিচ্ছেন কেন আমার বাঁচার ইচ্ছে নেই।

- স্কিৎজোফ্রেনিকদের উপর পাইলট স্টাডি হয় মাও সে তুং- এর যুগে। নয়টি দেশের উপর হয় এই সার্ভে- চীন, ভারত, ইউএসএ, ইউকে, জাপান, কলম্বো, নাইজেরিয়া। তাতে দেখা যায় যে কোন জায়গা বিশেষে কোন পরিবর্তন নেই, সব জায়গাতেই একই রকম লক্ষণ দেখা যায় স্কিৎজোফ্রেনিয়ায়। অর্থাৎ কমিউনিজম এলে মানসিক অবসাদ দূর হবে এই ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয় এই সার্ভেতে।
- সাহিত্য সিনেমায় কারো আত্মহত্যাকে আমরা দেখতেই পারি সাহিত্যিকের হাতে হত্যা হিসেবে।
- আমাদের এবং ইউরোপের প্রেক্ষাপট অনেক আলাদা। আমাদের অবশ্যই দেশভাগজনিত ক্রাইসিস আছে কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের ক্রাইসিস আরো বড়।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ নভেম্বর, ২০১৬

তথ্যসূত্র

[i] Hume, David- *Essays on Suicide and the Immortality of the Soul*, Fleet Street and Patterton Row, 1783

[ii] Merian, *Memoir Sur Le Suicide*, Berlin, Royal Academy of Science & Bells Letters, 1763

[iii] বসু, পথিক – *বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন*, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৮, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ২৫

[iv] Marx, K- *Economic and Philosophical Manuscripts*; Moscow, Progress Publishers, 1977

Marx, K- *Capital*, (3 Vol), Moscow, Progress Publishers, 1977

[v] Freud, Sigmund – *Beyond The Pleasure Principle*, Hubback C.J.M(Translation), Vienna: International Journal of Ethics for October, 1895

[vi] Marcuse, Herbert – *Eros and Civilization*, (2nd Ed.), London: Routledge, 1987

[vii] Falret, Jean-Pierre, *De L'hypochondrie et du Suicide*, 1822

[viii] Durkheim, Emile, *Suicide – A Study in Sociology*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1922

[ix] James William- *Is Life Worth Living?* Published in the International Journal of Ethics, October, 1985.

[x] Marx, K - *Peuchet: On Suicide*, Geselleschaftsspiegel Rd. II, Heft VII; !846, P-57-58

[xi] Ibid, P- 53-54

[xii] Masaryk, Thomas G. - *Suicide and the Meaning of Civilization*, Translated by W.B Weist and Robert G. Batson, Chicago: University of Chicago Press, 1970[1881], P- 6

[xiii] Ibid, P- 36

[xiv] Durkheim, Emile, *Suicide – A Study in Sociology*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1922, P- 44

[xv] Menninger, Karl - *Man Against Himself*, Harcourt, Brace and World, Inc. New York, P-13

[xvi] Ibid, P-17

[xvii] Ibid, P-31

[xviii] Ibid, P-45

[xix] Ibid

[xx] Ibid, P -311

[xxi] Solomon, Andrew – *The Noonday Demon An Anatomy of Depression*, Vintage (Penguin Random House UK), 20 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 2SA, 2001

[xxii] Ibid, P -245

[xxiii] Ibid, P -254

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যার বিবরণ

আধুনিকতার এক পরিণাম হল আত্মহত্যা। আধুনিকতার অপর পরিণাম তথা আধুনিক বাংলা উপন্যাসে কেন আমরা আত্মহত্যা এত বেশি করে পাব তা খতিয়ে দেখব এবার। এই অধ্যায়ে আমরা উনিশ শতকের প্রধান ও সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে আত্মহত্যার বিবরণ, ধরণ ও কারণ খোঁজার চেষ্টা করব। কিন্তু উপন্যাসে আত্মহত্যা ও বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা একবার অতি সংক্ষেপে দেখে নেব বাংলা উপন্যাস তৈরির আগে বাংলা সাহিত্যে কি আত্মহত্যা কোনোভাবে এসেছে? পুরাণ বা রামায়ণ মহাভারতে কি আত্মহত্যার কোন প্রসঙ্গ আছে? প্রথম অধ্যায়ে এই অংশটি কিছুটা ছুঁয়ে গেছি। আরেকবার বুঝে নেওয়া যাক আত্মহত্যার সঙ্গে আমাদের ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক সম্পর্কটি।

৩.১ পৌরাণিক কাহিনীতে আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাল্মীকির রামায়ণে আত্মহত্যার নানা উল্লেখ ও বিবরণ খুঁজে পাওয়া যায়। অযোধ্যা কাণ্ডে কৈকেয়ীর মায়ের কাহিনী পাই, কেকয়রাজ ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারলেও সেই কথা অন্য কাউকে জানালে তার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। কৈকেয়ীর মা জেদ ধরেন যে পাখির ডাক শুনে রাজামশাইয়ের হাসির কারণ তাকে জানাতে হবে, অন্যথায় তিনি আত্মহত্যা করবেন।

লঙ্কা কাণ্ডে, সীতা উদ্ধারের পর তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে প্রত্যাখ্যান করেন রামচন্দ্র। সীতা তখন বলেন যে হনুমানকে যখন রামচন্দ্র লঙ্কায় পাঠালেন তখনই কেন

সীতা বর্জনের পরিকল্পনা তাঁকে জানানো হয়নি? তাহলে তিনি তখনই দেহ ত্যাগ করতেন।

উত্তর কাণ্ডে অগস্ত্যের বলা কাহিনী এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বৃহস্পতির নাতনি আর কুশধ্বজের মেয়ে বেদবতী, বিষ্ণুকে বর হিসেবে পাওয়ার জন্য বিষ্ণুর ধ্যান করেন হিমালয়ে। রাবণ তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাঁকে বিয়ে করতে চেয়ে তাঁর চুল ধরে টানতেই বেদবতী আগুনে আত্মাহুতি দিলেন। বেদবতী অভিশাপ দিলেন রাবণকে যে তার ধ্বংসের জন্য কোন ধর্মপরায়ণ মানুষের অযোনিসম্ভূতা কন্যা হয়ে তিনি জন্মাবেন। এই বেদবতীই হলেন সীতা।

সীতার পাতাল প্রবেশের আগে সীতা বিসর্জনের সময় সীতা লক্ষ্মণকে বলেন যদি মুনিরা জানতে চান যে রাম কেন আমায় পরিত্যাগ করেছেন, আমি তাদের কী বলবো? পেটে যদি রামের সন্তান না থাকতো তাহলে আজই এই জাহ্নবীর জলে আমি প্রাণ বিসর্জন দিতাম। এছাড়াও এই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে পাতাল প্রবেশের ঘটনাকে আত্মহত্যা ভিন্ন অপর কিছু মনে করা যায় না।

শম্বুকের তপস্যার পাপে মৃত ব্রাহ্মণপুত্রের পিতা রামের কাছে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চান, অন্যথায় তিনি আত্মহত্যা করবেন বলে জানান।

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে সীতা অন্বেষণে ব্যর্থ হয়ে, প্রায় এক মাস যাবৎ সীতাকে খুঁজে না পেয়ে অঙ্গদ চিন্তা করেন যে কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরলে সুগ্রীব নিশ্চয় তাঁদের বধ করবেন। তার চেয়ে এখানেই না খেয়ে মরা ভাল বলে মনে করেন তিনি। যদিও তাঁর এই ভাবনার জন্য হনুমান তাঁকে তিরস্কার করেন।

ভরত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করার মুহূর্তে রামচন্দ্রের বার্তা সহ আবির্ভাব হয় হনুমানের এবং তিনি ভরতকে প্রাণে বাঁচান।

রামায়ণে একটি গণ আত্মহত্যারও বর্ণনা পাওয়া যায়। অরণ্য কাণ্ডে রামচন্দ্র শপথ করেন যে কেউ যদি তাঁর আদেশ বা ইচ্ছা কেউ লঙ্ঘন করে তাকে তিনি পরিত্যাগ করবেন। এ বিষয়ে না জেনেই লক্ষ্মণ সবচেয়ে প্রথম তাঁর বিরোধিতা করেন এবং প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী রামচন্দ্র তাঁকে পরিত্যাগ করেন। রামচন্দ্রের থেকে আলাদা হওয়ার শোক সহ্য করতে না পেরে লক্ষ্মণ সরযূ নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। লক্ষ্মণের মৃত্যুর পর জীবনের প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে, ভরত ও শত্রুঘ্ন সহ স্বয়ং রামচন্দ্র সরযূ নদীর ওই একই ঘাটে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। এই খবর সমগ্র অযোধ্যায় ছড়িয়ে পড়লে বহু নগরবাসী তাঁদের অনুসরণ করেন।[i]

মহাভারতেও আত্মহননের প্রসঙ্গ আছে। বহুল চর্চিত অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশ বা ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর মত ঘটনা ছাড়াও এরকম আরো কিছু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। একাধিকবার অর্জুনের প্রাণত্যাগ করার সম্ভাবনার কথা বর্ণিত হয়েছে এখানে।

মহাভারতের সভাপর্বে, রাজসূয় যজ্ঞের সময়, ময়দানবের তৈরি করা প্রাসাদে দুর্যোধন আসেন ও স্ফটিকের সেই প্রাসাদে জল স্থল গুলিয়ে ফেলে অপদস্থ হন। হস্তিনাপুরে ফিরে এসে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতায় ভুগতে ভুগতে তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন। শকুনি মামার পরামর্শে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও ধৃতরাষ্ট্র তাতে আপত্তি জানালে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করেন দুর্যোধন।

বনপর্বে দ্বৈতবনে পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে এসে গন্ধর্ব চিত্রসেনের সঙ্গে দুর্যোধনের যুদ্ধ হলে দুর্যোধন তাতে পরাজিত হন ও বন্দী হন। পাণ্ডবেরা এসে রাণী সহ দুর্যোধন,

দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে মুক্ত করলে লজ্জায় অপমানে অনাহারে আত্মহত্যা করতে চান দুর্যোধন।

পঞ্চতন্ত্রে একটি উল্লেখযোগ্য আত্মহত্যার গল্প পাওয়া যায়। একটি শিকারীর অতিথি সৎকার করার জন্য একটি পায়রা আগুনে পুড়ে প্রাণত্যাগ করে, পাখিটির বৌ স্বামীর মৃত্যুর শোকে আত্মহত্যা করে এবং তাদের দেখে দুঃখ ও অনুতাপে শিকারীটি নিজের প্রাণ ত্যাগ করে।[ii]

দেবরাজ ইন্দ্রের 'বজ্র' তৈরির জন্য দধীচি নিজের হাড় দান করেন। অতীতে বহু সময়েই গণহারে আত্মহত্যার মত ঘটনা দেখা গেছে। এছাড়াও সতী হওয়া বা সন্তানের চিতায় মায়ের আত্মত্যাগের মত ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়।[iii]

৩.২ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পৌরাণিক কাহিনির পুনর্নির্মাণ বা বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ছাড়াও আমরা যদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেখতে যাই তাহলে দেখব যে মধ্যযুগের প্রধান একটা শাখা অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যে আত্মহত্যা নেই। কেবলমাত্র ধর্মমঙ্গল যা কিনা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হচ্ছে তাতে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ আসে। ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় অর্থাৎ লাউসেনের কাহিনিতে দেখা যায় গৌড়েশ্বর তার প্রিয় সামন্ত বৃদ্ধ কর্ণসেনকে তার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে বিয়ে দিলে শ্যালক মহামদ (বা মাহুদ্যা) অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়। বৃদ্ধ ভগিনীপতিকে আঁটকুড়ো বলে উপহাস করলে অভিমানী রঞ্জা ধর্মঠাকুরকে তুষ্ট করতে নানারূপ কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করে এবং শূলে ভর দিয়ে রক্তাক্ত হয়ে প্রাণত্যাগে উদ্ধত হয়। যদিও সে আত্মত্যাগের পূর্বেই ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে পুত্র বর দেন। সুতরাং এ আত্মহত্যা আসলে স্বামীর

অপমানে নারীর অপমানিত হওয়ার গল্প এবং পাশাপাশি আত্মহত্যার উদ্যোগকে উদ্দেশ্যসাধনের এক উপায় বলেও চিহ্নিত করা যায়। লাউসেনেরও আত্মহত্যার প্রসঙ্গ একবার আসে এখানে।

ময়মনসিংহ গীতিকার চন্দ্রাবতীর কাহিনী এক বিয়োগান্তক প্রেমকাহিনী, বাল্যের সঙ্গী ও প্রণয়ী চন্দ্রা ও জয়ানন্দের বিবাহের প্রস্তাব যখন পিতা বংশীদাস মেনে নিলেন না, চন্দ্রা শুদ্ধাচারিণীর মত শিবপূজায় মনোনিবেশ করে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আবদ্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হয়। পরে ভুল বুঝতে পেরে আত্মগ্লানিতে দিশেহারা জয়ানন্দ চন্দ্রার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে বিফল হয় ও রুদ্ধ মন্দিরের দরজায় কবিতা লিখে যায়, কবিতাটি মুছে ফেলার জন্যে চন্দ্রাবতী নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে দেখে নদীর জলে ভেসে আছে প্রেমিক জয়ানন্দের মৃত লাশ।

পাশাপাশি মধ্যযুগের আরেকটি সাহিত্যশাখায় আমরা আত্মহত্যার অপর একটি রূপ খুঁজে পাব যা বাংলা সাহিত্যে পরবর্তী নানা সময়েও নানা ভাবে ফিরে এসেছে। ধর্ম, সতীত্ব বা পবিত্রতা রক্ষার সঙ্গে আত্মহত্যার যোগাযোগ পাশ্চাত্য দেশের মতো বাংলা দেশ তথা বাংলা সাহিত্যেও বহুল প্রচলিত। সপ্তদশ শতাব্দী কবি সৈয়দ আলাওল পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন হিন্দি কবি জায়সীর ‘পদুমাবৎ’ কাব্য অবলম্বনে। চিতোর রাজ রত্নসেনের রাণী পদ্মিনী বা পদ্মাবতীর রূপের খ্যাতিতে পাঠান আলাউদ্দীন খল্‌জী চিতোর আক্রমণ করলে রত্নসেন যুদ্ধ করেন ও নিহত হন। তখন নারীধর্ম রক্ষার্থ পদ্মাবতী ও তার সখিরা আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেন। এই আত্মহত্যাকে Altruistic Suicide-এর সেই শাখায় ফেলা যায় যা আসলে ঐচ্ছিক অথচ বাধ্যতামূলক। এই নারীত্ব রক্ষা আসলে ব্যক্তি পদ্মাবতীর সিদ্ধান্ত নয়, তা সামাজিক ভাবনা ব্যক্তিগত বহিঃপ্রকাশ মাত্র। পরবর্তীকালেও

দেখব যে যতদিন না আত্মহত্যার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতা যুক্ত হয়েছে ততদিন এরূপ আত্মহত্যা অসংখ্যবার স্থান পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে। পদ্মাবতীর এই কাহিনিই কখনো আবার রচিত হয়েছে আর কখনো বা এসেছে অন্য নারীদের কথা।

৩.৩ আধুনিকতা, উপন্যাস এবং ব্যক্তিতাবোধের জন্ম

উপন্যাস আসলে আধুনিকতার ফলাফল। আমার আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে পুঁজিবাদ কিভাবে বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। শ্রমজাত ফসলের সঙ্গে শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা বা সমাজের অন্য মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মবিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা আসলে পুঁজিবাদের সামাজিক পরিণতি। পাশাপাশি পুঁজিবাদ কিভাবে সাহিত্যকেও প্রভাবিত করছে তার প্রমাণ এই নতুনতর শিল্পরূপ 'উপন্যাস'। মধ্যবিত্ত সমাজের উদ্ভব, মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের জন্মকে ত্বরান্বিত করেছে। ইংল্যান্ডে আঠারো শতকে নগরকেন্দ্রিক সমাজ দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে, সংবাদপত্রের প্রসার ঘটে, দর্শক বা শ্রোতার পরিবর্তে পাঠক তৈরি হয়। ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে নানা পেশার মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়। এই নতুন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ মধ্যযুগীয় রোমান্সের পরিবর্তে ব্যক্তিমানুষের জীবন, লড়াই ও সংকটের চিত্র খুঁজলো। দেখতে চাইল সেই মানুষকে যার সঙ্গে বাস্তবে নিজের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ধনতন্ত্র ও বণিকতন্ত্রের পাশাপাশি ইংল্যান্ডে বিভিন্ন দার্শনিক মননচর্চাও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ। আঠারো শতকেই ইংরেজি উপন্যাস রচিত হতে থাকে। রাজতন্ত্র বা অভিজাতদের জন্য নয় বরং নগরকেন্দ্রিক সমাজে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হল তারাই ছিল এই নতুন শিল্পরূপটির পাঠক। আগের জনসাধারণ ছিল শ্রোতা বা দর্শক। কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ যখন মুদ্রাযন্ত্রের সম্প্রসারণের ফলে একক মনোরঞ্জনের জন্য বই হাতে পেল তখন সে

পড়তে চাইল ব্যক্তি মানুষের কথা। মধ্যযুগীয় রোমান্সের পরিবর্তে এই নতুন শিল্পরূপটিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায় প্রধান হয়ে উঠল। শিল্পবিপ্লব,ইংল্যান্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমির রূপান্তর, নগরকেন্দ্রিক সমাজের উদ্ভব, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং ব্যক্তির বিকাশ - এইগুলিই ছিল আঠারো শতকের উপন্যাস তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট। রুশ ও ফরাসী দেশও উপন্যাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিল কিন্তু তা প্রথম ও দ্রুত প্রসার লাভ করে আঠারো শতকের ইংল্যান্ডে এবং এই কারণেই আঠারো শতকের ইংল্যান্ডে তৈরি হয় রবিনসন ক্রুশোর মত চরিত্র যিনি একজন সত্যিকারের মানুষ হিসাবে ধরা পড়েন পাঠকের চোখে। পাশাপাশি এও মনে রাখতে হবে যে রবিনসন ক্রুশো কিন্তু কোনো রোমান্টিক নায়ক হয়ে থেকে যায়নি। এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে চিরাচরিত পারিবারিক বা গোত্রের বন্ধন ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হওয়া মুনাফালোভী ব্যক্তিমানুষের কথা। সেদিনের সেই শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনে এই বিচ্ছিন্নতা ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং তাই সাহিত্যেও এই বিচ্ছিন্নতার চিত্র এড়াতে পারেননি সফলতম লেখকেরাও।

ধনবাদের উদ্ভব বা তথাকথিত ব্যক্তিবাদ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে ঔপনিবেশিকতার সূত্রে। তারই অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে ইংলন্ডে আঠারো শতকে আবির্ভূত এই নতুন শিল্পরূপটিও বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। আমরা গদ্যের বিকাশ হিসাবে যে কারণগুলির কথা বলে থাকি অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্রের প্রচলন, শিক্ষার বিকাশ – এ সমস্তই আসলে জড়িত মধ্যবিত্তের বা নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবির্ভাবের সঙ্গে। গ্রামে যে পালা-গীত বা কীর্তন চলত তার জগত্ সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে যেতে থাকে। কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক সমাজে মধ্যবিত্তের আগমনে চাকরির জন্য শিক্ষা এবং

শিক্ষার প্রসারে পাঠ্যপুস্তক গদ্য না অন্যান্য গদ্যের রচনা শুরু হয় এবং শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এই সময় ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার পাশাপাশি তৈরি হল ব্যক্তিতাবোধ। সে একটি নির্দিষ্ট অবস্থানের ভিত্তিতে সমাজের নানা বিষয়কে বুঝে নিতে চাইল নিজের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে। কেবল একজন ছিন্ন, একাকী, নির্জন একক হিসাবে নয়, ব্যক্তি একটি অবস্থানও বটে। ব্যক্তির পাশাপাশি সে সত্তাও। সে একটি নির্দিষ্ট চৈতন্যের ধারণ - একটি সচেতন দার্শনিক পক্ষ। সে নিছক রক্তমাংসের দেহধারী নয়, সে নির্বাচক, প্রতিফলক, সে চৈতন্যের আধার। এই চৈতন্যসর্বস্বতাই ইন্ডিভিজুয়ালিটি আর সাবজেক্টিভিটির প্রধান তফাতের ক্ষেত্র।

এই সাবজেক্টিভিটি বা ব্যক্তিতাবোধের একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন আধুনিক আত্মহত্যা। আত্মহত্যাকে যেহেতু প্রাচ্যের ধর্মগুলির প্রায় অধিকাংশেই অস্বীকার করেছে তাই সব ধর্মই এতদিন আত্মহত্যাকে সমাজের আলোচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা দেয়নি। আত্মার হনন সম্ভব নয় বা উচিত নয় এই যুক্তি মানুষ মেনে না নিলেও সরাসরি তার বিরোধিতা করে নি মানুষ। রেনেসাঁস পরবর্তী যুগে মানুষ এই প্রশ্ন তোলে যে আত্মহত্যা কি পাপ? আর সেই আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি হয়েই নানা আধুনিক চরিত্র ধরা পড়ল বাংলার আধুনিকতম শিল্পরূপ তথা উপন্যাসে।

একথা বলাই বাহুল্য যে একদিনে সমাজ আধুনিক হয় না – উপন্যাস বা উপন্যাসের চরিত্ররাও সমাজের প্রতিরূপ। তাই আমরা দেখব যে বাংলার প্রথম সফল ঔপন্যাসিকের রচনায় বারবার তৈরি হয়েছে আত্মহত্যার সম্ভাবনা। অথচ নানাবিধ কারণে সে আত্মহত্যার উদ্যোগ সফল হয় নি। বঙ্কিমের নানা উপন্যাসে অনেক আত্মহত্যার ঘটনা পেলেও গুণে দেখলে দেখা যাবে যে সফল আত্মহত্যার চেয়ে অসফল প্রচেষ্টার সংখ্যা

হয়ত বেশি। বঙ্কিম পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা কে কিভাবে আত্মহত্যার কথা বললেন, কারণ হিসাবে কোন কোন দিকগুলি তুলে ধরলেন তাঁরা। উনিশ শতকের উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রসঙ্গগুলি উল্লেখ করে তার লক্ষণ ও প্রবণতা গুলো বুঝে নিতে চাইব আমরা। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ্য যে লেখক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের দাদা, বিদ্যাসাগরের ছাত্র, বিখ্যাত স্কলার রামকমল ভট্টাচার্য ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে আত্মহননের পথ বেছে নেন।

৩.৪ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় আত্মহত্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত আধুনিকতার প্রস্তুতি শুরু হয়, সে সময় নাটক, কাব্য এবং গদ্য সকলক্ষেত্রেই ইংরাজি প্রভাব একটি প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। ট্রাজেডি লেখার ইচ্ছা নিয়ে যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্তের নাটক 'কীর্ত্তিবিলাস' তৈরি হয় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে। রূপকথার কাহিনি প্রভাবিত এই নাটকে রাজা চন্দ্রকান্তের দুটি পুত্র – কীর্ত্তিবিলাস ও মুরারি। বৃদ্ধ বিপত্নীক রাজা তরুণী নলিনীকে বিয়ে করলে, নলিনী যুবক কীর্ত্তিবিলাসকে প্রেম নিবেদন করে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে নলিনী বৃদ্ধ রাজার কাছে মিথ্যা নালিশ করে প্রাণদণ্ডের আদেশ আদায় করে, পরবর্তী সময়ে সে আদেশ রদ হলেও তা না মেনেই স্বামীর মৃত্যু শোকে কীর্ত্তিবিলাসের স্ত্রী আত্মহত্যা করে এবং তা জেনে পরবর্তীতে কীর্ত্তিবিলাসও শোকে প্রাণত্যাগ করে। সফোক্লিসের গ্রিক নাটক ফিড্রার ছায়া দেখা যায় এই নাটকটিতে। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ রচনা করেন 'চারুমুখ চিত্তহরা' নাটক। এটি শেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট'-এর কাহিনি অবলম্বনে রচিত। তাই এই নাটকের শেষেও নায়ক-নায়িকা উভয়ের আত্মহত্যা নাটকে ট্রাজেডির ভাবনা তৈরি করে।

কবি রঙ্গলাল ঊনবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ইতিহাসকে অবলম্বন করলেন। মধ্যযুগে রচিত 'আলাওল'-এর পদ্মাবতীর সেই কাহিনিকে নিয়ে তিনি ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে রচনা করলেন

‘পদ্মিনী উপাখ্যান’। আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণে পদ্মিনীসহ অন্যান্য নারীদের জহরব্রতে আত্মত্যাগের কাহিনি পুনর্নির্মিত হল রঙ্গলালের হাতে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন দত্ত রচনা করেন ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। সেই কাব্যে ইন্দ্রজিতের স্ত্রী প্রমীলার স্বামীর চিতায় গমনের যে চিত্র তাতেও অনেক সমালোচক দেখেছেন ‘পদ্মিনী’র প্রভাব। এই যে দেশের জন্য, বা সতীত্ব রক্ষার জন্য, কিংবা বীরত্বের প্রমাণস্বরূপ আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া – ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যে নারীরাই ছিল এর প্রধান অবলম্বন। ১৮৬১ খিস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত ‘কৃষ্ণকুমারী’ নাটকে কৃষ্ণকুমারী রাজ্যরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে নিজের বক্ষে ছুরির আঘাত করে প্রাণত্যাগ করেন।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকে আত্মহত্যার নতুনতর নিদর্শন পাওয়া যায়। নীলকরদের কারসাজিতে গোলোক বসু মিথ্যা অভিযোগে কারারুদ্ধ হন এবং সেখানেই আত্মহত্যা করেন। শোকে উন্মত্ত সাবিত্রী তার ছোট পুত্রবধূ সৈরিন্ধ্রীকে গলা টিপে হত্যা করে এবং পরবর্তীতে জ্ঞানলাভ করে নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। নাটক বলেই মনে হয় যে এই মৃত্যু বা আত্মহত্যার দৃশ্যগুলি অবতারণার কারণ মঞ্চে বীভৎস রসের চিত্র নির্মাণ। যা কিনা দর্শকমনে নীলকরদের অত্যাচারের প্রকৃত আতঙ্ক ফুটিয়ে তুলতে পারে। তাই বলা বাহুল্য যে এই কাহিনির উদ্দেশ্য পূরণের কারণেই আত্মহত্যার মতো ঘটনাকে বেছে নিয়েছিলেন লেখক।

৩.৫ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আত্মহত্যার অনুষঙ্গ

বাংলায় এই সময়েই উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব এবং আধুনিক সময়ের এই আধুনিক শিল্পরূপটি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সজীব হয়ে উঠল নানাভাবে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রোমান্স বা আধুনিকতা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। এমনকি

প্রতিটি উপন্যাস যে একইরকম ভাবে একই মাপকাঠিতে আধুনিক বলে গণ্য হবে তাও নয়। লেখকের জীবনবোধ এবং সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে ও তথাকথিত আধুনিকতাকে প্রভাবিত করেছে এ কথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে অধিকাংশ সমালোচকই প্রায় একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে রক্ষণশীল সংস্কার এবং নৈতিক মাপকাঠি তাঁর উপন্যাসের একটি প্রধান পরিচয়। এই সমস্ত কথা মনে রেখে আমরা যদি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'আত্মহত্যা' বা 'আত্মহত্যার প্রচেষ্টা'গুলোকে চিহ্নিত করতে যাই তাহলে দেখব প্রধানত বিশেষ কিছু ধরণ সেক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে তাঁর যে যে উপন্যাসে আত্মহত্যার অনুসঙ্গ আছে সেগুলো দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

৩.৫.১ দুর্গেশনন্দিনী : *আয়েষার আত্মহত্যার ভাবনা*

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *দুর্গেশনন্দিনী* বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস। জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার প্রেম কাহিনি এর মূল বিষয়। বীরেন্দ্রসিংহকে হত্যা করে কতলু খাঁ তাঁর স্ত্রী বিমলা ও কন্যা তিলোত্তমাকে বন্দী করে। প্রেয়সী তিলোত্তমা বন্দিনী ও হয়ত বা শত্রুর লালসার শিকার – এই ভাবনায় জগৎসিংহের যন্ত্রণা। এরই মধ্যে পাঠান গৃহে বন্দী জগৎসিংহকে পিতা কতলু খাঁর বন্দীত্ব থেকে রক্ষা করে তাঁরই কন্যা আয়েষা। এই আয়েষার সূত্রেই কাহিনিকে যুক্ত হয় আত্মত্যাগের চরম চিত্র। বন্দীকে 'প্রাণেশ্বর' বলে স্বীকৃতি দেওয়ার আগেও কিন্তু আয়েষা তিলোত্তমাকে শত্রুগৃহ থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল এবং জগৎসিংহের প্রতি তার পত্রে তার মনোভাবনার স্পষ্ট পরিচয় দেয়। উপন্যাসের সমাপ্তিতে আয়েষাকে আবারও এবং শেষবারের মতো দেখা যায় তিলোত্তমা ও জগৎসিংহের বিবাহকালে। তিলোত্তমাকে সে বলে যেন আয়েষাকে সে বিস্মৃত না হয়,

অথচ জগৎসিংহের মনে তার স্মৃতি যে ‘শৈলস্বরূপ’ তাও সে বোঝে। তিলোত্তমাকে নিজ রত্নালঙ্কার স্বহস্তে পরিয়ে দেওয়ার ঘটনা একদিকে এ কথাই প্রমাণ করে যে পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তি-গ্রাস করেছে তাকে। কারণ তিলোত্তমার হাতে সে তার ‘সার রত্ন’টিকে তুলে দিয়েছে। এরপর নিজের গৃহে রাত্রিতে একলা আয়েষার মনে যে প্রথম চিন্তাটি তৈরি হয় সেটি এইরকম –

“...অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিলেন। সে অঙ্গুরীয় গরলাধার। একবার মনে মনে করিতেছিলেন, “এই রস পান করিয়া এখনই সকল তৃষা নিবারণ করতে পারি।”[iv]

এই ভাবনা যে আত্মহত্যার ভাবনারই নামান্তর তা বলা বাহুল্য। গড় মান্দারণে আয়েষার ব্যবহারে যে নির্লিপ্তি দেখা গেছিল, আত্মহত্যা তার একটা স্বাভাবিক পরিণতি হতেই পারত। কিন্তু তা হল না। বরং সে ভাবল – “এই কাজের জন্য কি বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ যন্ত্রণা সহিতে না পারিলাম, তবে নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম কেন? জগৎসিংহ শুনিয়াই বা কি বলিবেন?[v]

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র আয়েষার মনের অস্থিরতাকে চমৎকার ভাবে আঁকলেন – একবার তার হাতের গরলাধার অঙ্গুরীয়টি হাত থেকে খোলা ও পুনরায় পরার মধ্যে দিয়ে। অবশেষে আয়েষা কষ্ট থেকে মুক্তির যে অনায়াস পথ তার লোভ সংবরণ করল এবং গরলাধার অঙ্গুরীয়টি জলে ফেলে দিল। বাংলার উপন্যাসে প্রথম আত্মহত্যার চিত্রটি কেবলমাত্র আত্মহত্যার ভাবনা হয়েই থেকে গেল। এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস-এ বলেন –

"এ ভালোবাসা অপরিণামী, এমন কি আত্মপ্রকাশেও অক্ষম, এ কথা জেনেও আত্মদান করেছে এবং গভীর কষ্ট পেয়েছে, একাই সে ব্যথা বহন করেছে এবং আত্মহত্যা করে রেহাই পেতে চায়নি। বাঁচা এবং কষ্ট পাওয়ার মধ্যে তার ব্যর্থ প্রেমকে ধরে রাখার স্বপ্ন দেখেছে। নারী ব্যক্তিত্বের এই উদ্বোধন আধুনিক মননে জন্ম নিয়েছে, ... বাঙালি চেতনায় এই বস্তু নতুন প্রাপ্তি।"[vi]

অসফল আত্মহত্যাটির ভাবনাটি কিন্তু আধুনিকতার কোনো বার্তা বয়ে আনছে না, বরং এখানে বেঁচে থেকে কষ্ট পাওয়ার ভাবনাকে রোমান্টিকতা বলে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ এই আত্মহত্যাটি নিছকই রেহাই পাওয়া বা নিজস্ব যন্ত্রণাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় হতে পারত – তার বেশি নয়।

৩.৫.২ *বিষবৃক্ষ* : মূল্যবোধের পরিণতি

বিষবৃক্ষ-তেও (১৮৭৩) আত্মহত্যার কথা এসেছে বেশ কয়েকবার। অনাথা কুন্দকে নিয়ে নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে আসে এবং তারাচরণের সঙ্গে কুন্দের বিয়ে হয়। বিয়ের তিন বছরের মাথায় বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রর গৃহে ফিরে আসার পর নগেন্দ্র কুন্দর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। এমনকি কুন্দও যে তার দাদাবাবুকে ভালোবাসে সে সত্য আর চাপা থাকে না। ষোড়শ পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই যে দীঘির ধারে বসে কুন্দ মৃত্যুচিন্তায় রত, একদিকে নগেন্দ্রের নামোচ্চারণ তাকে যে সুখের স্পর্শ দেয়, পরমুহূর্তেই তার মনে বিষ খাওয়ার ভাবনা জন্মায়। বিষ কোথা থেকে সে পাবে বা কে তাকে এনে দেবে এ কথা ভাবতে ভাবতেই তার মনে হয়ে যে বিষ সে এখন খেতে পারবে না। এরূপ নানা বিপরীতমুখী ভাবনায় যখন তার মন ক্রমাগত নিজের সঙ্গে নিজে লড়াই করছে তখনই মৃত মা-এর স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী সে স্থিরনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে মরার। –

... "আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।"[vii] –এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবর সোপান অবতরণ আরম্ভ করিল।

কিন্তু এরকম সময়েই নগেন্দ্রর হঠাৎ আবির্ভাব এই আত্মহত্যাটিকে অসম্পূর্ণই রেখে দিল। এছাড়া এই পরিচ্ছেদেই লেখক নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনী উভয়কেই জলে ডুবে আত্মহত্যার নির্দেশ দেন এবং তার কারণস্বরূপ বলেন যে হীন নগেন্দ্র সূর্যমুখীর প্রণয় ভুলেছে এবং কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রর এই হীন প্রণয়ে সাড়া দিয়েছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে লেখকের কাছে আত্মহত্যার চেহারাটা ঠিক কী তা স্পষ্ট হয়ে যায় কিংবা বলা যায় কোন নৈতিকতার মাপকাঠি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে আত্মহত্যার মত প্রসঙ্গকে চিত্রিত করেন তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

নগেন্দ্রনাথের মনেও একবার মৃত্যুভাবনা তৈরি হয়েছে এই উপন্যাসে। হরমণির গৃহে আগুনে পুড়ে সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ শোনার পর একসময় নগেন্দ্র ভাবে –

"প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?" তখন চক্ষু হস্তে আবৃত করিয়া, জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন।[viii]

অন্যদিকে এই উপন্যাসে তৈরি হতে থাকে এক আত্মহত্যার সম্ভাবনা। নগেন্দ্রর প্রতি প্রেম কুন্দের বহুকালের। কিন্তু তবু সে কখনো তাকে পাওয়ার আশা করেনি। অথচ তাকে পেয়েও এমনভাবে অবজ্ঞা তাকে যে কতটা আঘাত করেছিল তা বলা বাহুল্য। অন্যদিকে সে সূর্য্যমুখীর এই অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী করে নিজের মৃত্যু কামনা করেছে বারবার। যাকে একবার দেখার আশায় কুন্দ অধীর হয়ে ছিল সেই নগেন্দ্র বাড়ী ফিরে একবারও কুন্দের সঙ্গে দেখা করল না। অন্যদিকে দেবেন্দ্রের প্রেমে উন্মাদিনী, কুচক্রী

হীরার মনে দেবেন্দ্রের প্রেয়সী কুন্দর প্রতি ঈর্ষা কি প্রবল হয়েছিল তার পরিচয় মেলে এই অংশে। দুঃখিনী কুন্দের কান্নায় এতটুকু সহানুভূতি না দেখিয়ে কুন্দর সামনে 'আত্মহত্যা'র মতো শব্দকে তুলে ধরে কুন্দর সর্বনাশের শেষ দেখতে চেয়েছে সে। কুন্দকে বিষের মোড়ক দেখিয়ে তা বন্ধ করতে ভুলে যাওয়া এবং হঠাৎই বাড়ির মধ্যে ছুটে যাওয়া – এই অন্যমনস্কতা ভাণটা লেখক সুন্দরভাবেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। তাই বিষ পান করে কুন্দর আত্মহত্যা আসলে এক অর্থে হীরা কর্তৃক কুন্দর হত্যা বা তার মানসিক অবসাদের সুযোগ নিয়ে আত্মহত্যায় প্ররোচনা তো বটেই। কুন্দ তার আত্মহত্যার কারণস্বরূপ একবার বলে যে নগেন্দ্র যদি একবার এর আগে তার কাছে আসত, তাহলে সে মরত না কারণ নগেন্দ্রকে দেখে তার আজও তৃপ্তি হয়নি, অন্যদিকে সে জানায় যে সে সূর্য্যমুখীর পথের কাঁটা হয়ে থাকতে চায় না বলেই মৃত্যুর কথা ভেবে রেখেছে অনেক পূর্বেই। তবে প্রিয়তম মানুষটিকে নিজের করে অকস্মাৎ পাওয়া ও তার থেকে ফিরে পাওয়া অপ্রেম-ই যে কুন্দর অবসাদের কারণ তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। আর এই অবসাদকে কাজে লাগিয়েছিল হীরা। কুন্দের মতো স্বভাবনীরব নারীর সব থেকে বড় সংলাপ তো এই আত্মহত্যাই। এই আত্মহত্যা তার প্রতি হওয়া সমবেত অন্যায়ের চরম প্রতিবাদ।

৩.৫.৩ *চন্দ্রশেখর :* মহৎ আত্মাহুতি?

আত্মহত্যার প্রচেষ্টা, ভাবনা এবং পরের জন্য আত্মহত্যা – এ সবই ছড়িয়ে আছে *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫) উপন্যাসটিতে। উপন্যাসের শুরুতেই অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই দেখি যে প্রতাপ ও শৈবলিনী পরস্পরের প্রতি আসক্ত এবং উভয়ের বিবাহ অসম্ভব জেনেই গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে তাদের আত্মহত্যার পরিকল্পনা। প্রতাপ ডুবল কিন্তু শৈবলিনীর তখন

মনে হল যে প্রতাপের জন্য সে মরবে না। তার ভয় জাগল – সে আত্মহত্যা না করে ফিরে এল।

আবার দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে শৈবলিনীর মনে আত্মহত্যার ভাবনা তৈরি হয়। একাকিত্ব থেকে তার মনে যে ভয় তৈরি হয় তার প্রসঙ্গে সে মনে করে যে মৃত্যুতে তার ভয় নেই। কিন্তু মৃত্যু তথা আত্মহত্যা নিয়ে তার মনে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয় সে ভাবে –

"আত্মহত্যা বড় সহজ – সহজই বা কিসে? এত দিন জলে বাস করিলাম, কই এক দিনও ত ডুবিয়া মরিতে পারিলাম না। ...মরিতে বাসনা, কিন্তু মরিবার কোন উদ্যোগ করি নাই। - কিন্তু আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে – প্রতাপের কি হয় তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না।"[ix]

এরপরেও তার মনে মৃত্যুর বাসনা ক্রমশ প্রবল হতে থাকে এবং কোমরে গোঁজা ছুরি সে নিজের বুকে স্থাপন করে কিন্তু শেষ অবধি মরতে পারে না। তার মনে স্বামী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা তৈরি হয়।

উপন্যাসের ষষ্ঠ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই যে মহম্মদ তকির মিথ্যাভাষণে নবাবের মনে দলনী বেগমের চরিত্র নিয়ে মিথ্যা ধারণা তৈরি হয়। বিশ্বাসঘাতিনী দলনীকে মীরকাসেম বিষ পান করিয়ে মৃত্যুর আদেশ দেন। প্রকৃত সত্য জানতে পেরে দলনী বিষ পানে উদ্যত হয়। মহম্মদ তকির ঘৃণ্য প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দলনী অভিমানে নবাবের আদেশ পালন করে। - "তোমার ক্রোধই আমার বিষ – তুমি যখন রাগ করিয়াছ – তখন আমি বিষ পান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক

যন্ত্রণা!”[x] – এই বলে দলনী বিষ পান করে। প্রাণাধিক প্রিয় মীরকাসেমের তার প্রতি অবিশ্বাস – এই অভিমান, অপমানকে মাথায় করেই দলনীর আত্মহত্যা।

কাহিনির শেষে গিয়ে প্রতাপকে শৈবলিনী জানায় যে প্রতাপের থাকাতে শৈবলিনীর স্বামীর সংসারে নির্ব্বিবাদ সুখ সম্ভব নয়। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রতাপ – এ যুদ্ধে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেই। রমানন্দস্বামীকে সে জানায় – “শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। ... তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই আপনদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম।”[xi] প্রতাপের মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়েছিলেন যে তার ভালোবাসার নাম ‘জীবনবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা’ – প্রতাপের এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা না বলে আত্মাহুতি বলাই কর্তব্য। পরোপকার, স্বার্থত্যাগের যে চরম চিত্র প্রতাপের আত্মত্যাগে বঙ্কিম আঁকতে চেয়েছেন সে প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন –

“মনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে নয়, মনের উপর পুরো বিশ্বাস নেই, তাই নিজেকে নৈতিক সংযমে বাঁধা শক্তির উপরে বিশ্বাস। তাই আত্মহত্যা, বীরের মতো আত্মদান (তাতে গৌরব আছে; এই গৌরবটুকু চাই প্রতাপের – দুঃসাহসিক বীরের কার্যে তার বড় প্রীতি) করে সে সমস্যার সমাধান চায়।”[xii]

অর্থাৎ এই আত্মহত্যা আসলে সমস্যা সমাধানের জন্য আত্মাহুতি। কাহিনির প্রয়োজনে, সামাজিক সুস্থিতির প্রয়োজনে, প্রিয় শৈবলিনীর সুখের পথে কাঁটা না হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রতাপের এই মহৎ আত্মত্যাগ লেখক আসলে প্রতাপ চরিত্রকে তার আদর্শবাদ দিয়ে গৌরবান্বিত করে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু পাশাপাশি তার এই আত্মহত্যায় বড় মাপের কিছু করার প্রবণতা বড়ই বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

৩.৫.৪ কৃষ্ণকান্তের উইল : অপ্রাপ্তি ও আত্মহত্যা

কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)-এ আত্মহত্যার গুরুত্ব অপরিসীম। গোবিন্দলালের কাছে গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর ভালোবাসার কথা শুনে ভ্রমর ক্ষীরি দাসীকে দিয়ে রোহিণীকে বলে পাঠায় যে সে যেন বারুণী পুকুরে সন্ধেবেলা কলসী গলায় দিয়ে মরে। গোবিন্দলালের সম্মুখে নিজের ভালোবাসার কথা স্বীকার করে অথচ প্রেমাস্পদকে না পাওয়ার যন্ত্রণা কিংবা ভ্রমরের কথায়, রোহিণী বারুণী পুকুরে আত্মহত্যা করতে ডুব দেয়। সেই আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর প্রণয় শুরু।

দ্বিতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে রোহিণী একদিন অনায়াসে বারুণী পুরকুরে ডুব দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, গোবিন্দলালের পিস্তলের সামনে দাঁড়িয়ে সে ভাবল–

"মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন, করুন। ইহাকে কখনও ভুলিব না কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইহাকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইঁহাকে মনে করিব... সেও এক সুখ, সেও ত এক আনা। মরিব কেন?"[xiii]

– রোহিণীর আত্মহত্যার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা এবং পরবর্তীতে জীবনের প্রতি তার এই প্রবল অনুরাগ একে অনেকটাই আরোপিত বলে মনে হয়। একে কখনই হৃদয়ের চঞ্চলতা বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। উপন্যাসের খাতিরে রোহিণীর মৃত্যুর মতো, মৃত্যুর পূর্বে রোহিণীর এই জীবন বাসনাও শিল্পসম্মত নয়। আবার দ্বিতীয় খণ্ড দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের পুলিশের হাতে ধরা পরার কথা শুনে ভ্রমর পিতা মাধবীনাথকে পাঠায় গোবিন্দলালে উদ্ধারের জন্য। অনুদ্ধারে তার আত্মহত্যার কথাও বলে। তবে এই আত্মহত্যার ভাবনাটি ভ্রমরের তৎকালীন মানসিক অবস্থার সঙ্গে স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। ভ্রমর দুঃখ

পেয়েছে যন্ত্রণা তার ক্রমশ বেড়েছে, গোবিন্দলালের প্রতি তার ভালোবাসার মধ্যে অকারণ আত্মনিবেদনের ভঙ্গী কখনই প্রকাশ পায়নি। স্বামীর প্রেম হারানোর লজ্জা, অপমান, পরাজয়ে সে ক্রমশ শয্যাশায়ী হয়েছে। ওষুধ না খেয়ে ক্রমশ মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা, তার এই অপমানের বিরোধিতা – এও তো একপ্রকার আত্মহত্যা। অনেক দিন ধরে, স্থির চিত্তে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে নিজেকে ঠেলে দেওয়া – এই আত্মহত্যা হয়ত অনেক কঠিন।

এক্ষেত্রে আরেকটি প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করতেই হবে। প্রচলিত সংস্করণে গোবিন্দলাল সেই বারুণী পুকুরেই আত্মহত্যা করে যেখানে একদিন রোহিণী ডুবেছিল। পরবর্তী প্রায় ১৪ বছর পরে লেখক বর্তমান পাঠটি নির্মাণ করলেও মনে রাখতে হবে যে গোবিন্দলালের এই আত্মহত্যাকে তার পাপের পরিণামরূপে শুধু দেখা ঠিক হবে না। বরং অস্থির গোবিন্দলালে অস্থির জীবনের এটাই যেন স্বাভাবিক পরিণতি হতে পারত। বর্তমান উপসংহারটি আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বের প্রভাব।

৩.৫.৫ *আনন্দমঠ* : পাপ ও আদর্শবোধের পরিণতি

১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *আনন্দমঠ* উপন্যাসে যে দুটি আত্মহত্যার কথা আমরা পাই তার একটি মহেন্দ্রপত্নী কল্যাণীর এবং অপরটি সন্তানদলের সদস্য ভবানন্দের। অনেক বাধা বিপত্তি, কষ্ট সহ্যের পর মহেন্দ্র-কল্যাণীর সাক্ষাত হলে স্বামীর মাতৃসেবাব্রতের কথা জানতে পারে কল্যানী। স্বামীর এই ব্রতে নিজেকে বাধাস্বরূপ জ্ঞান করে কল্যাণী বিষের কৌটো হাতে নিয়ে প্রাণত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। এমতাবস্থায় তার শিশু কন্যাটি আচমকা সেই বিষের বড়ি সামান্য মুখে দিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ে। স্বামীর ব্রত, কন্যার মৃত্যু সন্দেহে কল্যাণী উন্মাদিনী হয়ে উঠে সেই বিষ বড়ি মুখে দিয়ে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করে। কিন্তু

বিষ খেয়ে কল্যাণীর মৃত্যু হয় না। এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টাটি অসফলই রয়ে যায়। যদিও কল্যাণীকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসে রচিত হয়ে যায় অন্য এক আত্মাহুতির সম্ভাবনা। চিকিৎসায় কল্যাণীকে সুস্থ করে ভবানন্দ। কিন্তু তাকে মহেন্দ্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া পরিবর্তে কল্যাণীর প্রতি আসক্তিতে, ইন্দ্রিয় পরবশ হয়ে পড়ে। সে জানে সন্তানদের ইন্দ্রিয়-পরবশতার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। আর কাহিনির শেষে তাই নিজকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে সে জীবানন্দকে জানায় – "আজ আমার মরিবার দিন।"[xiv] সে একথাও বলে – "আমার চিত্ত কলুষিত – আমাকেই মরিতে হইবে...।"[xv] যবনের সঙ্গে যুদ্ধকালে প্রবল বিক্রমে ভবানন্দ যুদ্ধ করেন। মৃত্যুকালে সে মহারাজের উদ্দেশ্যে জানাতে চায় যে সে অবিশ্বাসী নয় এবং তার এই আত্মত্যাগকে প্রায়শ্চিত্তরূপে চিহ্নিত করার পর বঙ্কিমচন্দ্র এই মৃত্যুর জন্য রমণীর রূপ-লাবণ্যকে দায়ী করেন।

৩.৫.৬ *রাজসিংহ* : ধর্মরক্ষা ও আত্মাহুতি

রাজসিংহ উপন্যাসে দুবার আত্মহত্যার কথা পাই। প্রথম খন্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদে আমরা জানতে পারি যে দারার দুই প্রধানা মহিষীর মধ্যে যিনি রাজপুতকন্যা তিনি বিষ খেয়ে মরেন কারণ দারার মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজেব কোরাণ বচন উদ্ধৃত করে দেখান যে বড় ভাই মরলে বিধবা ভাতৃজায়া ছোট ভাইকে বিবাহ করতে বাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্র একে ধর্মরক্ষার জন্য আত্মহত্যা বলেই চিহ্নিত করেছেন। আরেকবার দেখা যায় যে তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে যখন রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীকে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে বিবাহের জন্য দিল্লী পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে তখন চঞ্চলকুমারী বলে যে দিল্লীর পথে সে অঙ্গুরীয়ের বিষ পান করবে তবু মুসলমানের শয্যাসঙ্গী হবে না। এই আত্মহত্যার ভাবনাও আসলে ধর্মরক্ষার তাগিদে, বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষে এবং হয়ত বা রাজসিংহের প্রতি গোপন প্রেমের কারণে।

রাজসিংহ উপন্যাসে আরও একটি আত্মহত্যার প্রসঙ্গকেও ছুঁয়ে যেতে হবে। উপন্যাসের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে মবারক তার প্রাণরক্ষাকারিনী, দুঃখিনী দরিয়ার কথা আবারও বিস্মৃত হয়। জেবউন্নিসার বিনীত রূপ দেখে সে আবারও মুগ্ধ হয়। কিন্তু সে সময়ই দরিয়া বিবির চকিত আবির্ভাবে মবারক নিজ কৃতকার্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আল্লার উদ্দেশে বলে ওঠে যে তাকে আজ মরতেই হবে। হয়তো একারণেই এই পরিচ্ছেদের নাম 'মবারকের দহনারম্ভ'। এই অধ্যায়েই উন্মাদিনী দরিয়ার গুলিতে প্রাণত্যাগ করে মবারক। কিন্তু এই মৃত্যু বিষয়ে সুনিশ্চিত জেনেই যুদ্ধক্ষেত্রে মবারকের আগমন কি তার আত্মহননের ইচ্ছারই পরিচয় দেয় না? নিজ পাপ, বিশ্বাসঘাতকতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ মবারকের কাছে এই মৃত্যু যেমন আত্মাহুতি তেমনই কি এর মধ্যে Ego-র পরাজয়ও লুকিয়ে থাকে না ?

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় যে Durkheim কৃত Altruistic ও Egoistic Suicide-এর বিভাজন বারবার ভেঙ্গে যায় বঙ্কিমের উপন্যাসে। আর এই বিভাজন তো একজন আধুনিকের হাতে না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ ব্যক্তিমানুষের আত্মাহুতির পেছনেও তো থাকে 'আত্ম'কে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের চাহিদা। আর এই চাহিদা কি Ego ব্যতিরেকে হওয়া সম্ভব? এইকারণেই বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রতাপ, মবারক বা কল্যাণী সকলের আত্মহত্যাই দুলতে থাকে ও Altruistic ও Egoistic Suicide-এর মাঝখানে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নানা প্রকার আত্মহত্যা ও আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টাগুলিকে লক্ষ্য করার পর বোঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আত্মহত্যাগুলির পেছনে পার্থিব কারণ খুঁজে বের করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় –

"যে সব মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে মানুষ বেঁচে থাকে, তার সঙ্গের এর সংঘাত উপস্থিত হলে যখন কোনো-কোনোটি বালুস্তম্ভের মতো ভেঙে পড়ে, তখনো আমরা খুব বেশি অস্বস্তি বোধ করি না।"[বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র – "*আত্মহত্যার অধিকার*",[xvi]

৩.৫.৭ *কপালকুণ্ডলা* : 'নিঃসঙ্গতা' – আত্মহত্যার নতুনতর ব্যাখ্যা

বঙ্কিমের উপন্যাসে আত্মহত্যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মূল্যবোধের কথা। কখনও সে মূল্যবোধ উপন্যাসের চরিত্রের মূল্যবোধ – আবার কখনো লেখকের সামাজিক মূল্যবোধও তাঁর উপন্যাসে হত্যা বা আত্মহত্যার মত ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মরক্ষার খাতিরে বা সতীত্ব রক্ষার জন্য যে আত্মাহুতি 'পদুমাবৎ' বা 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ দেখেছিলাম – তারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে বীরেন্দ্র সিংহের অকুতোভয় আত্মত্যাগ, দারার রাজপুত পত্নীর আত্মত্যাগ কিংবা চঞ্চলকুমারীর বিষপানের আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে। Durkheim যে Altruistic Suicide–এর কথা বলেন এগুলো যেন তারই প্রতিরূপ। এর মধ্যে জড়িয়ে থাকে সমাজের মূল্যবোধের ভাবনাও, তাই দারার রাজপুত পত্নীর আত্মহত্যা যেমন বাধ্যতামূলক Altruistic Suicide, আবার স্বামীর কর্মপথের বাধা হতে না চাওয়ায় কল্যানীর আত্মহত্যার চেষ্টা আবার ঐচ্ছিক Altruistic Suicide। প্রতাপ যেভাবে কাহিনির শেষে কেবলমাত্র শৈবলিনী ও চন্দ্রশেখরের সুখী ভবিষ্যতের কারণে আত্মাহুতি দিতে চায় তাকে স্বার্থহীন Altruistic Suicide বলে ভাবা যেতে পারে বঙ্কিমের বক্ত্যব্যের সঙ্গে মিলিয়ে। কিন্তু পাশাপাশি Egoistic Suicide–এর ধরনটির প্রভাবও এক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। তার বেঁচে থাকায় প্রিয়তমা শৈবলিনীর সুখ সম্ভব নয় – এই বাক্যের পরের আত্মহত্যার যে প্রবণতা তৈরি হয় তার মধ্যে তাতে

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধ দুই-ই প্রবল হয়ে ওঠে। আয়েষার আত্মহত্যার চেষ্টা, রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা কিংবা কাহিনির শুরুতে প্রতাপ-শৈবলিনীর আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত – এই সবই এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অধিকারবোধের ফলাফল। কোনো মানুষ বা বস্তুর প্রতি নিজের অধিকারবোধ তৈরি হওয়ার অথচ সেই অধিকারবোধ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে যে অতৃপ্তি, Durkheim তাকেই Egoistic Suicide-এর কারণ বলে চিহ্নিত করেছেন। দলনী বেগম বা ভ্রমরের আত্মহত্যায় অভিমান বা দুঃখবোধ প্রবল। তাকেও পারিবারিক সমাজ প্রভাবিত Egoistic Suicide বলে চিহ্নিত করব আমরা। কুন্দর আত্মহত্যাকে যে হত্যা বলেও চিহ্নিত করা যায় সে কথা আগেও বলেছি আমরা। এই সব আত্মহত্যাগুলির পেছনে বঙ্কিমের মূল্যবোধ ও পাপ-পুণ্যের ধারণা কাজ করেছে। যার প্রধান নিদর্শন হয়ত ভবানন্দের আত্মহত্যা। Durkheim দেখিয়েছিলেন যে আত্মহত্যা কিভাবে নির্দিষ্ট কারণ, মূল্যবোধ, পাপ-পুণ্যের ধারণাকে ছাড়িয়ে, আত্মহত্যা ক্রমশ অকারণ হয়ে উঠেছে। বাঁচতে চাওয়ার বা নতুন করে বেঁচে ওঠার সমস্ত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও একদিন আধুনিক মানুষের বাঁচার ইচ্ছা চলে যায়। বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্ররা কিন্তু কেউই মৃত্যুর সেই তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। আত্মহনন ও বেঁচে থাকার দ্বন্দ্বে আয়েষা, রোহিণী বেঁচে থাকার পথ বেছে নিয়েছে। কুন্দর মনেও দ্বন্দ্ব ছিল তা বিষপানের পর তার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, তার আত্মহত্যা আসলে সাময়িক প্ররোচনার ফল। কিন্তু এই সবকিছুর পরেও বঙ্কিমের উপন্যাসের একটি চরিত্রের কথা বলতেই হয় সেখানে – একাকিত্বের আধুনিকতাকে প্রকাশ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। সত্যেন্দ্রনাথ রায় তাঁর বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা বইতে বলেন –

"আধুনিকতার একটা বড় লক্ষণ আত্মসচেতনতা, এমন যা মানুষকে নিঃসঙ্গ করে ফেলে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক এইজন্য যে তিনি এই নিঃসঙ্গতাকে চিনতেন। নবকুমার চন্দ্রশেখরে এই আভাস মিলবে।"[xvii]

সত্যেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখর, নবকুমার চরিত্রে যে নিঃসঙ্গতার আভাস দেখেছেন সেই নিঃসঙ্গতার চরম প্রকাশ আমার মতে কপালকুণ্ডলা-য়। এই কারণেই উপন্যাসের কালক্রম ভেঙে বঙ্কিমের অন্যান্য উপন্যাসের শেষে এই উপন্যাসটি আলোচনা করেছি। সমুদ্রতীরের থেকে নবকুমারের সংসারে এসে পড়া কপালকুণ্ডলা ছিল আক্ষরিক অর্থেই এই সাংসারিক মোহজাল থেকে বিচ্ছিন্ন – সে যোগিনী। তাই শ্যামসুন্দরীর কাছে তার অকপট স্বীকারোক্তি – "বলিতে পারি না। বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"[xviii] আর তাই যখন মিথ্যা সন্দেহে কাপালিকের সম্মুখে নবকুমার কপালকুণ্ডলার বলি দিতে উদ্যত তখনো কপালকুণ্ডলার ধীর স্বর পাঠককে বিস্মিত করে। উন্মত্তপ্রায় নবকুমার যখন জানতে চায় যে – কপালকুণ্ডলা প্রকৃত অবিশ্বাসিনী কিনা এবং তাকে পুনরায় হৃদয়ে ঠাঁই দিয়ে গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার আকুল প্রার্থনা করে তখন কপালকুণ্ডলার বক্তব্য এইরকম –

"...আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি – নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"[xix]

পুনর্জীবন লাভের শত প্রলোভন সত্ত্বেও কপালকুণ্ডলার এই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা যে স্বামীর প্রতি অভিমানবশত নয়, তা প্রমাণিত হয় তার আবেগবিহীন শেষ বক্তব্যে। একাকিনী কপালকুণ্ডলা যে মিথ্যে বন্ধনে জড়িয়ে ছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে মৃত্যু – এ যেন কপালকুণ্ডলার পরম আকাঙ্ক্ষার আর তাই এর পর তরঙ্গের আঘাতে কপালকুণ্ডলার মৃত্যু দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা তা বিচার অর্থহীন। কারণ আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত কপালকুণ্ডলা অনেক আগেই নিয়েছে। ভৈরবী তাকে আত্মবিসর্জন দিতে বলেছে, সংসার তাকে সুখ দিতে পারে নি, তীব্র বিচ্ছিন্নতাবোধ তাকে চিরস্থায়ী বিষাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে, অন্যান্য উপন্যাসের চরিত্রের মতো সে সিদ্ধান্তে দোলাচল, সংশয়, দ্বিধা নেই – মৃত্যুকে ভালোবেসে এই মৃত্যুই বঙ্কিমের উপন্যাসে একমাত্র আধুনিক আত্মহনন। কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাতে নবকুমারের আত্মত্যাগে এই আধুনিকতার লেশমাত্র নেই। সুতরাং বঙ্কিমের উপন্যাসে যে যে আত্মহত্যার বর্ণনা আমরা পাই তাকে আধুনিক 'আত্মহত্যা' বলব কিনা সে প্রশ্ন তোলাই যায়। কারণ এই আত্মহত্যার অধিকাংশই মহৎ আদর্শবাদের পরিণাম বা আত্মাহুতি। কখনো বা ভিক্টোরীয় মূল্যবোধে পাপ-পুণ্যের হিসাব নিকাশ ও তার প্রকাশ হিসাবে আত্মহত্যা। একমাত্র 'কপালকুণ্ডলা'র আত্মহত্যাকেই পার্থিব কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই পাঠকের মনের সহজ যৌক্তিকতা দিয়ে একে বিচার করাও যায় না। এরপর আমরা দেখব যে বঙ্কিম পরবর্তী নানা ঔপন্যাসিক কিভাবে আত্মহত্যার ঘটনাকে উপন্যাসে এনেছেন। কপালকুণ্ডলার বিচ্ছিন্নতাবোধ ও একাকিত্বের ভাবনাকে আরো আধুনিক ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে না কি সেই একই চর্বিত চর্বণ? বঙ্কিম সমকালীন অন্যান্য উপন্যাসের আলোচনায় এই ব্যাখ্যাই খুঁজব।

৩.৬ বঙ্কিম সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাস

৩.৬.১ রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

বঙ্কিম সমকালীন লেখকদের অন্যতম ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিম অনুসরণের কথা বলা হয়। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বা ঐতিহাসিক ঘটনার নিদর্শনও বহুজনসম্মত।

৩.৬.১.১ *বঙ্গবিজেতা* : পরিত্রাণের উপায়

তাঁর *বঙ্গবিজেতা* উপন্যাসটি (১৮৭৪) বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) ও চন্দ্রশেখর (১৮৭৫) উপন্যাসের প্রায় সমকালীন। তাঁর উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রবণতা বহুক্ষেত্রেই তাঁর পূর্ববর্তী বঙ্গসাহিত্য বা অনেকাংশেই বঙ্কিমের ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকায় (১২৮১ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত এই উপন্যাসটিতে মোগল সম্রাটের বীর ও বিশ্বস্ত সেনাপতি সমরসিংহকে হীন চক্রান্তে হত্যা করেন ব্রাহ্মণ সতীশচন্দ্র। সমরসিংহের বিধবা মহাশ্বেতা তাঁর পতির মিথ্যা প্রাণদণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়াকেই জীবনের ব্রত বলে নির্ধারণ করেন। কাহিনি এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সতীশচন্দ্রের পরিবর্তে তার মন্ত্রণাদাতা শকুনিই প্রকৃত দোষী বলে সাব্যস্ত হয়। যুদ্ধ জয়ের শেষে রাজা টোডরমল্ল ইছাপুরে আসার পর শকুনিকে বিচারের উদ্দেশ্যে তাঁর সম্মুখে আনা হয়। মিথ্যা অভিযোগে সমরসিংহের প্রাণদণ্ড ঘটানোর অপরাধ খুব শীঘ্রই সকলের সামনে প্রমাণিত হয়। দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর চতুর শকুনি প্রাণরক্ষার শেষ অস্ত্ররূপে টোডরমল্লকে বলে –

“আমার দোষ যদি প্রমাণ হইয়া থাকে, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ অবধ্য ... সহস্র বৎসর পরেও বৃদ্ধেরা গল্প করিবে যে, মুসলমানদিগের সময়েও যাহা হয় নাই, রাজা টোডরমল্লের শাসন কালে ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল।”[xx]

মৃত্যুর পূর্বে শকুনির বাঁচার এই আপ্রাণ চেষ্টা বিফল হয়ে যায় বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর হঠাৎ আবির্ভাবে। তারই কাছে জানা যায় যে শকুনি ব্রাহ্মণ নয় – সমরসিংহ ও সতীশচন্দ্রের প্রতি কৃত অন্যায়ের পাশাপাশি একথাও জানা যায় যে কিভাবে শকুনি তার মাতা এবং বিশ্বেশ্বরীর প্রতি অত্যাচার করেছে। রাজসভায় সকল সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ায় শকুনি বুঝতে পারে যে তার জীবনের আর কোনো আশা নেই –

“শকুনি দেখিল আর পরিত্রাণ নাই। স্থির প্রতিজ্ঞ, প্রস্তুতমতি শকুনি তখন নির্ভয়ে শেষ উপায় অবলম্বন করিল। ধীরে ধীরে বস্ত্রে লুক্কায়িত ছুরিকা বাহির করিয়া সমস্ত সভার সমক্ষে আপনাকে আঘাত করিল। ছিন্ন তরুর ন্যায় শকুনির মৃতদেহ ভূমিতে পতিত হইল।”[xxi]

শকুনির এ আত্মহত্যা নেহাতই মৃত্যু নিশ্চিত জেনে পলায়নের উপায়মাত্র। অর্থাৎ তার এই আত্মহত্যাকে লেখক যতই নির্ভীক পদক্ষেপ বলুক না কেন – কোনোভাবেই শকুনির এই আত্মহত্যকে গৌরবান্বিত করা যায় না। নেহাতই পাপের পরিণামরূপে শকুনির এই মৃত্যু উপন্যাসের সমাপ্তিকে স্বস্তিদায়ক করেছে মাত্র। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রামদুলাল বসু তাঁর ‘বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ’ বইতে বলেছেন যে - “শকুনিকে হত্যা করে এক সৈনিক।”[xxii] বলা বাহুল্য, এ তথ্য ভ্রান্ত।

৩.৬.১.২ মাধবীকঙ্কণ : উগ্র প্রতিশোধস্পৃহা

রমেশচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাসটি অর্থাৎ *মাধবীকঙ্কণ* (১৮৭৭)-কে লেখকের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলেছেন অনেকেই। তবে বহুক্ষেত্রেই উপন্যাসটিকে নরেন্দ্র, হেমলতা ও শ্রীশচন্দ্রের কাহিনি বলে ব্যাখ্যা করেছেন বহু সমালোচক। কিন্তু এই উপন্যাসে জেলেখার ভূমিকা অস্বীকার করার অর্থ উপন্যাসের রোমান্টিকতাকে অগ্রাহ্য করা। জাহানারার দাসী জেলেখা যুদ্ধে আহত নরেন্দ্রকে সেবা করতে নিয়ে আসে রাজপ্রাসাদের আপন ঘরে। প্রথম দর্শনেই নরেন্দ্রর প্রেমে উন্মাদিনী জেলেখার এই অন্যায় আচরণের জন্য জেলেখা ও নরেন্দ্র উভয়েরই প্রাণদণ্ড হয়। বেগম সাহেবের দণ্ডের হাত থেকে নরেন্দ্রকে রক্ষা করে পলায়ন করে জেলেখা। পরবর্তীতে নরেন্দ্রর সঙ্গী হওয়ার বাসনায় 'দেওয়ানা' নাম নিয়ে তাতার বালকের ছদ্মবেশ ধারণ করে সে। ঘুষ দিয়ে শৈলেশ্বর নামে এক হিন্দু সন্ন্যাসীকে দিয়ে নরেন্দ্রর মনে হেমকে পাওয়ার আশা নির্মূল করে সে। কিন্তু তবুও যবনী প্রেমে অসম্মত নরেন্দ্রকে একবার হত্যা করতেও উদ্যত হয় জেলেখা। অবশেষে তার প্রণয় সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশ জেলেখা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কিন্তু শুধু এইটুকুতেই তার আত্মহত্যার কাহিনি শেষ হয় না। না পাওয়ার যন্ত্রণায় আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়ে নীরবে সরে যায় না সে। মূল্যবোধ, পাপ-পুণ্যের ধারণাকে নস্যাৎ করে মৃত্যুর পূর্বে আগ্রা দুর্গের ভেতরে দর্পণে সে নরেন্দ্রকে হেমলতার ছবি দেখায়। তার চিঠির অংশটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আত্মহত্যার পূর্বে এরূপ চিঠির ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে ছিল অভিনব তা সন্দেহ নেই–

"... তোমার হেমকে দেখিলাম। পাপিষ্ঠ! পরস্ত্রী তোমার হেম? ... মথুরার গোলকনাথ মন্দিরে তিন দিন অর এক প্রহর রাত্রির সময় যাইও, পরস্ত্রীকে আবার দেখিও। তুমি

আমাকে হতভাগিনী করিয়াছ, তোমাকেও হতভাগা করিব সেই জন্য এই সমাচার দিলাম। সেই জন্য আগ্রায় দুর্গে লইয়া যাইয়া হেমকে দেখাইয়াছিলাম।”[xxiii]

প্রকৃতই তাতারদের যে ‘জিঘাংসা’ ধর্মের কথা বলেছে জেলেখা তারই পরিচয় পাওয়া যায় এই আচরণে। এ প্রসঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস গ্রন্থে ক্ষেত্রগুপ্তের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য–

“জেলেখার এই কাজের মধ্যে ব্যর্থ প্রণয়িনীর আত্মত্যাগ নেই – যাকে সে ভালোবাসে সেই নরেন্দ্রকে প্রেমিকার হাতে সঁপে দেওয়া নয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি জেলেখা জানে বিবাহিতা হেমকে নরেন্দ্র পাবে না, পরস্ত্রী হেমকে নরেন্দ্র আর কামনা করতে পারবে না। ... জেলেখা নওরোজে হেমকে দেখিয়ে তাকে উসকে তুলল। সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে অনিবার্য যন্ত্রণায় নরেন্দ্রকে নিক্ষেপ করে গেল, যে দাহে পুড়ে সে নিজে আত্মঘাতি হল।”[xxiv]

জেলেখার এই আত্মহত্যা রামদুলাল বসুর চোখে ‘অবাস্তব আদর্শবাদ’ এবং তাঁর মতে জেলেখার “প্রেম ও ব্যর্থ প্রণয়জনিত আত্মহত্যা, তার চরিত্রকে স্বাভাবিকতা দান করেনি।” [xxv]

এই নারীর আত্মহত্যা কুন্দর আত্মহত্যার মতো নয়, আয়েষার মতো এই নারী প্রেমাস্পদকে অন্যের কণ্ঠহার করে তুলে আত্মত্যাগের মহান ব্রতে লিপ্ত হয় না। প্রেমের গভীরতার প্রকাশ এখানে কেবল দুঃখভোগেই শেষ হয় না – প্রতিশোধস্পৃহা মূল হয়ে ওঠে। ‘আমার খারাপ থাকা’ যদি আবশ্যিক হয় তবে যার জন্য আমার এই অবস্থা তার খারাপ থাকার ব্যবস্থাও আমি করে যাব – এ ভাবনা নিতান্ত আধুনিক তা অস্বীকার করা যায় না। অন্তত বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্রের এই আত্মহত্যার ধরণ আমরা আগে দেখিনি।

৩.৬.১.৩ মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ও রাজপুত জীবন সন্ধ্যা : আত্মহত্যা – পৌরুষ ও সতীত্বের প্রতীক ?

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত*-এ জুমলাদার চন্দ্ররাও গজপতির অপমানের প্রতিশোধ নিতে তার কন্যা লক্ষ্মীকে হরণ করে বিবাহ করেছে এবং পরবর্তীতে গজপতির পুত্র রঘুনাথকে মিথ্যা অপবাদে শিবাজীর সম্মুখে বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করেছে। উপন্যাসে 'চতুস্ত্রিংশ' পরিচ্ছেদে সেই চন্দ্ররাও ও রঘুনাথ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়। চন্দ্ররাও যে তার পিতার প্রকৃত হত্যাকারী তা জেনে রঘুনাথ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয় এবং তখনই সে জানতে পারে যে এই চন্দ্ররাওই তার বোন লক্ষ্মীর স্বামী। যুদ্ধে পরাজিত চন্দ্ররাওকে শিবাজীর সম্মুখে আনা হয় বিচারের উদ্দেশ্যে। রহমৎ খাঁর বক্তব্যে জানা যায় যে চন্দ্ররাও বিদ্রোহী এবং তারই কারসাজিতে রঘুনাথের মিথ্যা দণ্ড হয়েছিল। শিবাজী চন্দ্ররাওয়ের দুই হাত ছেদের দণ্ড দিলে রঘুনাথের প্রার্থনায় সে শাস্তি মকুব করেন শিবাজী এবং চন্দ্ররাওকে খালাসের অনুমতি দেন। নির্ভীক চন্দ্ররাও রঘুনাথের দাক্ষিণ্যে পাওয়া জীবনকে তুচ্ছ করে অনায়াসে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এই আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন –

"আত্মহত্যা করে এক ধরণের পৌরুষের পরিচয় দিয়েছে, হীনপ্রাণ ভিলেনির সঙ্গে যার সঙ্গতি নেই।" [xxvi]

এক্ষেত্রে বলতেই হবে যে বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমকালীন রমেশচন্দ্র দত্ত বা পরবর্তী অন্যান্য ঔপন্যাসিকের রচনাতেও আত্মহত্যার বেশ কিছু ধরণ আমরা লক্ষ্য করব। বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির মধ্যে মাত্র দুজন পুরুষ চরিত্রের আত্মহত্যার কথা আমরা পাই – প্রতাপ ও ভবানন্দ। এই দুটি চরিত্রের আত্মহত্যার কারণ কিন্তু মূলত আদর্শবাদ ও বীরের মতো

আত্মদান। প্রিয়জনকে না পাওয়া কিংবা পাপ-মূল্যবোধ এ সকল কারণগুলো আসলে কুন্দ, রোহিণী, আয়েষা, দলনী কিংবা শৈবলিনীদের জন্য। পুরুষদের আত্মহত্যার পিছনে ধর্মরক্ষা, আদর্শরক্ষা কিংবা পৌরুষরক্ষার মত ভারী ভারী কারণ আনতে বাধ্য হয়েছেন সমকালীন লেখকরা। আর তাই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে শকুনির মতো আপাদমস্তক খল চরিত্রকে বাদ দিলে চন্দ্ররাওয়ের আত্মহত্যাও আসলে তার পৌরুষের প্রতীক বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। কিন্তু রমেশচন্দ্রের পরবর্তী উপন্যাসেই দেখব কিভাবে – নারীদের আত্মহত্যার কারণ হিসাবে সতীত্বরক্ষার মতো বিষয় প্রধান হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত*-এও চন্দ্ররাওয়ের স্ত্রী লক্ষ্মীর সহমরণের চিত্র আমাদের অবাক করে। সতীদাহ রদের এতদিন পরেও রমেশচন্দ্রের মতো প্রগতিবাদী লেখকের হাতে এই আত্মহত্যা তথা আত্মাহুতির দৃশ্য কি রমেশচন্দ্রের প্রবল হিন্দু জাতীয়তাবাদের নিদর্শন? লক্ষ্মী যখন ভ্রাতা রঘুনাথের উদ্দেশ্যে বলে – “হৃদয়েশ্বর চির নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভালোবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরনে তাহার সঙ্গিনী হইবে।”[xxvii] তখন পৌরুষ গর্বে চন্দ্ররাওয়ের আত্মহত্যা এবং লক্ষ্মীর সহমরণ – আত্মহত্যার এই কারণের ভেদ আসলে লেখকের তথা সমকালের মনে তৈরি হওয়া একটা প্রবণতাকেই প্রকাশ করে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে।

রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৭৯) উপন্যাসে আত্মহত্যার অনুসঙ্গ আসে ভীমগড়ে রাঠোর ও মুসলমান যোদ্ধাদের যুদ্ধ প্রসঙ্গে। সহস্র মোঘল সেনা ভীমগড় দুর্গের বাইরে অপেক্ষারত – এমন অবস্থায় বালক চন্দনসিংহ বুঝতে পারে যে মাত্র আড়াইশো যোদ্ধা নিয়ে এ যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে তাদের মনে রাজপুত রমণীর সম্মান রক্ষার চিন্তা জাগে। রাজপুতমণ্ডলী সমস্বরে বলে ওঠে – “পুরুষের রণসজ্জা, রমণীর চিতারোহণ।”[xxviii]

হয়ত বা এই উক্তিকে লক্ষ্য করেই ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য করেন–

"মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতের সহমরণ দৃশ্যটিতে ঔপন্যাসিকের চিন্তা পেছনের দিকে বলে মনে হয়েছিল, রাজপুত জীবনসন্ধ্যার জাত একেবারে আলাদা। নারীজাতির এই যৌথ আত্মদান পুরুষদের যুদ্ধে প্রাণ দেবার সমতুল্য। স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু। শত্রুর 'গোলী' বা 'ক্রীতদাসী' হয়ে বাঁচার চেয়ে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া – কোনো বিকৃত সতীমাহাত্ম্য এখানে নেই।"[xxix]

এক্ষেত্রে বলতে বাধ্য হতে হয় যে ক্ষেত্রগুপ্তের এই বক্তব্য সম্পূর্ন সমর্থনযোগ্য নয়। কেন তা বুঝতে গিয়ে আমরা চন্দনসিংহের তার মাতার প্রতি বক্তব্যকে দেখব – "রাজপুত মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় করে না, যুদ্ধদান করিবে। কিন্তু রাজপুত রমণীর সম্মান প্রথম রক্ষণীয়।"[xxx] এরপর চন্দনসিংহের মাতা জানান যে রাজপুত রমণী মরিতে ভয় পায় না। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বলেন –

"সখিগণ! অদ্য আমরা সতী হইব, স্বামীর সোহাগিনী হইব, ইহা অপেক্ষা রাজপুতকামিনীর অদৃষ্টে কি সুখ আছে? ম্লেচ্ছ তুর্কীগণ দেখুক, রাজপুত যোদ্ধাগণ বীর, রাজপুর রমণী সতী।"[xxxi]

নিশ্চয়ই ক্ষেত্রগুপ্ত মহাশয় এই উক্তিগুলিকে লক্ষ করেননি, কারণ চন্দনসিংহের মাতার বক্তব্যে সতী হওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। শুধু এই উক্তি নয়, এপর লেখকের বয়ানটিও উল্লেখযোগ্য – "... যখন পরাজয়, অবমাননা ও ধর্ম্মনাশ অনিবার্য্য হয়, রাজপুত-রমণীগণ এইরূপে সতীত্ব রক্ষা করেন।"[xxxii]

একদিকে এই জৌহর ব্রতকে নারীর সম্মান রক্ষা ও বীরত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শত্রুর হাতে, পরিবারের পুরুষদের হত্যাকারীর হাতে ধরা দিতে, তাদের শয্যাসঙ্গিনী হতে নারাজ রাজপুত নারী, কিন্তু বারবার বিধর্মী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সতী হওয়ার যে বাসনা তাঁদের বক্তব্যে, এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে, তা নারীর সতীত্বের ধারণা ও সমাজ নির্ধারিত নারীর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করে।

৩.৬.২ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)

৩.৬.২.১ হরিষে বিষাদ বা নায়ক-নায়িকাশূন্য উপন্যাস : সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার প্রাচীন কাহিনি

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের *হরিষে বিষাদ বা নায়ক-নায়িকাশূন্য উপন্যাস* (১৮৮৭)-এ আমরা দেখতে পাই যে বিপত্নীক লালবিহারীবাবু পুনরায় বিবাহ করেন অথচ স্ত্রী ও নলিনের মধ্যকার অবৈধ সম্পর্ক কল্পনায় স্ত্রীর সঙ্গে তার দূরত্ব তৈরি হয়। এমতাবস্থায় নলিনের বিধবা দিদি মনোরমার প্রতি লালবিহারীবাবু মুগ্ধ হন। মনোরমার প্রতি তার অশিষ্ট আচরণে মনোরমা সেরূপ তিরস্কার না করায় লালবিহারীবাবু মনে করেন মনোরমাও তার প্রতি আকৃষ্ট এবং মনোরমাকে তিনি সোনারপুরের এক গৃহে বন্দী করেন। ঐ গৃহে সোনামণি নামে স্ত্রীলোকে কাছে মনোরমা জানতে পারে যে এই গৃহে এভাবেই তার মতো আরো অনেকে বন্দী হয়েছে। বহু আকুতি মিনতি করেও সোনামণির হাত থেকে মুক্তি পেতে অক্ষম হয় মনোরমা। অবশেষে কাহিনির শেষ অংশে দেখা যায় যে –

“কিন্তু তিনি পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষী, কি করিবেন তাহার যাহা সাধ্য ছিল তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। ...গাড়ীর শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে লালবিহারীবাবুর গাড়ী।

এবং সেই গাড়ীতে বাবু স্বয়ং আসিতেছেন। ... মনোরমা ভাবিলেন আর উপয়ান্তর নাই তখন সেই গাভীরজ্জু গলদেশে সংলগ্ন করিয়া দিয়ে প্রাণত্যাগই করিলেন।"[xxxiii]

যদিও লালবিহারীবাবু পূর্বেই রেল দুর্ঘটনায় মারা যান এবং বাবুর ঐ গাড়িতে আসলে মনোরমার ভ্রাতা নলীনই আসছিল দিদিকে রক্ষা করতে। এক্ষেত্রেও বোঝা যায় যে লালবিহারী বাবুর লালসার হাত থেকে নিজেকে তথা নিজের দেহগত পবিত্রতা রক্ষার খাতিরে মনোরমা গলায় দড়ি দেয়।

৩.৬.৩ স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২)

স্বর্ণকুমারী দেবীর *স্নেহলতা* (১৮৯২-৯৩), *মিবাররাজ* (১৮৮৭) ও *বিদ্রোহ* (১৮৯০) উপন্যাসে আমরা আত্মহত্যা কিছু ঘটনা দেখতে পাব।

৩.৬.৩.১ স্নেহলতা : অভিমান ও প্রেমের অপমৃত্যু

স্নেহলতা একটি পারিবারিক উপন্যাস যেখানে দুটি আত্মহত্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। একদিকে দেখা যায় যে জগৎবাবুর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি স্ত্রীর সম্পর্কীয় এক বিধবার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। বিধবার গৃহে তার যাতায়াতে নানা রটনার সৃষ্টি হলে তিনি বিধবাটিকে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে তাঁর পিতা এ বিষয়ে জানতে পেরে অবিলম্বে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ দেন। এই সব ঘটনার পাঁচ-ছয় মাস বাদে ঐ বিধবার বাড়িতে গিয়ে প্রতিবেশীদের মুখে তিনি জানতে পারেন যে বিধবা আত্মহত্যা করেছে। জগৎবাবুর মনে হয় তিনিই ঐ বিধবাটির হন্তারক। তাকে বিবাহের আশা দিয়ে অবশেষে প্রতারণা করাই তার মৃত্যুর কারণ।

এছাড়া উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অর্থাৎ স্নেহলতাও আত্মহননের পথ বেছে নেয়। জগৎবাবুর গৃহে পালিত স্নেহলতার সঙ্গে মোহনের বিবাহ ও বৈধব্যের পর আবারও জগৎবাবুর গৃহে ফিরে আসার পর জগৎবাবুর পুত্র চারু ও স্নেহলতার বাল্য প্রেম বিকশিত হয়। স্নেহলতার অর্ধলিখিত চিঠি চারুর হস্তগত হয়। অবশেষে চারুর মঙ্গলকামনায় স্নেহলতা গৃহত্যাগ করে। উপন্যাসের একেবারে শেষে জগৎবাবুর গৃহে ফিরে স্নেহলতা দেখতে পায় নববিবাহিত চারু আজ স্নেহলতাকে জগৎবাবুর বিষয়সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পূর্ব প্রেমের চিঠি পিতার হাতে দেয় এবং স্নেহলতার চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে। এর পরেই স্নেহলতা মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নেয়। চারুর এই ব্যবহার তাকে আহত করে, বাল্যপ্রেমের এই হতাশাজনক পরিণতি দেখে মৃত্যুই তার একমাত্র অবলম্বন বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে লেখিকা বলেন – "সে জীবনে অনেক কষ্ট সহিয়াছে, কিন্তু সহিষ্ণুতারও একটা সীমা আছে?"[xxxiv] সেই সীমা অতিক্রান্ত হওয়াতেই স্নেহলতা বিষপান করে।

কাহিনির উপসংহারে লেখিকার একটি বক্তব্যের দিকে নজর দিলে বোঝা যাবে যে জগৎবাবু তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের মানুষ নারী, নারী শিক্ষা ও আত্মহত্যাকে কিভাবে দেখছেন – "জগৎবাবুর বিশ্বাস, লজ্জায় ও অনুতাপেই স্নেহ আত্মহত্যা করিয়াছে"[xxxv]

এতদিন নানা উপন্যাসে আমরা দেখেছি যে কিভাবে লজ্জা, অনুতাপ, পাপবোধের সঙ্গে নারীদের আত্মহত্যাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই লজ্জা, অনুতাপ, পাপবোধ ছিল নারীর এবং তাকে চিত্রিত করেছিল কোনো পুরুষ। আজ স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসে আমরা দেখি যে অভিমানে, বাল্যপ্রেমিকের মিথ্যা অভিযোগে আহত স্নেহলতার

আত্মহত্যাকে ঠিক তেমনভাবেই ভুল ব্যাখ্যা করে জগৎবাবু, তার মনে হয় যে স্নেহলতার আত্মহত্যার কারণ 'লজ্জা ও অনুতাপ'। শুধু তাই নয়, জগৎবাবু একথাও ভাবেন – "স্নেহকে লেখাপড়া না শিখাইলে সে বেশ সন্তুষ্টচিত্তে আপনার অদৃষ্ট বহন করিতে পারিত আপনার অধঃপতন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিত না।"[xxxvi] অর্থাৎ নিজের বৈধব্য দশা মানতে না পেরে প্রণয়ের চেষ্টা ও তার ফলে অর্জিত পাপ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আত্মহত্যা – এভাবেই জগৎবাবু স্নেহলতার আত্মহননকে ব্যাখ্যা করেন। আমাদের মনে পড়ে যায় রোহিণীর কথা যেখানে এই একই অপরাধের শাস্তি হিসাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎই রোহিণী হত্যার পরিকল্পনা করেন। ফলে এই আত্মহত্যা বা আত্মহত্যাকে দেখার ধরণ আমাদের চোখে স্পষ্ট করে দেয় সেই সময়ে নারীদের মূল্যবোধ, পাপবোধ ও ধর্মীয় বোধের সঙ্গে কিভাবে তাদের আত্মহনন ও আত্মাহুতিকে মিলিয়ে দিয়েছিল সমাজ।

৩.৬.৩.২ *মিবাররাজ* : অনুশোচনা ও আত্মহত্যা

যথাক্রমে ১৮৮৭ ও ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রচিত *মিবাররাজ* ও *বিদ্রোহ* উপন্যাসে ভীলদের কাহিনি প্রধান হয়ে উঠেছে। মিবাররাজ-এ রাজপুতদের জৌহর প্রথার অনুকরণে একটি আত্মাহুতির বিবরণ পাই, তাতারদের আক্রমণে বীরনগরের শিলাদিত্যের মৃত্যুর পর সেই দেশের মহিষীগণ অগ্নিপ্রবেশ করে। সেই পদ্মাবতী কাহিনির অনুকরণ আবারও ঠাঁই পায় উপন্যাসে। অন্যদিকে ভীল রাজপুত্র তালগাছ ও রাজপুত গুহাদিত্যের তীরযুদ্ধের মধ্যে ভুলক্রমে তালগাছের তীরে তার পিতা অর্থাৎ ভীল রাজ মন্দালিকে মৃত্যু হয়। মন্দালিকের মৃতদেহ দেখার পর তালগাছ নিজের তীরটি দেখতে পায় – "সে তাহারই তীর – আপনার হাতে আপনার পিতাকে সত্যই সে বধ করিয়াছে। আর সে পারিল না - ...

অনন্ত যাতনাভরে সে মন্দালিককে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অনন্ত যাতনায় উন্মাদ হইয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল, কিছুদূর গিয়া পাহাড়-শিখর হইতে নিম্নে ঝাঁপাইয়া পড়িল"[xxxvii]

পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত এবং নিজেকেই পিতৃহন্তারক বলে চিহ্নিত কতে পেরে প্রবল পাপবোধে আক্রান্ত তালগাছের আত্মহত্যাকে অয়দিপাউসের পিতৃহত্যা ও পরে আত্মহত্যার মোটিফের পুনর্গঠন বলে ভাবা যেতেই পারে।

৩.৬.৩.৩ *বিদ্রোহ* : অপরাধবোধ ও আত্মাহুতি

এই উপন্যাসে প্রাণপ্রিয় বন্ধু রাজা নাগাদিত্য ও তার রাণীকে বর্শাদ্বারা হত্যা করার পর ভীল জুমিয়া শোকার্ত হয়ে বলে – "যে বর্শা তোরে বিঁধলু সেই বর্শা মুইয়েরই ক্ষমা করবে।"[xxxviii]

কিন্তু রাজা তার শিশুপুত্র বাপ্যাদিত্যকে রক্ষা করার অনুরোধ জানালে জুমিয়া রাজপ্রাসাদে গিয়ে ভীলদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় এবং বাণাঘাতে তার মৃত্যু হয়। রাজা-রানীর পুত্রের রক্ষার জন্য অর্থাৎ পরোপকারার্থে যুদ্ধে গমন ও আত্মদানে জুমিয়া চরিত্রটি যেন প্রতাপের উত্তরসূরী হয়ে ওঠে।

৩.৬.৪ দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩ – ১৯০৭)

দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা-র পরিণতি নিয়ে লিখলেন মৃন্ময়ী এবং আয়েষার গল্পকে নতুন করে সম্পূর্ণ করলেন তাঁর নবাব নন্দিনী বা আয়েষা-তে। অর্থাৎ বঙ্কিমের অনুসরণ দামোদর মুখোপাধ্যায়ের রচনার অনেকটা জুড়েই ছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমাদের আলোচিত উপন্যাসগুলিতেও দেখব কোথাও কোথাও আত্মহত্যার কারণ, ধরন সবেতেই বঙ্কিমের কী অনিবার্য প্রভাব।

৩.৬.৪.১ বিমলা : নিষ্কৃতির অবৈধ উপায়?

বিমলা (১৮৭৭) উপন্যাসে যোগেশ ও বিমলার প্রেম উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু। একদিকে জমিদার বরদাকান্ত তার পুত্র রুদ্রকান্তের সঙ্গে বিমলার বিবাহ দিতে চায়। তাতে যখন বিমলা অসম্মতি প্রকাশ করে তখন বরদাকান্ত বিমলাকে কৌশলে বন্দী করে এবং বৃদ্ধ মামাঠাকুর রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে বিবাহের আয়োজন করে। অবশেষে সপ্তম পরিচ্ছেদে বিবাহ রাত্রি উপস্থিত জেনে – "বিমলা আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ... পিঁড়ি উত্তোলন করিয়া বিষম শক্তি সহকারে স্বীয় মস্তকে আঘাত করিলেন।"[xxxix]

বিমলার এই আত্মহত্যা সফল হয়নি এবং যোগেশ বিবাহের পূর্বেই বিমলাকে তার বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করে যোগেশ ও বিমলা মিলনের পর দশম পরিচ্ছেদে উভয়ের কথোপকথন থেকে এই আত্মহত্যার বিষয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য উত্তর খুঁজে পাই। যোগেশ বিমলাকে প্রশ্ন করে– "বিমলা! তুমি কি ঘোর অবৈধ উপায়ে বিপন্মুক্তির পথ করিয়াছিলে।"[xl]

অর্থাৎ আত্মহত্যার মত ঘটনা যে অবৈধ বা পাপ তা এই সমাজমানসে প্রচলিত ছিল। বিমলার কাছে এই আত্মহত্যা ছিল বিপদ থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। সুতরাং পার্থিব কার্য-কারণযুক্ত এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা পূর্ব কাহিনি বা ভাবনারই অনুসারী।

৩.৬.৪.২ *দুই ভগ্নী:* আত্মহত্যায় বঙ্কিম অনুসরণ

দুই ভগ্নী (১৮৮১) উপন্যাসে কমলিনী চরিত্র কল্পনায় বঙ্কিমের রোহিণী চরিত্রের প্রভাব লক্ষণীয়। বিধবা কমলিনী নিজ ভগ্নী বিনোদিনী ও তা স্বামী যোগেন্দ্রকে ক্রমাগত উভয়ের বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে। যোগেন্দ্রের মনে বিনোদিনীর চারিত্রিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে এবং সে বিনীদিনীর সঙ্গে সংসর্গ ত্যাগ করে। স্বামীর

অন্য নারীর প্রতি আসক্তির কথা জেনেও বিনোদিনী মৃত্যুর আগে যোগেন্দ্রকে ভালো করে দেখা ও তার কথা শোনার আশা করে। এদিকে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় অস্থির যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ রূপে নিজ মৃত্যুভাবনাকে মনে ঠাঁই দেয় ও তীক্ষ্ণ ছুরি নিজের বুকে স্থাপন করে। – এই আত্মহত্যার উদ্যোগ কমলিনীর জন্যই সফল হয় না। কিন্তু অবিকল কুন্দর আত্মহত্যার অনুসরণে বিনোদিনীর আত্মহত্যা ঘটান লেখক ষোড়শ পরিচ্ছেদে। কুন্দকে হীরা বিষ দিয়েছিলেন নিজে ঈর্ষার কারণে – এখানে মাধি পরিচারিকা কমলিনী ঈর্ষার প্রতিশোধ নিতে বিনোদিনীর সামনে চাটুজ্যেদের মেজো বউয়ের বিষ খেয়ে মৃত্যুর কাহিনি শোনায়। চাড়ালদের থেকে বিষ এনে দেওয়ার সম্ভাবনার কথাও বলে। অবশেষে বিনোদিনী অনুরোধে তাকে বিষ এনে দেয় ও উপহারস্বরূপ অলঙ্কার লাভ করে। মৃত্যুর পুর্বে বিনোদিনীর স্বামী অদর্শনের ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ পায় তার বক্তব্যে – “জগদীশ! এ ক্ষুদ্র প্রদীপ আমি স্বেচ্ছায় নিবাইতেছি – ইহাতে কাহারও দোষ নাই ... কিন্তু তোমার অদর্শনেও কি বিনোদিনী বাঁচিয়া থাকিবে? কি দায়? কেন?”[xli]

এই আত্মহত্যা Egoistic Suicide–এর চরম রূপ যেখানে নিজে অধিকারবোধ আহত হওয়ায় মৃত্যুকে ডেকে আনে বিনোদিনী। এই উপন্যাসে পাপের পরিণাম রূপে মাধি পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করে কারণ আর কৃত সকল অপরাধ সকলের সম্মুখে ফাঁস হয়ে যায় এবং বিনোদিনীর মৃত্যুর পর তার শীতল ঠোঁট চুম্বন করে মৃত্যুমুখে ঢলে পরে যোগেনও। রামদুলাল বসুর সঙ্গে একমত হয়েই বলতে হয় –

“যোগেন্দ্রের মৃত্যু অনেকটা নাটকীয়। এ যেন রোমিওর মৃত্যু। জুলিয়েট-রূপিনী বিনোদিনীর বিষাক্ত অধরে অধর সংযোগ জনিত মৃত্যু।”[xlii]

এইভাবেই এই উপন্যাসে অভিমান, পাপ, প্রায়শ্চিত্তের কারণে নানারূপ আত্মহত্যার বর্ণনা পাই।

৩.৬.৪.৩ *মা ও মেয়ে* : প্রেমহীনতা

মা ও মেয়ে (১৮৮৪) উপন্যাসে স্বামীর মৃত্যুর পর সুলোচনা আত্মহত্যার প্রবণতার কথা বলা হয়েছে বারবার। "সুলোচনার চিত্তের যে আকুলতা তাহা অপরিমেয়... যে যন্ত্রণার একই ঔষধ, সে ঔষধ মৃত্যু। সুলোচনা মৃত্যুর সুশীতল ক্রোড়ে শান্তি পাইবেন বলিয়া আশা করিয়া আছেন, কিন্তু মৃত্যুরও মহৎ ব্যাঘাত রহিয়াছে। সে ব্যাঘাত শরৎকুমারী।"[xliii]

অর্থাৎ এক্ষেত্রে আত্মহত্যার বাধাস্বরূপ সন্তানের প্রতি তীব্র বাৎসল্যের কথা বলা হয়েছে। আর তাই-ই হয়তো শরৎকুমারীর অসুখের সময় সুলোচনার মনে হয়েছে যদি শরৎকুমারীর খারাপ কিছু হয় তখন আত্মহত্যা দ্বারাই সে সকল যন্ত্রণার শান্তি ঘটাবে। এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা বা ভাবনার পাশাপাশি উপন্যাসের ষষ্ঠ খণ্ড প্রথম পরিচ্ছেদে পাই রামশরণ ডাক্তারের প্রণয়িণী কামিনীর আত্মহত্যার কথা। রামচরণ সুলোচনাকে হত্যা করে নিজ কলঙ্ক মুছতে চেয়েছিল কিন্তু বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা কামিনী রামচরণের এই কলঙ্কমোচনের উপায়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রামচরণকে হত্যা করে অথচ পরমুহূর্তেই–

"""রামচরণ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়দেবতা। ভাবিও না তোমার এই চরণাশ্রিতা দাসী সুখে থাকিবে। দাসী তোমার চরণ ভিন্ন জানে না। ইহজগতে তোমার চরণে স্থান পাইবার আশা নাই দেখিয়া সে আজি এই উপায় অবলম্বন করিয়াছে। তোমার চরণাশ্রিতা দাসীও তোমার চরণছায়ার অনুবর্ত্তিনী হইল।" – এই বলিয়া কামিনী সেই শোণিতাক্ত ছুরিকা স্বীয়

বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল এবং হাসিতে হাসিতে রামচরণের দেখের উপর পড়িয়া গেল।”[xliv]

রামচরণের পাপ কার্যে বাধা দিতে তাকে হত্যা করলেও তার প্রতি যে প্রেম তা কামিনীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। রামচরণের এতদিনের কু-আচরণ, অপমান ভুলে আজ তাকেই ‘প্রাণেশ্বর’ বলে স্বীকৃতি দিয়ে কামিনী জানিয়েছে যে তার কাছে প্রেমহীন এই জীবন গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই প্রিয়তম পুরুষটির পাপ কাজের সহায়ক না হয়ে – কামিনী এই চরিত্রটি নিজের বর্ণে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। উপন্যাসটি পুণ্যের জয় এবং পাপের পতনের জয়গানকারী সামাজিক উপন্যাস হিসেবে থেকে যায়।

৩.৬.৫ মীর মশররফ হোসেন

৩.৬.৫.১ *বিষাদ সিন্ধু* : ধর্মরক্ষার খাতিরে আত্মহনন

মীর মশররফ হোসেনের *বিষাদ সিন্ধু*-র প্রকাশকাল মূলত ১৮৮৭ থেকে ১৮৯১। এই গ্রন্থ কারো মতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ, আবার কারো মতে ধর্মীয় গ্রন্থ। মুসলিম ধর্মে আত্মহত্যা পাপ একথা আমরা আমাদের আলোচনার শুরুতেই বলেছিলাম। তবে এ গ্রন্থে দেখা যায় যে বেশ কিছু ধর্মীয় ক্ষেত্রে আত্মহত্যা বা বলা যায় আত্মাহুতি যে চরম গৌরবের তা প্রকাশ পেয়েছে। এই আত্মহত্যার পেছনে একদিকে যেমন ছিল ধর্মীয় প্রভাব, তেমনই আরেকটি কারণ হল শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ‘মহরম’ পর্বের একাদশ প্রবাহে একটি পঙক্তির দিকে নজর দিই –

“বিধর্মীর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেই শহীদ (ধর্মযুদ্ধে শোণিত পাতে প্রাণত্যাগ মুক্ত) হইব, স্বর্গের দ্বার শহীদদিগের নিমিত্ত সর্বদাই খোলা রহিয়াছে .... ইহা মুসলমান মাত্রেরই অন্তরে জাগিতেছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জাগিবে।”[xlv]

সুতরাং আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য যে এই উপন্যাসে প্রধান স্থান করে নেবে তা আর বলার অবকাশ রাখে না।

গ্রন্থের ‘উদ্ধার’ পর্বের প্রথম প্রবাহে যুদ্ধ পরবর্তী ছবির পরিচয় আছে। হোসেনের মৃত্যুর পর মীরওয়ান সহ অন্যান্য কাফের যোদ্ধাগণ হোসেন শিবিরে প্রবেশ করে। আবদুল ওহাদের খণ্ডিত দেহ ও কাসেমের মৃত্যুশয্যায় তার পাশে ছিল মৃতপ্রায় সখিনা, মীরওয়ান তাকে স্পর্শে উদ্যত হলে জেগে ওঠে সখিনা। কাসেমের খঞ্জর হাতে নিয়ে সে বলে – ““এই দেখ – যার প্রাণ তার নিকটে, যেখানে কাসেম, সেইখানে সখিনা – রক্তমাখা সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর – কাসেমের হস্তের খড়্গ”– এই বলিয়া হস্তস্থিত খঞ্জর সুকোমল বক্ষে সজোরে বসাইয়া পৃষ্ঠ পার করিয়া দিলেন।”[xlvi]

এই আত্মত্যাগ কিন্তু স্বামী বিয়োগে অধীরা হয়ে দুঃখভার কমানোর জন্য আত্মহত্যা নয়, বরং কাফেরের স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সতীত্ব ধন রক্ষার আশাতেই সখিনা আত্মাহুতি দিয়েছে। ধর্মভেদে সতীত্বের জন্য তথা সতীত্ব রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের ঘটনা বোধহয় বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক প্রচলিত আত্মহত্যার নিদর্শন।

উদ্ধার পর্বের দ্বিতীয় প্রবাহে অপর এক আশ্চর্য আত্মত্যাগের কাহিনি পাওয়া যায়। সীমার হোসেনের মস্তক বর্শায় নিয়ে ফেরার সময় আজরের গৃহে রাত্রিযাপন করে। এসময় আজর হোসেনের মুণ্ডুটি গ্রহণ করে। সীমার খণ্ডিত মস্তক পেলেই চলে যাবে এরূপ দাবী

করায় বারংবার আজরের জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র আপন মস্তক ছেদ করে। অবশেষে আজরের স্ত্রীও হোসেনের মস্তক রক্ষার্থে খড়্গাঘাতে আত্মবিসর্জন করে।

এভাবেই সমগ্র গ্রন্থে ধর্মরক্ষার খাতিরে আত্মত্যাগের কথা এসেছে। তবে এগুলিকে আমরা Altruistic Suicide বলব। আত্মহত্যার প্রাচীনতম নিদর্শন এই ধর্মরক্ষা তথা আদর্শরক্ষার তাগিদে আত্মাহুতি।

৩.৬.৬ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮)

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের *শক্তিকানন* (১৮৮৭) ও *ফুলজানি* (১৮৯৪) উপন্যাসদুটিতে আমরা আত্মহননের যে ধরণ দেখব পূর্বের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস থেকে সেভাবে অন্যরকম বলে চিহ্নিত করা যায় না।

৩.৬.৬.১ *শক্তিকানন* : স্নেহের পরিণতি ও প্রায়শ্চিত্ত

শক্তিকানন-এ গৃহস্থের বাড়ি থেকে প্রভাকে চুরি করে নিয়ে যায় নাপিত বউ বা বিধুমণি। পরবর্তীতে প্রভার প্রতি তার ভালোবাসা তৈরি হয়। বিধুমণির ভ্রাতা উদ্ধব কাপালিক বিধুমণিকে হত্যার আগে প্রভার ধর্ম নষ্ট করতে চাইলে উন্মাদিনী নাপিত বৌ ছুটে গিয়ে তরবারি দিয়ে নিরপরাধিনী স্নেহের বালিকা প্রভাকে দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা করে। এরপর – "তখন উন্মাদিনী সেই শোণিতসিক্ত তরবারি আপন হৃদয়ে বসাইয়া দিয়ে সে স্নেহময় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।"[xlvii]

অন্যদিকে যুবা ভৈরব সেই তরবারি দিয়ে উদ্ধব কাপালিককে হত্যা করে এবং প্রভার প্রতি প্রণয়াসক্ত যুবা ভৈরব প্রভার মৃতদেহ বুকে তুলে নেয়। এমন অবস্থায় মৃতপ্রায় উদ্ধব তাকে জানায় যে এই প্রভা তার গুরুকন্যা এবং তাকে স্পর্শ করে তার দেহ সে

অপবিত্র করেছে। এ কথা শোনার পর – ভৈরব ধীরে ধীরে সে স্বর্ণপ্রতিমাকে বক্ষচ্যুত করিল। ধীরে ধীরে তরবারি কুড়াইয়া লইয়া স্বহস্তে আপন বক্ষে বসাইয়া দিল। ... পরবর্তী সময়ে তার গুরুদেব জগদীশ এলে তার উদ্দেশ্যে ভৈরব বলে – "গুরুদেব – গুরুকন্যার রূপে মোহিত হইয়া ছিলাম – তাই স্বহস্তে তার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেলাম।"[xlviii]

সুতরাং এই উপন্যাসে বিধুমণি তথা নাপিত বৌ স্নেহরূপ পাপের কারণে আত্মহত্যা করে অন্যদিকে যুবা ভৈরব প্রণয় তথা রূপমুগ্ধতাজনিত পাপে প্রায়শ্চিত্ত রূপে আত্মহত্যা করে। ধর্মীয় তথা সামাজিক কারণে এই আত্মহত্যা Durkheim বর্ণিত Egoistic Suicide।

৩.৬.৬.২ *ফুলজানি* : চিতারোহণ ও ধর্মরক্ষা – নারীর আত্মহত্যার প্রাচীনতম অনুষঙ্গ

ফুলজানি (১৮৯৪) উপন্যাসে আবার আমরা একটি সহমরণের দৃশ্য দেখতে পাব। নৌকায় ডাকাতে গুলিতে দেওয়ান মহেশ্বর ঘোষের মৃত্যু হলে তার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী সহমরণের সিদ্ধান্ত নেয়। "কারণ – হিন্দুর মেয়ের কাছে বৈধব্যের বাড়া আর গালি নাই।"[xlix]

উপন্যাসের 'একোনষষ্ঠিতম' পরিচ্ছেদে মতি বিবি, কালী ও ফুলকুমারীকে মিথ্যা বাক্যে ভুলিয়ে নবাবের হারেমে নিয়ে যেতে চাইলে কালী গঙ্গবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে আত্মত্যাগ করে ধর্ম তথা সতীত্ব রক্ষার জন্য।

'অষ্টষষ্ঠিতম' পরিচ্ছেদে মুর্শিদাবাদে নবাবের পুরীতে বন্দিনী ফুলের কাছে পৌঁছায় পুরন্দর। সেখানে পৌঁছে পুরন্দর বলে –" ...বাহির হতে না পারি, দুজনে একত্রে দাঁড়াইয়া মরিব। কি ছার জীবন একটি বিষে, ছুরির একটু আঘাতে যা শেষ হয়, তার জন্য ভয়ই কি আর ভাবনাই বা কি!"[l]

কিন্তু পরবর্তীতে জানা যায় পুরন্দর আসলে ফুলের আত্মহত্যার উদ্দেশ্যেই বিষমোড়ক এনেছিল। এ প্রসঙ্গে তার উক্তিটিতে প্রমানিত হয় সতীত্ব তথা ধর্মরক্ষার জন্য আত্মহত্যা আসলে পুণ্য বলেই স্বীকৃত – ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাবে পৌঁছেও। " - তোমার জন্যই এনেছি... আশীর্ব্বাদ করি, মরতে তোমার দেরি মাত্র না হয়। এ আত্মহত্যা পুণ্য..."[li] আঠার শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গ দেশের পটভূমিতে লেখক সামাজিক ও ঐতিহাসিক কাহিনির মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন ফুলকুমারীর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে।

"ইন্দ্রিয়পরায়ণ সিরাজের লালসার অগ্নিবৃন্তে ফুলজানিকে সমর্পণ করে লেখক তাকে সতীত্বের পরীক্ষায় সম্মুখীন করেছেন এবং স্বামী পুরন্দর প্রদত্ত বিষ গ্রহণে আত্মহত্যার ভিত্তিতে সতীত্বের পরীক্ষায় ফুলজানিকে জয়ী করেছেন।"[lii]

অবশেষে কাহিনির একেবারে শেষে নবাব পুরীতে আগমনের দোষে পুরন্দরের কোতল হলে তার দেহ সম্মুখে বিষপান করে স্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়ে ফুলকুমারী।

এভাবেই শ্রীশচন্দ্রের উপন্যাসে সামাজিক ন্যায়-অন্যায়, সতীত্ব রক্ষা প্রভৃতি আদর্শবাদ ঘুরেফিরে এসেছে। পুরন্দরের মাতা চিতারোহণ করে সতী হয়েছেন, অন্যদিকে পুরন্দর সতীত্ব রক্ষার তাগিদে স্ত্রীর হাতে বিষের মোড়ক তুলে দিয়েছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে আমরা আত্মহত্যা খুঁজতে গিয়ে দেখেছি Egoistic Suicide এবং মূলত Altruistic Suicide–এর আধিক্য। আত্মাহুতি – তা সে প্রেমের কারণে হোক বা ধর্ম, আদর্শ রক্ষার জন্য, এটিই বাংলা সাহিত্যে আত্মজাদের প্রধান ধারা। তাছাড়া প্রেমের অপ্রাপ্তি, পাপবোধ, মূল্যবোধের থেকে Egoistic Suicide-ও বেশ কিছু পাই।

৩.৬.৭ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৩.৬.৭.১ *তমস্বিনী* : প্রেমের স্বপ্নভঙ্গ

বিশ শতকের শুরুতেই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত *তমস্বিনী* (১৯০১)-তে স্বর্ণলতার আত্মহনন। স্বর্ণ ও হেমন্তের প্রেম স্বর্ণর মামার আপত্তিতে পরিণতি পায় না। কান্তিচন্দ্রের সঙ্গে বিয়ের পরেও স্বর্ণ ও হেমন্তের যোগাযোগ থেকে যায়। অবশেষে একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে এসে স্বর্ণ-হেমন্ত একত্রে দিনযাপন শুরু করে। কিন্তু সমাজ-বিচ্ছিন্ন হেমন্তের মনে স্বর্ণের প্রতি প্রেম ক্রমশ কমে এসে ঘৃণা ঠাঁই করে নেয়। ক্রমশ তা বুঝতে পেরে স্বর্ণময়ী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এর আগেও একদিন সে জলের ধারে আত্মহত্যা করতে গেছিল সেদিন হেমন্ত তাকে বুকে তুলে টেনে নিয়েছিল কিন্তু আজ তার সে প্রেম নেই, তাই "স্বর্ণময়ীর আর কোন সাধ মিটিল না, মিটিল কেবল সেই প্রথম জাগ্রত জীবনের সাধ – সরোবরের শীতল জলতলে শয়ন।"[liii]

যে প্রেম ছিল কল্পনায় যে প্রেমে ছিল সমস্ত দুঃখ কষ্টের উপশম সেই প্রেমকে ভেঙে যেতে দেখে স্বর্ণের এই আত্মহনন আসলে স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। স্বর্ণের আর কোন সাধ অবশিষ্ট থাকে না তাই তার মৃত্যুতে তার প্রেমের ভাঙন রুখতে চায় সে।

এভাবেই উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র ও তার সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে নানাভাবে আত্মহত্যার অনুষঙ্গ আসে। যদিও বেশির ভাগ সময়েই আত্মহত্যা করে নারীরা। জহর ব্রত, চিতারোহন, অগ্নিতে ঝাঁপ – এই ধরণের কাহিনি বারবার লিখিত হয়, পাশাপাশি থাকে – প্রেমের অপ্রাপ্তি বা পরাজয়জনিত আত্মহত্যা। আত্মশুদ্ধি বা প্রায়শ্চিত্তের খাতিরে বা পাপে পরিনামে মৃত্যুবরণও ঐ সময়ের একটি প্রচলিত মোটিফ।

অভিমান বা প্রেমে অবিশ্বাসও আত্মহত্যার কারণরূপে বর্ণিত হয়েছে। তবে এসকল আত্মহত্যার আধার মূলত মেয়েরাই। আগেই বলেছি পুরুষের আত্মহত্যা মূলত ধর্ম, আদর্শ কিংবা পৌরুষ রক্ষার খাতিরে এবং এই পুরুষের আত্মত্যাগের ঘটনা খুব বেশি পাওয়া যায় না।

তবে আমরা আত্মহত্যা খুঁজতে গিয়ে যেগুলোকে খুঁজে পেলাম তাতে পাঠকের মনে অস্বস্তি উৎপাদক তেমন কিছুই ছিল না। কারণ প্রেমে, দুঃখে, অভিমানে, জিঘাংসায়, অপ্রাপ্তিতে যে আত্মহত্যা তা আমাদের মনে খানিকটা সহানুভূতি তৈরি করে। আর দেশ, ধর্ম, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ তো শুধু সহানুভূতি নয় বরং গর্ববোধও তৈরি করে। কিন্তু আমরা এবার খুঁজব সেই আত্মহত্যাকে যাকে কার্য-কারণ ব্যাখ্যা দিয়ে বর্ণনা করা যাবে না কিংবা যেখানে – আত্মহত্যার জন্যই আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটবে। বঙ্কিম বা বঙ্কিম পরবর্তী এই ঔপন্যাসিকেরা সেই আত্মহত্যার ছবি আঁকেননি – হয়ত আঁকা সম্ভব ছিল না। সেই আত্মহত্যাকেই আমরা বলব আধুনিক সময়ের আত্মহত্যা। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব আত্মহত্যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা ব্যক্তিতা যুক্ত হচ্ছে কখন এবং আধুনিকতা পরবর্তী বিচ্ছিন্নতা কিভাবে আত্মহত্যার ভাবনাকে প্রভাবিত করছে তাও দেখব।

তথ্যসূত্র

---

[i] Thakur Upendra - *The History of Suicide In India, An Introduction*, MUNSI RAM MANOHAR LAL, Oriental Publishers and Booksellers, Nai Sarak, Delhi, P– 52 (Aranyo, Chap. IX)

[ii] Ibid, P- 55

[iii] Ibid, P- 60, (Rajatarangini, VII, 481)

[iv] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র – *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮৩

[v] তদেব

[vi] গুপ্ত, ক্ষেত্র - *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ সংস্করণ, গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বিটুয়া টোলা লেন, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৩১

[vii] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র – *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩৬

[viii] তদেব, পৃ. ২৭২

[ix] তদেব, পৃ. ৩৭৪

[x] তদেব, পৃ. ৪০৯

[xi] তদেব, পৃ. ৪২৩

[xii] গুপ্ত, ক্ষেত্র - *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ সংস্করণ, গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বিটুয়া টোলা লেন, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৯৩

[xiii] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র – *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৪৩

[xiv] তদেব, পৃ. ৭১৮

[xv] তদেব

[xvi] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র – “*আত্মহত্যার অধিকার*”, দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ৩/৫২, বিজয়গড়, কোলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫২

[xvii] রায়, সত্যেন্দ্রনাথ – *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৮৮

[xviii] চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র – *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৯

[xix] তদেব, পৃ. ১৩৬

[xx] দত্ত, রমেশচন্দ্র – *রমেশ রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র),* বসু, কাঞ্চন (সম্পা.), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৭৪-৭৫

[xxi] তদেব, পৃ. ৭৬

[xxii] বসু, রামদুলাল – *বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ*, চলন্তিকা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ৯৭

[xxiii] দত্ত, রমেশচন্দ্র – *রমেশ রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র),* বসু, কাঞ্চন (সম্পা.), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১২৮

[xxiv] গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪০

[xxv] বসু, রামদুলাল – বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ, চলন্তিকা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১০৪

[xxvi] গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড),* গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৮

[xxvii] দত্ত, রমেশচন্দ্র – *রমেশ রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র),* বসু, কাঞ্চন (সম্পা.), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২১৭

[xxviii] তদেব, পৃ. ২৬৪

[xxix] গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড),* গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৫৫

[xxx] দত্ত, রমেশচন্দ্র – *রমেশ রচনাবলী* (উপন্যাস সমগ্র), বসু, কাঞ্চন (সম্পা.), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ২৬৫

[xxxi] তদেব

[xxxii] তদেব

[xxxiii] গঙ্গোপাধ্যায়, তারকনাথ – *হরিষে বিষাদ অথবা নায়ক-নায়িকা শূন্য উপন্যাস* (দ্বিতীয় সংস্করণ), শ্রী শরৎকুমার লাহিড়ী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩০৪, পৃ. ৩১৭

[xxxiv] দেবী, স্বর্ণকুমারী – *স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস সমগ্র* (২য় খণ্ড), মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সঙ্কলন, সম্পাদন, ভূমিকা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৭৩৪

[xxxv] তদেব, পৃ. ৭৩৫

[xxxvi] তদেব

[xxxvii] দেবী, স্বর্ণকুমারী – *স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস সমগ্র* (১ম খণ্ড), মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সঙ্কলন, সম্পাদন, ভূমিকা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৩২০

[xxxviii] তদেব, (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৫৪১

[xxxix] মুখোপাধ্যায়, দামোদর – *দামোদর গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), হিতবাদীর ইলেকট্রিক যন্ত্রে শ্রী অন্নদাচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩১২, পৃ. ৯৮৯

[xl] তদেব, পৃ. ৯৯৭

[xli] তদেব, পৃ. ১৫১]

[xlii] বসু, রামদুলাল – *বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ*, চলন্তিকা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ১৭৩

[xliii] মুখোপাধ্যায়, দামোদর – *দামোদর গ্রন্থাবলী* (প্রথম খণ্ড), হিতবাদীর ইলেকট্রিক যন্ত্রে শ্রী অন্নদাচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩১২, পৃ. ২৩

[xliv] তদেব, পৃ. ৮৯

[xlv] হোসেন, মীর মশররফ – *বিষাদ সিন্ধু*, আল আমান, আবদুল আজিজ (সংকলন ও সম্পাদনা), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০, পৃ.৩৮

[xlvi] তদেব, পৃ. ১৪০

[xlvii] মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, *শক্তি-কানন*, শ্রী শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার দ্বারা ৩১ সাঁকারিটোলা হইতে প্রকাশিত, ১৮০৯ শক, পৃ. ১৯৪-১৯৫

[xlviii] তদেব, পৃ. ১৯৭-১৯৮

[xlix] মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, *ফুলজানি*, শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, ১৩০০, পৃ. ১০৯

[l] তদেব, পৃ. ১৫৯

[li] তদেব

[lii] বসু, রামদুলাল – *বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ*, চলন্তিকা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ২৯৮

[liii] গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ – *নগেন্দ্র গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), ??, পৃ. ৭১

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ শতকের উপন্যাসে আত্মহত্যা: আধুনিক মানুষের সংকট

বিশ শতকের চরিত্র উনিশ শতকের থেকে অনেকটাই আলাদা। মধ্যবিত্তের মধ্যে যে বাবু-বিলাস তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকে তার বদলে ব্যক্তি আমি-র অস্তিত্ব নিয়ে সচেতন হয়ে পড়ল মানুষ, মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনের পথ পেরিয়ে একদিকে ভারত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানাচ্ছে, অন্যদিকে ভারতের বাইরে চলছে রুশ-জাপান যুদ্ধ(১৯০৪ – ০৫), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আছড়ে পড়ছে ইউরোপের মাটিতে। সামাজিক নানা ফাটলের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্যে 'ভারত ছাড়ো' ডাক উঠল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তখন এক টালমাটাল অবস্থা। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করতে বাধ্য হয় ভারতবাসীরাও। যাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ভারতবর্ষ। আর্থিক সমস্যারও সম্মুখিন হয় দেশ, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরে সমগ্র বাংলা যেন ক্ষতবিক্ষত হয়। উনিশশো পাঁচে বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতবাসী বিভেদের রাজনীতিকে সাময়িকভাবে রুখে দিতে পারলেও ভেতরে ভেতরে যে ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল তা অস্বীকার করার আর কোন অবকাশ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় বারবার এই সমস্যার প্রতি অঙ্গুলিপাত করেছেন। উনিশশো একত্রিশ সালে 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশ আসলে জতুগৃহ যাতে কেউ আগুন লাগাতে চাইলে সময় লাগবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর অমোঘ উক্তিকে সত্য প্রমাণিত করেই, বাংলা, দেশভাগের ঠিক পূর্বে যে ভয়াবহ দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করল, তা বাঙালির জীবনে চিরস্থায়ী কালিমা এঁকে দিল। ব্রিটিশ সম্রাজ্য শেষ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হলেও তা যে খুব আশার বাণী বয়ে আনবে এমন সম্ভাবনা কম ছিল। দেশভাগ কেন হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক আজও বিদ্যমান। দেশভাগের

ফলে দুই দিকের মানুষের উপর দিয়েই ঝড় বয়ে গেছে। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা তাই পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্থানের উপর বয়ে এনেছিল দাঙ্গা, আশাভঙ্গ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। শিকড় হারিয়ে ফেলা মানুষ রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর সমস্ত আস্থা হারিয়েছে। দেশের আর্থিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস মানুষের মননকে প্রভাবিত করেছে। বিদেশী শাসক নিঃশেষিত করেছে তাদের শোষণ, শাসন ও সবশেষে বিভাজনের মধ্যে দিয়ে। উনিশ শতকে যে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল তা স্বদেশি আন্দোলনের সময় অবধি মানুষের মনে প্রভাব তৈরি করেছিল। পাশাপাশি বাঙালিত্বের ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে কখনো কখনো । কিন্তু ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে মিলন-মন্দির নির্মাণের প্রয়াস হয়েছিল তা আসলে বাস্তবায়িত হয় নি কোনদিনই। বিভেদের যে বীজ সেদিন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তারই ফলস্বরূপ দেশভাগের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে এল স্বাধীনতা। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যাকে সঠিকভাবে সমাধান করতে অসক্ষম হয়। বাইরের ঘটনাবলীর প্রভাব পড়ল সমাজ মানসে। উনিশ শতকের ভাবালুতা, বিশ্বাস, ব্যক্তিত্বের বিকাশের পরিবর্তে বিশ শতকের বাস্তবতা ও আত্মজিজ্ঞাসার জন্ম হল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে যে আদর্শায়ন ঘটিয়েছিলেন তার পরিবর্তে বাস্তবতা স্থান পেল এই যুগের উপন্যাসে। মনোদর্শন খুব বড় হয়ে উঠল, 'আঁতের কথা' বলতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথও। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক টালমাটাল অবস্থায় বাংলা সাহিত্য নানাভাবে প্রভাবিত হয়। একদিকে যেমন সরাসরি এই ঘটনাবলী, আন্দোলন,যন্ত্রণা বা ব্যর্থতার কাহিনী ঠাঁই পেল সাহিত্যে তেমন সমাজ নির্ণীত এক মনন নিয়ে লিখতে বসলেন একদল ঔপন্যাসিক। বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক মতামত নিয়ে ক্রমাগত লিখে চলেছেন রবীন্দ্রনাথ। পাশাপাশি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখছেন তিনি এইসময়ে।

৪.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

জীবনে বহুবার মৃত্যুশোকের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। কিন্তু চব্বিশ বছর বয়সে যে মৃত্যুশোকের সঙ্গে পরিচিত হন তিনি তা তাঁর জীবনে চিরস্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। এ প্রসঙ্গে *জীবনস্মৃতি- তে তিনি বলছেন,* -

"এমনসময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল।...সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না , এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া!" [i]

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে *জীবনস্মৃতি* -তে আরো দুটি ঘটনার উল্লেখ করেন তিনি। গুণদাদার কাছে ক্লাইভের আত্মহত্যার কাহিনী শুনে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি ছেলেবেলায়। এছাড়াও এসেছে অক্ষয়বাবুর থেকে শোনা ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের আত্মহত্যার প্রসঙ্গ। ক্লাইভের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক অতি জরুরি প্রশ্নের অবতারণা করেন, - "এক দিকে ভারতবর্ষের নব ইতিহাস তো গড়িয়া উঠিল কিন্তু আর এক দিকে মানুষের হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যে এ কী বেদনার রহস্য প্রচ্ছন্ন ছিল। বাহিরে যখন এমন সফলতা অন্তরে তখন এত নিস্ফলতা কেমন করিয়া থাকে।"[ii] আত্মহত্যার পেছনে তিনি গোপন বেদনার রহস্যকে খুঁজেছেন। সফল মানুষের অকারণ আত্মহত্যার যে আধুনিকতা তা কি চোখে পড়ে নি তাঁর? আমরা খুঁজে দেখব তা।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মহত্যার অধিকার প্রবন্ধে বলেন –

“অন্য প্রায় সব কিছুর মতো রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম এই অনিয়মের দিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন আমাদের। ...আত্মহত্যা হানা দিচ্ছে – ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্রকে আকর্ষণ করেছিলো; কিন্তু সাহিত্যসম্রাটের কল্পলোকে তখন বিষাদের স্থান থাকলেও অকারণ কোনো কর্মের স্থান ছিলো না – কেননা কালপ্রভাবেই তখন যুক্তির ও ‘প্রতিপন্ন নিয়মের গানে’ সারস্বত সমাজের কিন্নরকণ্ঠ মুখর হয়েছিলো। অকারণ আত্মহত্যা নামক ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথই প্রথম ঘটালেন..”[iii]

বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁর পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে আত্মহত্যার ছড়াছড়ি থাকলেও তা পার্থিব কার্য-কারণ সম্বন্ধে বাঁধা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা এক নিঃসঙ্গতার বাণী বয়ে এনেছিল ঠিকই কিন্তু হতাশা, অপ্রাপ্তি, যন্ত্রণা, প্রেমহীনতা, মূল্যবোধ – এইসব বুদ্ধিগ্রাহ্য ও চিরাচরিত আত্মহত্যার অনুসরণ ছিল তৎকালীন উপন্যাসের প্রধান ধারা। কপালকুণ্ডলা, জেলেখার মতো কিছু অজ্ঞানে বা অনবধানে রচিত আধুনিক আত্মহত্যা ছিল ঠিকই কিন্তু তার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। সুতরাং মানবেন্দ্রবাবুর বক্তব্যের সমর্থনে এ কথা বলাই যায় আমাদের আগের অধ্যায়ে আলোচিত উপন্যাসে ‘অকারণ আত্মহত্যা’র চিত্র নেই। এখন আমাদের খুঁজে দেখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথেই কি খুঁজে পেলাম এই আধুনিকতম সময়ের ফসল আধুনিকতম আত্মহত্যার বিবরণ? এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যাক যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের তুলনায় তাঁর ছোটোগল্পে আত্মহত্যা বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভাবনায় বেশি উজ্জ্বল এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে তা ভিন্ন গবেষণার দাবী রাখে ।

৪.১.১ *রাজর্ষি* : মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মাহুতি

রাজর্ষি (১৮৮৭) উপন্যাসটি উনিশ শতকের একদম শেষে গিয়ে রচিত হলেও আলোচনার সুবিধার্থে আমরা রবীন্দ্রনাথের উনিশ শতকের অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে এখানেই এটির

আলোচনা করব। জয়সিংহ চরিত্রটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। একদিকে পালক ও ধর্মগুরু রঘুপতির প্রতি তার নিঃশর্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি, আনুগত্য এবং পাশাপাশি দেবী প্রতিমার নামে জনসম্মুখে বলা মিথ্যেবাক্যে তার প্রতি তৈরি হওয়া অসম্মানবোধ দুইয়ের সংঘাত তৈরি হয়। অন্যদিকে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি তার বিশ্বাস ও ভালোবাসা তাকে আরো বেশি ক্ষতবিক্ষত করেছে। রঘুপতির চক্রান্তে ভাই নক্ষত্ররায়ের হাতে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের হত্যা সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠায় জয়সিংহের মন নীতিগত প্রশ্নে রঘুপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। তবুও রঘুপতির প্রতি আনুগত্যের কারণে রাজরক্ত নিজেই জোগাড় করার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় জয়সিংহ। উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় তার দেবী ভক্তি, রঘুপতির প্রতি আনুগত্য এবং পাশাপাশি ন্যায়-অন্যায়বোধ এই দ্বন্দ্ব থেকে আত্মহত্যা করে পথ খুঁজতে চেয়েছে সে। দেবীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার উক্তি –

“সত্যিই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটবে না? জন্মাবধি আমি তোকে মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়... এই নে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে।” গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন – বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল – চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন; পাষাণপ্রতিমা বিচলিত হইল না।”[iv]

জয়সিংহের মনের দ্বন্দ্ব – চিরবিশ্বাস ও ন্যায়-অন্যায়বোধ এই দুইয়ের টানাপোড়েনের হাত থেকে বাঁচতে এই আত্মহত্যা, টানাপোড়েন থেকে মুক্তি পাওয়ার

সহজ সমাধান মাত্র। পাশাপাশি উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই আত্মহত্যাটি নিতান্তই পরিকল্পিত। যেখানে জয়সিংহের আত্মহত্যার দৃশ্য বর্ণনার পর প্রধান হয়ে ওঠে পাষাণ প্রতিমার অবিচলিত থাকার কথা। জয়সিংহের এই আত্মদানে আসলে ঔপন্যাসিক বুঝিয়ে দিতে চান যে এই আত্মত্যাগ আসলে নিষ্ফল, রঘুপতির বানানো, ছলনা। যার শিকার হয় জয়সিংহ। এই আত্মহত্যাকে আমরা বাধ্যতামূলক Altruistic Suicide রূপে গণ্য করতে পারি কারণ রঘুপতির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জয়সিংহের কাছে গোবিন্দমাণিক্যকে হত্যা করার বদলে আত্মহত্যার মহিমাই গৌরবোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। তাই এ আত্মহত্যা অনেকটাই বাধ্যতামূলক।

৪.১.২ *নৌকাডুবি* : আত্মহত্যার সম্ভাবনা এবং জীবনের প্রতি আস্থা

নৌকাডুবি (১৯০৬) উপন্যাসটিতে আত্মহত্যা নেই – কিন্তু কমলার আত্মহত্যা কল্পনা উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রমেশের বিয়ে হয় এবং নৌকাডুবির পরে রমেশ যখন জানতে পারে যে যার সঙ্গে সে সংসার পেতেছে সে আসলে তার বিবাহিতা স্ত্রী সুশীলা নয়, অপরের নববধূ কমলা তখন তার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তা কমলা জানতেও পারে না। হেমনলিনীর প্রেমে আসক্ত রমেশ কমলাকে অস্বীকার করতে চাইলেও দৈনন্দিন সাংসারিক জীবন তাদের কাছে এনে দেয়। স্টিমার যাত্রা ও গাজিপুরের চক্রবর্তী খুড়োর বাড়িতে থাকাকালীন রমেশের মনের দ্বিধার যে প্রকাশ – তা কমলাকে আহত করে। অন্যদিকে রমেশ কমলাকে স্ত্রীরূপে মেনে নেওয়ার সঙ্কল্প করে, তার মনে হয় কমলাকে স্ত্রী রূপে স্বীকার না করাই অন্যায়ের। কিন্তু রমেশের হেমের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিটি কমলার হাতে পৌঁছায় এবং এত দিন সকল বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কমলা সব জানতে পারে। রমেশের দ্বিধার ব্যাখ্যা সে যেমন খুঁজে পায় তেমন নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিতও হয়। অবশেষে রমেশের প্রেমপূর্ণ চিঠি তাকে যে অস্বস্তির মধ্যে

দাঁড় করিয়ে দেয় তার থেকে মুক্তির পথ কী? তা কমলার পাশাপাশি পাঠককেও উদগ্রীব করে। কমলা যখন উমেশকে জোর করে যাত্রা শুনতে পাঠায়, অকারণ শৈলের মেয়ে উমিকে তার ব্রেসলেট, উমেশকে দু-জোড়া শাড়ি ও বিষণকে অনাবশ্যক এক টাকা উপহার দিয়ে একা গঙ্গাস্নানে রওনা দেয় তখন এক সম্ভাবনা তৈরি হয় কমলার আত্মহত্যার। পরদিন সকালে যখন গঙ্গার ধারে কমলার চাবির গোছা, জলের দিকে পদচিহ্ন ও রমেশের উপহার দেওয়া ব্রোচটি খুঁজে পায় উমেশ ও রমেশ তখন এই সম্ভাবনাটিই নিশ্চিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে চক্রবর্তী খুড়ার বক্তব্যটিই তার প্রমাণ – "কয়দিন হইতেই কমলার ব্যবহার ও আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহার সন্দেহমাত্র রহিল না যে, কমলা গঙ্গার জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে।"[v]

কমলা আত্মহত্যা করেনি। রমেশের সঙ্গে এতদিনকার সমস্ত মিথ্যা সম্পর্কের বন্ধন কাটিয়ে তার প্রকৃত স্বামীকে খুঁজে পেতেই সে ঘর ছেড়েছিল। কিন্তু তার গৃহত্যাগের ঘটনাটি লেখক এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে উমেশ, রমেশ বা চক্রবর্তী খুড়ার মতো পাঠকও কমলার প্রাণত্যাগ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিল। এতদিন যাকে স্বামী বলে স্বীকৃতি দিয়ে সহজ ঘরকন্না করছিল তাকে প্রকৃতরূপে জানতে পেরে কমলার যে লজ্জা বা অস্বস্তি তা যেন পাপবোধে পূর্ণ হয়েছিল রমেশের চিঠি হাতে পেয়ে। এতদিনকার এই মিথ্যা সম্পর্ককে 'পঙ্কিল' এবং রমেশকে তার জীবনের 'বিভীষিকা' বলে ভেবে নিয়ে তার আত্মহত্যাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি যেন – এ কথাই মনে হয়েছে পাঠকের, ঔপন্যাসিকের সুচতুর প্রয়াসে। যদিও সে পরিণতি যে ঘটেনি তা আমরা দেখেছি বরং জীবনের প্রতি অসীম বিশ্বাস ছিল লেখক ও কমলার। তাই এত লজ্জা, ঘৃণা, মিথ্যা, ভুলকে সঙ্গী করেও উপন্যাসের শেষে দেখা যায় কমলা ও তার স্বামী নলিণাক্ষের মিলন দৃশ্য।

৪.১.৩ *চতুরঙ্গ* : আত্মহত্যা-উপন্যাসের বক্তব্যের প্রকাশক

চতুরঙ্গ (১৯১৬) উপন্যাসে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ সবচেয়ে স্পষ্ট। নৌকাডুবিতে কমলার আত্মহত্যার দৃশ্য বর্ণনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রতি আস্থা রেখেছেন, কিন্তু *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে ঘটে যাওয়া দুটো আত্মহত্যা অন্য এক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেয়।

চতুরঙ্গ উপন্যাসের দুটি অংশ শেষ হয় দুটি আত্মহত্যার বর্ণনায় এবং আত্মহত্যাদুটি কেবল আত্মহত্যাই নয়, উপন্যাসে দুটি আত্মহত্যাই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছে। 'জ্যাঠামশায়' অংশে শচীশ এবং শ্রীবিলাস জ্যাঠামশায়ের যে ভাবনায় ভাবিত হয়েছিল তার মূল বক্তব্য ছিল – 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন।'[vi]

এই ভাবনায়, জ্যাঠামশায়ের কোন খাদ ছিল না, নাস্তিকতার পাশাপাশি মানুষের ভালো করায় জ্যাঠামশায় কখনোই নিজের লোকসান ছাড়া লাভের কথা ভাবেননি। অসহায় ননীর ক্ষেত্রেও শচীশ ও জ্যাঠামশায়ের উদ্দেশ্য ছিল তার উপকার সাধন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন–

"প্রথম অধ্যায়ে ননী যেমন শচীশের কাছে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম উপকারসাধনের একটা সংখ্যা মাত্র"[vii] কিন্তু জ্যাঠামশায়ের এই ভাবনায় যে ফাঁক লেখক দেখাতে চেয়েছেন তাতে ননীর আত্মহত্যাই লেখকের অবলম্বন। আর তাই জগমোহনের মৃত্যুতে নয়, ননীর আত্মহত্যায় 'জ্যাঠামশায়' অংশ শেষ হয় কারণ শচীশের মনে জ্যাঠামশায়ের দেখিয়ে দেওয়া পথের মধ্যকার ভুলত্রুটি ধরা পড়ে যায় এখানেই। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা উপন্যাসের কালান্তর বইতে বিষয়টিকে এইভাবে উপস্থিত করেন –

"নীরস বুদ্ধচর্চায় জীবনের খাত পূর্ণ হতে পারে না – এবং জীবন যে ছকে ফেলা ব্যাপার নয় জ্যাঠামশাই জগমোহন অধ্যায়ে সেটা পরিস্ফুট। জগৎসংসারে সে সত্যি নিউটনের

গাণিতিক নিয়মে চলে না, সেটা যে শুধু মিল্ বেন্থামের তত্ত্ব পরীক্ষার ল্যাবরেটরি নয়, এটা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট। অসহায়া আশ্রিতা ননিকে সামাজিক মঙ্গলের নিমিত্ত বিয়ে করতে চাইলেই যে তাকে বিয়ে করা যায় না এবং মানুষের মন যে যুক্তি পরম্পরাকে অনুসরণ করেই সর্বত্র চলে না, সেটা ননির আত্মহ্যা এবং শেষ চিঠিতে পরিস্ফুট।"[viii]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্বীকার করে নিয়েও একটু অন্যভাবে ভাবা যেতে পারে যে তাহলে কি ননীর আত্মহত্যা আসলে অযুক্তির পরিচয় দেয়? জগমোহন ও শচীশের ভাবনাকে 'যুক্তি' এবং ননীবালার আত্মহত্যাকে 'অযুক্তি' বলে দেগে দেওয়ার বদলে আমরা এভাবেও ভাবতে পারি না কি যে ননীর যে যুক্তি ছিল অর্থাৎ যে কারণে সে পুরুন্দরের মতো একজন মানুষকে ভুলে শচীশকে বিয়ে করার প্রস্তাবে রাজী হয়নি সেই যুক্তি জ্যাঠামশায়েরা বুঝতে পারেনি বা হয়ত বুঝতে চায়ও নি। সমাজের ঠিক করে দেওয়া যুক্তিবোধের বাইরেও প্রতিটি মানুষের যে নিজস্ব যুক্তিবোধ তৈরি হয় তার প্রতি সম্মান রাখাটাও প্রয়োজনীয়। ননী নিজের যুক্তিবোধের বাইরে আসার চেষ্টা করে শচীশকে বিয়ে করার কথা ভেবেছে, তাই তার পরণে উঠেছিল বিয়ের পোষাক। কিন্তু অন্য দিক থেকে ননীর ভাবনাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছে শচীশেরা। উপন্যাসের পরবর্তী অংশেও আময়া দেখব যে শচীশ কোন একটি যুক্তি বা মতকে অবলম্বন করে এগোতে চেয়েছে, যতবারই কোন কারণে তা যুক্তি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এর কারণ হয়ত এটাই যে সে কখনো অপরপক্ষের যুক্তিকে বুঝতে, জানতে শেখেনি। ননীবালার মৃত্যু এই ভাবনাকেই দৃঢ় করেছে যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে নবীনের স্ত্রীর মৃত্যুর পর শচীশের আচরণে।

এ তো গেল রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে ননীবালার আত্মহত্যা কিভাবে সমর্থন জানিয়েছে তার কথা। আর উপন্যাসের চরিত্র হিসাবে যদি ননীবালার আত্মহত্যাকে ব্যাখ্যা করতে চাই

তাহলে বলতে হবে 'পুনরুজ্জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা' এবং সমস্ত তৈরি হয়ে ওঠা সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে ননীবালার যে আত্মহত্যা তা মানুষের জটিল আধুনিক মননেরই পরিচায়ক। যা ভালো, যা ঠিক যা স্বাভাবিক তাকেই বেছে নেওয়ার সহজ সমীকরণ দিয়ে আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে যে ব্যক্ত করা যায় না তা ননী চরিত্রটি যেন প্রমাণ করে দেয়।

অন্যদিকে শচীশের পরবর্তী জীবন ও দামিনী অংশের পরিসমাপ্তিতে আসে অপর একটি আত্মহত্যার কাহিনি। লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে অধ্যাত্মরসকে অবলম্বন করে শচীশ যে ছক নিজের মনে তৈরি করে নিয়েছিল সেই ছকের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল দামিনী কারণ দামিনী 'জীবনরসের রসিক'। শচীশের মনের ছক ভাঙার জন্য আগে রবীন্দ্রনাথ ননীবালাকে দিয়ে আত্মহত্যা করান এবং এই লীলানন্দীয় ভাবনার ত্রুটি স্পষ্ট করতে তাই এল লীলানন্দের শিষ্য নবীনের স্ত্রী'র আত্মহত্যার ঘটনা। গুহার ঘটনা ও শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর পক্ষপাত – এই দুইই শচীশের মনে লীলানন্দের আধ্যাত্মিকতার ভাবকে খানিকটা নাড়া দিয়েছিল তবুও শচীশ 'রস ও তত্ত্ব'কে একসঙ্গে চালানোর যে প্রচেষ্টা করেছিল তাকে একেবারে ভেঙে দিয়ে গেল নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যা –

"...নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তা বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথম স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্য করিয়াছে।"[ix]

এরপরেই দামিনীর বক্তব্য শচীশকে প্রমাণ করল যে তারা মত্ত, যে পথের ধর্ম, কর্ম, লাজ-লজ্জা নাই, এবং যে পথ তারা নিয়েছে তা কারো উপকার করে না। শচীশের ভাবনার বদল হয় আবার। আর আত্মহত্যাটিকে যদি উপন্যাসের প্রয়োজনের বাইরে

নিছক একটি আত্মহত্যা বলে ভাবতে চাই তাহলে বলতেই পারি যে নবীনের প্রথমা স্ত্রী যেন বঙ্কিমের সূর্যমুখী আধুনিকতর রূপায়ণ যে অন্যের প্রতি স্বামীর আসক্তির কথা জেনে অনায়াসে তাদের বিবাহ স্থির করে এবং নিজের অধিকারহীনতা প্রত্যক্ষ করেই ঠিক ততটাই অনায়াসে বিষপান করে।

৪.১.৪ *ঘরে বাইরে* : আত্মহত্যার ভাবনা থেকে জীবনবোধে উত্তরণ

ঘরে বাইরে উপন্যাসে (১৯১৬) বিমলা চরিত্রটির যে দ্বন্দ্ব লেখক দেখাতে চেয়েছেন তা কেবলমাত্র নিখিলেশ ও সন্দীপের প্রতি দ্বিবিধ আকর্ষণজনিত দ্বন্দ্ব নয়। নিজেকে বাইরের পরিবেশে বিমলার কাছে যাচাই করতে চেয়ে নিখিলেশ যখন বিমলাকে বাইরে টেনে এনেছে তখন ক্রমশ সন্দীপকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট হয়ে গেছে নিখিলেশ ও বিমলার মানসিক পার্থক্য। নিখিলেশের স্থির গভীরতার পরিবর্তে সন্দীপে প্রাণচঞ্চল মত্ততাকে বিমল গ্রহণ করেছে। পরে তাকে 'ফেনিলতা' বলে চিনতে পারলেও সন্দীপের মোহকে অতিক্রম করতে পারেনি বিমলা। তাই বিমলা যখন বলে – "আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের প্রলয়রূপ ভয়ংকর, আর এক বুদ্ধি বলছে তাই তো মধুর।" [x]

তখন তার দ্বন্দ্ব স্পষ্টরূপ ধারণ করে, নিখিলেশের টাকা চুরি করে সন্দীপকে দেওয়ার পর একদিকে তার বিবেকবোধ জেগে ওঠে আবার অন্যদিকে সন্দীপের স্তবের অলংকৃত ভাষায় মনের নেশা – এই দুইয়ে ক্ষতবিক্ষত বিমলা যেন অমূল্যর সাহায্যেই সন্দীপের মোহ কাটিয়ে উঠল। আর তাই বিমলার এই আত্মহত্যার ভাবনার সঙ্গে অমূল্য মিলে যায়–

"অমূল্যর কোনো চিহ্নই আমার কাছে ছিল না; কেবল ছিল তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী, সেই পিস্তলটি। মনে হল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েছে। আমার জীবনের মূলে যে

কলঙ্ক লেগেছে বালক বেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন...”[xi]

আর তাই বিমলা নিজের অপরাধ ও কলঙ্কের বোধ থেকে পিস্তলটি খুলে মাথায় ঠেকায় কিন্তু পরমুহূর্তেই ঠাকুরবাড়ির কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ যেন তাকে জীবনবোধে জাগ্রত করে। বলাই বাহুল্য এক্ষেত্রে 'কাঁসর ঘণ্টার' আওয়াজটি নিতান্ত একটি শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেননি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বমানবতার ভাবনায় বিশ্বাসী তাতে ক্ষুদ্র অহং-এর তুলনায় নিত্যকালের প্রতি ও অসীমের প্রতি তার আস্থা। কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ যে শুভের বাণী বয়ে আনে তাকেই যেন ব্যবহার করেছেন লেখক। বিমলার এতদিনকার যে অস্থিরতা তাকে এই 'কাঁসর-ঘণ্টা' আওয়াজ যে শুভত্বের দিকে নিয়ে যাবে। তাই আত্মহননের চরম মুহূর্তে এই শব্দটি যেন বিমলাকে নতুন এবং উন্নততর পথের সন্ধান দেয়। নিখিলেশকে দেবতা বানিয়ে এবং ভালোবাসাকে পূজা আখ্যা দিয়ে, মায়ের সতীত্বের দোহাই টেনে বিমলা সংকটের থেকে মুক্তির পথ খোঁজে।

৪.১.৫ *যোগাযোগ* : আধুনিক সহমরণ

যোগাযোগ (১৯২৯) উপন্যাসে কুমুদিনী ও বিপ্রদাসের পিতা জমিদার মুকুন্দলাল ও তার স্ত্রী নন্দরানীর মৃত্যুকে আত্মহত্যাই বলতে চাই। রাসের অনুষ্ঠান শেষে বৈঠকখানার বদলে যখন নদীর উপর বজরায় বাঈনাচের আয়োজন করা হল তখন অভিমানিনী নন্দরানীর বেদনা হল প্রবল। কারণ সে জানত বাইরের এই জাঁকজমক, বাঈনাচ, বা তথাকথিত ধনীসুলভ সকল অভ্যাসের মধ্যেও নন্দরানীর প্রতি মুকুন্দলালের প্রেমটি ছিল খাঁটি। তাই সেই প্রেমের অপমানে কর্তাকে দণ্ড দিতে সে মায়ের অসুখের অজুহাতে মুকুন্দলাল ঘরে ফেরার আগেই বৃন্দাবন চলে গেল। অন্যদিকে অপরাধবোধ ও সংকোচ নিয়ে ঘরে ফেরা মুকুন্দলাল যখন এই কথা জানতে পারল তখন সামান্য অপরাধে এতবড় দণ্ডপ্রাপ্ত

জমিদারবাবু অভিমানে নিজের অবসন্ন শরীরের ওপর অত্যাচার শুরু করল। ক্রমাগত নির্জলা ব্র্যাণ্ডিপান – এটি ছিল যেন দণ্ডদাতাকে দণ্ড না দিতে পারার অভিমানে নিজেকে দণ্ডদান। আর তাই তার মৃত্যু একপ্রকার স্বেচ্ছামৃত্যুই বটে। এরপর নন্দরানী যখন ফিরে এসে কপালে 'মোটা করে সিঁদুর' পরে, লাল বেনারসী শাড়ি গায়ে জড়িয়ে সহমৃতা হল তখন এই সহমরণ যেন আধুনিক আত্মহনন হয়ে ওঠে। তবে এই আত্মহনন যে বাধ্যতামূলক নয় বরং ঐচ্ছিক তা তো বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা সাতটি আত্মহত্যার সম্ভাবনা তৈরি হতে দেখি এবং তার মধ্যে দুটি আত্মহত্যা থেকে যায় অসম্পূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র ও তার পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে যখন 'আত্মহত্যা'র ঘটনা এত বেশি তখন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে 'আত্মহত্যা'র স্বল্পতা আমাদের খানিকটা বিস্মিত করে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনাকে একটু তলিয়ে দেখতে হবে।

৪.১.৬ রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ

রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠানের আত্মহত্যা তাঁর মনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আমাদের সকলেরই জানা। ১৮৮১-তে *সন্ধ্যাসঙ্গীত*- এ *তারকার আত্মহত্যা* কবিতায় এই আত্মহত্যা নিয়েই নিজের মনের ভাবটি প্রকাশ করেছেন তিনি। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে অন্ধকারে খসে পড়ল কেন এই তারাটি, তা খোঁজার চেষ্টা কবি করেন নি, পাঠককেও কারণ বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি তিনি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জ্বলতে জ্বলতে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়া তারাটি মননে আধুনিক মানুষেরই পরিচায়ক। মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এই কবিতটি থেকেই বাংলা সাহিত্যে 'অকারণ আত্মহত্যা'-র একটি ধারার নির্মাণ হয়েছে বলে মনে করতে চান। এই মৃত্যু প্রথমে তাঁর মনে যে 'নাই'- এর বোধ তৈরি করে দিয়েছিল তা অতিক্রম করা সহজ ছিল না। কিন্তু

তিনি রবীন্দ্রনাথ বলেই হয়ত এই ‘নাই’-এর বোধের মধ্যেও ‘আছে’-কে খুঁজে নিতে চেয়েছেন, পেরেছেনও। তাঁর কথা ধার করেই বলি -

“বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপর ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারি দিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্যে যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।”[xii]

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক ও অসীমের যে ধারণা তাকে উপনিষদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। জীবনকে এক ও অসীমের মধ্যে পূর্ণরূপে তিনি দেখতে চেয়েছেন। মানুষের একটি নিত্যকালের ‘অহং’ ও একটি প্রাত্যহিকতার ক্ষুদ্র ‘অহং’। জীবরূপে ক্ষুদ্র যে ‘অহং’টি তার বিনাশে অমৃতরূপ বৃহৎ ‘অহং’-এর প্রকাশ, আর তা লেখকের কাছে অমৃতত্ব বা অমরত্বের সন্ধান দিয়েছে। তাই ‘আত্ম’কে হত্যা – এই জৈবিক প্রবৃত্তিকে তিনি অস্বীকার করেছেন অজান্তে বা জেনে বুঝেই। মানুষকে তিনি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিজীবনরূপে না দেখে একটি নিরবচ্ছিন্ন মানব বিবর্তনের অংশ রূপে দেখেছেন – যেখানে মৃত্যু কোনো বাধা নয় বা মৃত্যু হল শুরু তাই ‘আত্মহত্যা’র দ্বারা জীবনের শেষ ঘটানো – এ কখনোই অভিপ্রেত নয় তাঁর শান্তিনিকেতন-এর প্রাচীন ভারতের এক প্রবন্ধে তাই তার বক্তব্য এই ভাবনারই সমর্থন –

"মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়ে দেয় – কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।"[xiii] তাই মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কেবল দেহের সঙ্গে বিচ্ছেদ হতে পারে, 'আত্ম'কে হননের যোগ্য হতে পারে তাঁর সাহিত্যে? তাই হয়ত 'চতুরঙ্গ'তে আত্মহত্যা হিসাবে ততটা নয় কিংবা জয়সিংহের আত্মদান 'আত্মাহুতি' রূপে আদর্শের জয়গান গায় আর কমলা এবং বিমলা উভয়েই আত্মহননের যথেষ্ট সম্ভাবনা ও কারণ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাস রাখে জীবনের প্রতি, যেমন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস রাখেন সেই 'এক'-এর প্রতি ।

জীবিত ও মৃত গল্পে কাদম্বিনী সমাজের কাছেই যেন প্রশ্ন ছুড়ে দেয় –

"আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই পরলোকেও স্থান নাই – ওগো আমি তবে কোথায় যাইব।"[xiv]

কাদম্বিনী বারবার বলতে চায় যে সে মরেনি বেঁচে আছে। মাথার রক্ত ঝরিয়েও যখন সে নিজের বেঁচে থাকা প্রমাণ কতে পারে না তখন তার একাকিত্ব আমাদের যেন গ্রাস করতে আসে। প্রকৃতই জীবিতদের মাঝে তার কোন আশ্রয় নেই – সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর তাই পুষ্করিণীর জলে ঝাঁপ দিয়ে "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই" [xv]

কাহিনিতে যৌক্তিকতার যথেষ্ট অভাব থাকলেও কাদম্বিনীর যে একাকিত্বের যন্ত্রণা তা আধুনিক মানুষের যন্ত্রণা। সুতরাং প্রকৃতিতে এই আত্মহত্যা আধুনিক। আত্মহত্যার কারণ হিসাবে কাদম্বিনীর যে জগৎ রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেন তার অভিনবত্ব স্বীকার করতেই হয়। আত্মহত্যার সরলীকরণ যা পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকেরা করেছিলেন তা থেকে রবীন্দ্রনাথ সরে আসার যে সকল প্রচেষ্টা করেছিলেন তার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করা হল খানিকটা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আত্মহত্যা প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বলেন –

"রবীন্দ্রনাথের চরিত্ররা যখন স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণ করে, তখন তাদের সেই কাজের পিছনে এমন এক তীব্র চাপ থাকে, যা শরৎচন্দ্র বা তাঁর অনুসারী লেখকদের মতো তেমন একস্তর বা ফেনায়িত নয়।" [xvi]

আমরা এই বক্তব্যকে খানিকটা সমর্থন করেও বলব যে সহজ, একস্তরীয় আত্মহত্যা রবীন্দ্রনাথে একেবারে নেই একথা গ্রহণযোগ্য নয়। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে আত্মহত্যার ততটা প্রকাশ না থাকার কারণও আমরা অনুসন্ধান করেছি পরবর্তী এবং এর পরে আমরা বুঝে নেব আত্মহত্যার আধুনিকতম রূপটিকে যা হয়ত রবীন্দ্রনাথের হাতেই খানিকটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একথা বলতেই হবে যে উপন্যাসের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে বরং বেশ কিছু আত্মহত্যার নিদর্শন পাওয়ায় যায়। রবীন্দ্রনাথের যে ছোটোগল্পগুলিতে আমরা আত্মহত্যার অনুসঙ্গ পাই সেগুলি হল মুকুট, দালিয়া, জীবিত ও মৃত, শাস্তি', নিশীথে, উদ্ধার, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর ও প্রগতি সংহার।

Durkheim তাঁর বইতে Egoistic ও Altruistic Suicide ছাড়াও Anomic Suicide–এর কথা বলেছেন। Anomic Suicide-এর পিছনে তিনি Economic Anomy ছাড়াও সম্পর্কের Anomy–র কথা বলেছেন। মূলত Divorce, Widowhood এবং Domestic Anomy নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি Monogamic Marriage, সমাজের নিয়ম, যৌন চাহিদা এই সমস্ত দিকের কথাই বলেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বিবাহে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের অধিক স্বার্থত্যাগের কথা বলেন এবং এটাও বলেন যে বিবাহ পুরুষের পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয়। যৌনচাহিদা ও নীতিবোধের অর্থাৎ সামাজিক অস্থিরতার কারণে মানুষের যৌনচাহিদা ও নীতিবোধ আহত হলে যে বিশেষ আত্মহত্যাটি ঘটে বলে Durkheim মনে করেছেন, তাকে তিনি Fatalistic Suicide বলেছেন। এছাড়া Economic Anomy–র কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

সমাজের নীতি বা নিয়মকানুনের অভাবে ব্যক্তিমানুষের মনে অর্থনৈতিক বা যে অস্থিরতা তৈরি হয় তার একটি প্রধান পরিণতি আত্মহত্যা। শুধু Egoistic Suicide–এর মতো ব্যক্তির desire এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং Anomic Suicide-এ সমাজের ভূমিকা স্পষ্টতর। আমাদের আলোচনার পর্বে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ের অনুসরণে Egoistic বা Altruistic আত্মহত্যাকে আর খুঁজব না। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব বিশ শতকে এই বঙ্কিম, রবীন্দ্র বৃত্তের বাইরে আত্মহত্যার অন্যতর রূপটিকে। বলা বাহুল্য কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে সবকটি আত্মহত্যাকে ঢুকিয়ে আমরা আত্মহত্যাকে দেখার চেষ্টা করছি না বরং আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে সাম্প্রতিক লেখকরা কীভাবে দেখবেন আত্মহত্যাকে, কীভাবে বর্ণনা দেবেন আত্মহত্যার তা বুঝে নেবার চেষ্টা করব। অনেক ক্ষেত্রে আমরা এই ধরণের আত্মহত্যার নিদর্শন পাব,সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করে বরং Anomic তথা Fatalistic Suicide বা আত্মহত্যার আধুনিকতম রূপটিরই নানারকম বিতর্ককে মূলত লক্ষ করব ও বিশদে বিশ্লেষণ করব।

৪.২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

রবীন্দ্র পরবর্তী ও রবীন্দ্র অনুসারী লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছাড়াও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রতিনিধি স্থানীয়। রবীন্দ্রনাথের অনুসরণের সঙ্গে হাস্যরসের প্রলেপ দিয়ে তাকে আরো খানিকটা কোমল করে তুলেছিলেন তিনি। ভাষা বা উপন্যাসের ধাঁচে রবিধর্মী হলেও উপন্যাসের প্লটের ক্ষেত্রে বঙ্কিমী আদর্শবাদের লক্ষণ ফুটে ওঠে। তিনি গল্প দিয়ে পাঠককে শেষ অবধি আকর্ষণ করে রাখতে সক্ষম হলেও যুগধর্মী হয়ে ওঠে নি তাঁর উপন্যাস। চরিত্র চিত্রণে কিছুটা বৈচিত্র এলেও সমাজ চিত্র যা ফুটে ওঠে তা গতানুগতিক ও উনিশ শতকীয়।

৪.২.১ *রত্নদীপ* : পাপ পুণ্যের পুরনো ছক

রত্নদীপ (১৯১৭) উপন্যাসের নায়ক রাখাল, বৌরাণীর মৃত স্বামীর সঙ্গে নিজের চেহারার সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে সে গিয়ে প্রবেশ করে বৌরাণীর অন্দরে। কিন্তু বৌরাণীর পতিপ্রেমের একনিষ্ঠতা দেখে অনুশোচনায় দগ্ধ হয় সে এবং এই ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আত্মহত্যায় উদ্যোগী হয়। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাখালের মনের এই দ্বন্দ্বকে সেভাবে পরিস্ফুট করেন নি লেখক, বরং কিছুটা তাড়াহুড়ো করেই রাখালের পাপ-বোধ জাগিয়ে তুলেছেন তিনি। যদিও এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। বৌ-রাণী চরিত্রটির নির্মাণ আকর্ষণীয় হলেও এই উপন্যাসে রাখালের মননের, মনস্তত্ত্বের কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা লেখক করেন নি। বরং এই উপন্যাসে পাপ-পুণ্যের বোধের উপর অনেক বেশি জোর দিয়েছেন তিনি। রাখালের আত্মহত্যার চেষ্টা এই নীতিবাদেরই পরিণাম।

৪.৩ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

বিশ শতকের তিরিশের দশক অবধি জনপ্রিয়তার বিচারে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ধারে কাছে কেউ ছিল না। কেবল জনপ্রিয়তা নয় বাস্তবতার অনুসরণেও তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। সামাজিক নানা সমস্যায় জর্জরিত অ্যাভারেজ বাঙালি পাঠক যে স্থিতিহীনতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সেইসময়, শরৎচন্দ্রের লেখনীতে তারা নিজেদের ছবি দেখতে পেলেন। তাঁর রচিত চরিত্ররা সকলেই খুব বাঙালি এবং অতি সাধারণ। সেই অর্থে রাজনৈতিক ডামাডোল তাঁর লেখায় স্থান না পেলেও(ব্যতিক্রম-পথের দাবী) সমাজের সমস্যা, অর্থনৈতিক কাঠামো জনিত সমস্যাকে আবেগের সঙ্গে ছুঁয়ে গেলেন তিনি। তাঁর লেখার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নিষিদ্ধ প্রেম ও তাকে কেন্দ্র করে তৈরি

হওয়া সামাজিক দ্বন্দ্ব। শরৎচন্দ্রের রচনায় নিষিদ্ধ প্রেম বিষয়ে সরোজ বন্দোপাধ্যায় বলছেন -

"ব্যক্তি সচেতনতার একটি আশ্চর্য পরিণাম হল এই যে, মানুষ বুঝল সমাজ নামক ব্যাপারটি লোক-সমষ্টির যোগফলে বিরাজিত নয়। সমাজই বলা হোক, বা জীবন সংক্রান্ত ধ্যানধারণার প্রচলিত মানই বলা হোক, এ সমস্ত কিছুর বাঁধন শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মানসের নিভৃতে।" [xvii]

এই ব্যক্তি মানসকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা শরৎচন্দ্র খুব বেশি করেন নি, বরং সমাজ-বহির্ভূত বা সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের ক্ষেত্রে তাঁর সহানুভূতিই প্রধান হয়ে রয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে।

এই নিষিদ্ধ প্রেমকে কেন্দ্র করেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাসগুলিতে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ এসেছে। দেবদাস (১৯১৭) ও গৃহদাহ (১৯২০) উপন্যাসে আত্মহত্যার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে লেখকের কাছে আত্মহত্যার বিষয়ে সহানুভূতির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায়।

৪.৩.১ *দেবদাস* : প্রেম ও অপ্রাপ্তি

প্রেমে ও অপ্রাপ্তিতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল ও বেশ্যার প্রতি অনুরক্ত দেবদাসের কাহিনি (১৯১৭) আসলে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাহিনি। এই উপন্যাসে দেবদাসের পার্বতীর প্রতি প্রেম, প্রেমের অপ্রাপ্তি এবং তার পরিণামে মদ্য পান উচ্ছৃঙ্খলতা বা চন্দ্রমুখীর প্রতি ঘৃণা –এ সবই তার নিজের প্রতি অত্যাচারের কথা বলে। আত্মহত্যায় এই মর্ষকামের ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই কিন্তু এই আত্মহত্যার প্রতি আকর্ষণ বা বলা ভাল বেঁচে না থাকার জন্য দেবদাসের এই আকুলতা – এ সবই নির্দিষ্ট ছকে

বাঁধা। দেবদাসের দুঃখ পাঠক বুঝতে পারে। চন্দ্রমুখীর প্রতি আসক্তির সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে পার্বতীর কাছে হাতিপোতার উদ্দেশ্যে ছুটে চলা দেবদাসের আত্মহননের ইচ্ছা ও তার মৃত্যুর দৃশ্য পাঠককে আহত করে। শরৎচন্দ্র তাঁর লেখনীর কৌশলে করুণ রস তৈরি করে নেন। এই বিরহী দেবদাসের জন্য পাঠক করুণা বোধ করে, কষ্টে তার গলা বুজে আসে, কিন্তু কোনো প্রশ্ন বা কাঁটা বিঁধে থাকে না তার মনে।

৪.৩.২ *গৃহদাহ* : দুঃখভোগ ও অপ্রাপ্তি

বন্ধু মহিমের স্ত্রী অচলার প্রতি আকর্ষণ ও প্রেম সুরেশের চরিত্রকে উদ্দেশ্যহীন, ভবঘুরে এক চরিত্রে পরিণত করেছে। উপন্যাসের (১৯২০) শুরুর থেকেই সুরেশকে এক দুর্বল চরিত্র রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন লেখক। সহজেই তার চোখে জল আসে। গৃহদাহ উপন্যাসে অচলাকে নিয়ে নির্জনবাস করার সময় সুরেশের মনের ভাঙন শুরু হয়, এতোদিন অচলাকে পাওয়ার জন্য অক্লান্তভাবে দুঃখভোগী সুরেশ অচলাকে পেয়েও যখন বুঝতে পারল যে অচলার ভালবাসা সে কখনই পাবে না তখন তার এতদিনকার অর্থহীন ও ব্যর্থ প্রয়াসের উপলব্ধিতে সে যেন শান্তভাবে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আর তাই মৃত্যুর আশঙ্কা সত্ত্বেও ফয়জাবাদের প্লেগ বিধ্বস্ত এলাকার রোগীদের চিকিৎসা যেন তার এক ধীর আত্মহননের প্রস্তুতি। প্লেগ-বিধ্বস্ত এলাকায় আত্মীয়-বন্ধুহীন ভাবে সুরেশের মৃত্যুদৃশ্যের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে পাপ, অপ্রাপ্তির কাহিনি।

সুতরাং আত্মহত্যার যে বিবরণ শরৎচন্দ্রের রচনায় বারবার উঠে এসেছে তা কখনোই আধুনিকতার মাত্রা ছোঁয়নি। সুরেশ তার জীবনে সংযম শিক্ষা করে নাই – তারই কৈফিয়ত হিসাবে হয়ত তার এই পরিণতি। সুরেশের এই মৃত্যুকে মহত্বের চিহ্নরূপে তুলে ধরার জন্য প্লেগের এই সেবাকার্যের বর্ণনা। সুরেশের চরিত্রহীনতা, সংযমহীনতার পরিণতিস্বরূপ তার মৃত্যুকে সামান্য সহানুভূতি দিয়ে আঁকার এই প্রচেষ্টা

প্রকৃতই শরৎচন্দ্রের দুঃখ ও করুণাবোধের পরিচয় দেয়। শরৎচন্দ্রের রচনায় তাঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও ভাবালুতা তাঁকে গ্রাস করেছে। তাই তাঁর উপন্যাসের আত্মহত্যাগুলো বড় বেশি সরল, তাঁদের মনের প্রবণতা বা জটিলতার দিকে ততটা নজর দেন নি লেখক। সামাজিক নানা রীতি, প্রচলিত ভাবনার বিরুদ্ধে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাস লিখতে চাইলেও তাতে পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের মত পাপ পুণ্যের কথা এসেছে। পাপীদের প্রতি যে কড়া মনোভাব পোষণ করেছিলেন আগের লেখকেরা, শরৎচন্দ্র তা করেন নি। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন এই চরিত্রগুলো, কিন্তু ওইটুকুই । তাদের মনের গভীরে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা বা তাদের সমস্যার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা ছিল না উপন্যাসগুলিতে।

৪.৪ জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)

সময়কালের দিক দিয়ে জগদীশ গুপ্ত কল্লোলের কালের হলেও বয়স ও লেখনীতে তিনি ছিলেন পরিণত। শরৎচন্দ্রের লেখায় যা ছিল ভাবালুতা তা জগদীশচন্দ্র গুপ্তের রচনায় এল অনেক বেশি তাৎপর্য নিয়ে। ফ্রয়েডীয় অবচেতন তাঁর লেখায় ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার। 'আত্মহত্যা' ও এসেছে অনেক বেশি তাৎপর্য নিয়ে। জীবনের জটিল কুটিল অন্ধকার দিককে নিয়ে তিনি কথা বলেছেন। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিণাম, হতাশা, দুর্ভাগ্য তাঁর উপন্যাসে বারবার এসেছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে জগদীশচন্দ্রের জীবনের প্রতি ভাবনা রবীন্দ্রভাবনার থেকে একেবারেই বিপরীতধর্মী। জগদীশ গুপ্ত ব্যক্তি মানুষের মনের অতলে ডুব দিয়ে তাঁদের জীবনের সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু তা কখনোই জীবন জিজ্ঞাসা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মানুষের সংকট মাত্র নয়। জগদীশ গুপ্তের রচনার ধরন তাঁর সময়ের অন্যান্য লেখকদের থেকে ছিল একেবারে আলাদা। অলোক রায় তাঁর উপন্যাস প্রসঙ্গে যদিও বলেন যে – "আজকের দিনে *অসাধু সিদ্ধার্থ* (১৯২৯)বা *লঘুগুরু* (১৯৩১)

পড়লে পাঠকের ভালো লাগবে এমন কথা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।"[xviii] কিন্তু মনের যে অন্ধকার দিকের প্রতি নজর দিলেন জগদীশ গুপ্ত তা বর্তমানের আধুনিক পাঠকের মনে প্রভাব ফেলবে বলেই আমার বিশ্বাস।

৪.৪.১ *অসাধু সিদ্ধার্থ* : আত্মনিগ্রহ

অসাধু সিদ্ধার্থ (১৯২৯) উপন্যাসের কাহিনীতে প্রভাতকুমারের *রত্নদ্বীপ* উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও নায়ক নটবরের সংকট অনেক সূক্ষ ভাবে অঙ্কন করেছেন লেখক । এই চরিত্রটির বিকাশ, প্রেক্ষাপট তৈরির দিকে আলাদা ভাবে নজর দিয়েছেন লেখক। এক বৈষ্ণবীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম নেওয়া অবৈধ সন্তান নটবর, পয়সার জন্য সে বৃদ্ধা বেশ্যার শয্যাসঙ্গী। অজয়াকে দেখে এই পঙ্কিল জগত থেকে বেরিয়ে মহৎ হওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে সে । কদর্য পরিবেশে বাল্যকাল থেকে বড়ো হওয়া নটবর আগেও আত্মহত্যায় উদ্যত হয়েছে, অন্ধকার খাদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে জীবনের প্রতি তার আকর্ষণ তৈরি হয়। কিন্তু তার সুস্থ আলোকিত জীবনের পথে তার পূর্বপরিচয় উন্মোচিত হয় – সে যে সিদ্ধার্থ নয়, নটবর,তা জানা যায়। তার সমস্ত স্বপ্ন ব্যর্থ ও অর্থহীন হয়ে যায়।

"আত্মার বিকাশ চেয়ে সে শেষ পর্যন্ত আপন আত্মাকেই বিনাশ করলে; কেননা তার আধ্যাত্মিক পরিব্রজনের হিংস্র পথের নানা কোণায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে নিয়তিপ্রেরিত সেই সব গুপ্তঘাতকেরা ... তারাই চক্রান্ত করে পথিকের হাতে বিপজ্জনক একটি হাতিয়ার তুলে দিয়ে উদ্দীপিত করে, যার নাম আত্মনিগ্রহ, যা চেতনাকে দু-টুকরো ক'রে তবে ক্ষান্ত হয়।" [xix]

বাঁচতে চেয়েও বাঁচতে না পারার কথা জগদীশ গুপ্তই প্রথম এভাবে ঘোষণা করলেন, নিয়তিবাদের পক্ষে দাঁড়িয়ে জগদীশ গুপ্ত এক 'অতি-হিংস্র শক্তি'র হাতে মানুষের বিপর্যয় ও বেঁচে থাকতে না পারার ঘটনাকে অতি স্বাভাবিকতায় বর্ণনা করেন। এপ্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের একটি বক্তব্যকে স্মরণ করা যায় –

"...এর পেছনে একটা তত্ত্ব আছে – সুসংবদ্ধ না হলেও তা তত্ত্বই পশু মানুষের অথবা মানুষ পশুর তত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথের অমৃতের সন্তানের বা ঔপনিষদিক মানবতত্ত্বের বিপরীত মানবতত্ত্ব মানুষের পশুত্বের তত্ত্ব।" [xx]

৪.৪.১ *রতি ও বিরতি* : শোক ও জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য

রতি ও বিরতি (১৯৩৪) উপন্যাসে রাম ও গয়ামণির একমাত্র পুত্র আট বছরের লব মারা যায় বিষাক্ত সাপের ছোবলে। ঘরের মধ্যে একটি গর্ত দিয়েই সাপটি উঠেছিল। ছেলের মৃত্যুতে জীবন সম্পর্কে উদাসীন এই দম্পতির মনে মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা এতই জোরালো হয়ে ওঠে যে সাপ আসার গর্তটা তারা বুজিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে "কত আশা করিয়া তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে সেই গর্ত্তের ধারে মাথা রাখিয়া প্রত্যহ শয়ন করে। রাত্রের সুদীর্ঘ অন্ধকার আর নিদ্রার সুযোগ বহিয়া যায় ... কিন্তু সাপ সে পথে আর আসে না।" [xxi]

নিয়তির এই অমানবিক পরিহাসের পরিণতি হিসাবে উন্মাদিনী গয়ামণি একদিন জলে ভাসিয়ে দেওয়া ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে ঝাঁপ দেয় নদীতে ও "শ্রাবণের বেগবতী ফুল্লরার অগাধ জলরাশি'তে ভেসে যায় আর ভিক্ষাজীবী রাম উপন্যাসের নবম ও শেষ পরিচ্ছেদে সেই গর্তে, সেই সাপটির সামনেই ...ডান পা-খানা নামাইয়া দিয়ে সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। " [xxii] সাপে একবার তাকে দংশন করার পর যখন তার মনে পড়ে যে লবকে দুবার দংশন করেছিল সাপটি, সে তার আরেক পা এগিয়ে দেয়।

মৃত্যুর এই রূপ বা আত্মহত্যার এই অসহায় ছবি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রে পাওয়া যায় নি। রামকে বাঁচানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল কি ছিলনা এই প্রশ্ন তোলার পরিবর্তে বলা যায় আত্মাহুতির এই রূপটিকে মানুষের মনে গেঁথে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

জগদীশ গুপ্তের অন্য একটি উপন্যাস, *শেষ পাণ্ডুলিপি*-তে বীরেশ্বর গুপ্ত একটি মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হয়। সমাজে যারা নীতি, নিয়ম মেনে, সহজপথে, সুবিধার জন্য জীবন কাটিয়ে তাদের বিরোধিতা করতে বর্বর হয়ে ওঠে সে। ব্যক্তিগত হতাশা থেকে Altruistic Suicide নয়, বরং নিয়মের বিরুদ্ধে বীরেশ্বরের এই লড়াইতে আত্মা ও শরীরের বিচ্ছিন্নতাই স্বাভাবিক হয়ে উঠল।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে এভাবেই নিয়তি বা সামাজিক প্রশ্নের মুখে চরিত্রেরা বারবার আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। তাঁর রাম, সিদ্ধার্থ বা বীরেশ্বর বাঁচার জন্য লড়াই করে না বরং যেন কোনো এক প্রবল শক্তির মুখে পরাজিত হয়ে আত্মহননের পথটিই বেছে নিতে বাধ্য হয়।

৪.৫ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

কল্লোলের লেখক বুদ্ধদেব বসু, কল্লোলের লেখকদের রচনা বিষয়ে জনপ্রিয় দুটি শব্দবন্ধ, ‘দারিদ্র্যের আস্ফালন’ বা ‘ লালসার অসংযম দিয়ে’ শুধুমাত্র বেঁধে ফেলা যাবে না তাঁর উপন্যাসকে । যদিও বারবার অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে তাঁর গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস। তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা প্রায় প্রত্যেকেই যেন তাঁরই মতো আত্মবিচ্ছিন্ন, ভবঘুরে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রবক্তা ও লড়াকু নেতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি। ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি একদিকে যেমন তাঁর লেখাকে প্রভাবিত করেছে, তেমন এই

প্রভাবের জন্য সমালোচিতও হয়েছেন তিনি। তাঁর লেখা একদিকে যেমন জনপ্রিয় হয়েছে তেমনিই সমালোচিত হয়েছে বারবার এর বিষয়বস্তু।

৪.৫.১ *সাড়া* : জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা

বুদ্ধদেবের প্রথম উপন্যাস 'সাড়া' যখন প্রগতি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন "সাড়া চিহ্নিত হয়েছিল 'অশ্লীলতা'র দুঃসহ নিদর্শন রূপে। কেউ এতে ইডিপাস এষণা আবিষ্কার করেছিলেন, কেউ বা অজাচার ; উপন্যাসের প্রারম্ভে বর্ণিত স্বপ্নটির একটি লোমহর্ষক ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা পাঠ করে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম, মনে পড়ে।" [xxiii] লেখক পরবর্তী কালে উপন্যাসের নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় যখন এই কথা বলেন তখন নিজেই মনে করেন যে এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের 'বিদেহ এবং নির্বস্তুক' মনে হতে পারে।

সাগরের জীবনের এই কাহিনীতে(১৯৩০) তার মায়ের মৃত্যু,কৈশোরের সঙ্গী লক্ষ্মীর হঠাত্ চলে যাওয়া,পত্রলেখার ষড়যন্ত্র কিংবা সত্যবান ও নির্মলার কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত যে কতটা প্রভাব ফেলে গেছে তা বোঝা যায় কাহিনীর একদম শেষ অংশে এসে। পত্রলেখার থেকে আঘাত পেয়ে দেশের বাড়িতে ফিরে বিষাদগ্রস্ত ও অবসর যাপনে ক্লান্ত সাগর মণিমালাকে বিয়ে করলেও সে কখনোই তাকে মায়েমত নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিতে পারে নি,অন্যদিকে কলকাতায় ফিরে কারখানার কাজে ও সত্যবান নির্মলার সাহচর্যে তার সময় কেটে গেলেও সেই জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হওয়ায়। একদিকে সত্যবানদের কলকাতা ত্যাগের সম্ভাবনা ,অন্যদিকে কৈশোরের সাথী লক্ষ্মীকে ফিরে পেয়েও তার আবার চলে যাওয়ার সম্ভাবনা, সব মিলিয়ে যেন আসল আমিকে খুঁজে পায় সাগর। তার চোখের অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে সত্যবানদেরও। প্রেমের আনন্দকে প্রথমবার এমন করে অনুভব করে সে ঠিক করে যে সে আর ঘুমোবে না।

আর তাই কাহিনীর শেষে যখন ছাতের কার্নিশ থেকে তার দেহ নিচে এসে পড়ে তাকে লেখক যতই ঘুমিয়ে পড়া বলে আড়াল করতে চান,পাঠকের চোখে তা যে আত্মহত্যা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার এই আত্মহননের পেছনে ছিল হয়ত কিছুটা উন্মাদনা,কিছুটা মোহ কিন্তু আসলে ছিল স্পষ্টভাবে বুঝে যাওয়া আগামী একাকিত্বের ভয়।

৪.৫.২ *নির্জন সাক্ষর* : প্রথাগত জীবনের ক্লান্তি

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সোমেনের বাহ্যিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে *সাড়া* উপন্যাসের সাগরের সংকটের খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অধ্যাপনার পয়সায় সংসার চালাতে অক্ষম সোমেন বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ নিলে তার লেখার জগত্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সে। স্ত্রী সন্তান নিয়ে চলা প্রথাগত জীবনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল কি সে? কলকাতায় মালতি সেনের কাছে সাময়িক শান্তি খুজতে গিয়েও যন্ত্রণা নিয়েই ফিরেছিল সে। এই উপন্যাসে জীবনানন্দের ছবি দেখতে চেয়েছেন অনেকে। তাঁর এই নামে একটি কবিতাও আছে। মালতি সেনের ভালোবাসা সোমেনকে সেই আশ্রয় দিতে পারে নি। শেষে কবিতা তাকে ছেড়ে যাওয়ার যে হাহাকার তা পাঠককে স্তব্ধ করে। সোমেন বলে – "... কথা, কবিতা, আমার প্রেম, আমার স্বাস্থ্য, আমার শুদ্ধতা, তুমি তো এখনো আমাকে ছেড়ে যাওনি, কিন্তু আমি কি আর কোনোদিন তোমাকে ঘরে আনতে পারবো ?"[xxiv] এরপরই ঘরে ফিরে বিষের শিশি গলায় ঢেলে দেয় সে, যদিও তার এই মৃত্যুর পেছনে বাঁচার আশাও ছিল। বিষপানের মুহূর্তেও সে আশা করেছে স্ত্রী মীরা যদি হঠাত্ এসে পড়তো বা সন্তান যদি একবার বাবা বলে ডেকে উঠত হয়ত জীবনে ফিরে আসত সে ।

৪.৬ *'আত্মহত্যাকে অস্বীকার*: বিভূতিভূষণ (১৮৯৪-১৯৫০)

বিভূতিভূষণের ভাবনায় আধ্যাত্মিকতার যে প্রভাব আছে তার ফলে চলমান সক্রিয় জীবন্ত সমাজের সঙ্গে তাঁর একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। তাই জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত পরিণতি হিসাবে 'আত্মহত্যা' তাঁর উপন্যাসে স্থান পায় না। অপর্ণার মৃত্যু, বাল্যসঙ্গিনী লীলার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা সত্ত্বেও অপুর মধ্যে কোনো জীবন-বিরোধী ভাবনা তৈরি হয়না। এপ্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের মনোভাব বুঝতে আমরা 'অপরাজিত'-এর একটি বক্তব্যের দিকে নজর দিই –

"কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গাদিনি – জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার সে কি অপরূপ অভিযান – শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে, ... এই সবটা লইয়া সে আসল বৃহত্তর জীবন-পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্রাংশে মাত্র।" [xxv]

সেই শাশ্বত জগতের প্রতি আস্থাবোধ থেকেই বিভূতিভূষণ আত্মহননের মতো রুক্ষ বাস্তবতা থেকে খানিকটা দূর দিয়ে চলেন।

৪.৭ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)

তারাশঙ্করের উপন্যাসে তিরিশের দশকের যুগলক্ষণ ফুটে উঠেছে। ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হবে, এই জাতীয়তাবাদী আশা মধ্যবিত্তের মন থেকে তখনো দূরীভূত হয় নি। পাশাপাশি ১৯05 পরবর্তী সময়ে দেশের মানুষকে, প্রকৃতিকে চেনার যে বাসনা তৈরি হয়েছিল তা লেখকের উপন্যাসে উঠে এসেছে। বীরভূম বাঁকুড়ার রুক্ষ প্রান্তরের কাহিনী তাঁর উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য। কৃষিনির্ভর সংস্কৃতি, গ্রামজীবন ও নগর জীবনের আকর্ষণের দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাসে বারবার ফিরে এসেছে। লোকজীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড়

পরিচয়ের কাহিনী উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। সমস্ত কিছুর মধ্যে এক দ্বন্দ্বের রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের দ্বন্দ্ব, ভালো মন্দের দ্বন্দ্ব এবং মিথ ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব তাঁর লেখায় ফিরে ফিরে এসেছে। নায়ক চরিত্রের কল্পনাতে তারাশঙ্কর খানিকটা সাবেকি, তাঁর উপন্যাসের নায়ক সর্বদাই প্রাচীন সমাজের উত্তরাধিকারী, করালীরা যেন সেই নায়কের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এক প্রতিস্পর্ধী চরিত্র মাত্র। কোন স্বপ্নালু জগত্ নয় বরং অর্থনীতি, রাজনীতির কঠোর বাস্তবের কথা বললেন তিনি। তাঁর উপন্যাসের ইতিহাস বহুক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ইতিহাস। এমনকি বহু উপন্যাসে প্রকৃতি, গ্রাম , নদীর কাহিনীর মধ্যে তিনি যে বারবার নানা মিথকে স্থাপন করেছেন ও পরে সেই মিথকে ভেঙ্গেই জীবনের এক অমোঘ সত্যকে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছেন তার প্রমাণ *নাগিনী কন্যার কাহিনী বা হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* - র মত উপন্যাস।

৪.৭.১ *পাষাণপুরী* : আত্মহত্যা যা ছাপ ফেলে যায়

পাষাণপুরী (১৯৩৩) হল কারাবন্দী হাজতী আসামীদের গল্প, চোর,ডাকাত,খুনী,জেনানী আসামীর কাহিনী। সত্যাগ্রহীদের দশ নম্বর ঘরের নরু এখনও সমস্ত কিছুকে নিস্পৃহভাবে দেখতে শেখেনি। সিপাহী যখন এক বুড়া কয়েদীকে সামান্য কিছু সময়, গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য নিজের কোমরের চামড়ার পেটি দিয়ে আঘাত করে সে ক্রুদ্ধ হয়। বুড়া কয়েদীর দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জলের জন্য বুড়ো নিজের অদৃষ্টকে দায়ী করলেও নরু সঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করে যে পাপ -পুণ্যের একটা কল্পিত রেখা টেনে মানুষকে আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে ? এরপর হঠাৎই জানা যায় সাজাপ্রাপ্ত নরুর ঠাঁই হয়েছে দশ নম্বর ঘরের পরিবর্তে পাঁচ নম্বর সেলে কারণ সে অনশনব্রত নিয়ে আহার পরিত্যাগ করেছে। ডেপুটি জেলার,সুপারিডেন্ট বহুবার অনুরোধ করেছে,সিপাহীরা তাকে বোকা

ভেবে বোঝাতে গেছে যে এতে কোন লাভ নেই,তার জীবন যাবে,কিন্তু দুনিয়ার এই নিয়ম।

এরই মধ্যে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা নরুর এক ছবি আঁকেন লেখক -"... যেন কোন সুদক্ষ চিত্রকর তুলিকার পর তুলিকা চালাইয়া পটভূমির উপর একটি মৃত্যুর চিত্র আঁকিয়া চলিয়াছে --পাণ্ডুর, স্থির, জীর্ণ সে রূপ,কঙ্কালসার মুখখানি, কিন্তু অপূর্ব আনন্দের জ্যোতিতে উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত। "[xxvi]

কারাগারের পুরনো পরিবেশ ফিরে পেতে সকলেই হয়তো চেয়েছিল যে নরু যেন হেরে যায়,খেতে যেন সে বাধ্য হয় কিন্তু নরুর এই স্বেচ্ছামৃত্যুতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও যেন তারা মরণকে জয় করে।

৪.৭.২ *তামস-তপস্যা* : আত্মহত্যা চরিত্রের বাঁকবদলের দ্যোতক

এই কাহিনীর (১৯৪৮) মূল চরিত্র গ্রামের গৃহস্থ পরিবারের পানুর। বিনা দোষে মার খাওয়ার আতঙ্কে পানু ছেলেবেলায় ঘর ছেড়ে আর ফিরতে পারে না। তার জীবনের একটা বড় অংশ কাটে যাযাবর, হা-ঘরেদের সঙ্গে। এই সমাজেই জোটে তার প্রথম সঙ্গিনী, রুকণী, অন্যের ঘর ভেঙে পানুর সঙ্গে এসে ঘর বাঁধে সে,পানুর যত্নে গড়ে তোলা সংসার দেখে মুগ্ধ রুকণী কথা দেয় -"দেখিস তুই, রুকণী তোর সঙ্গে কখনও বেইমানী করবে না।"[xxvii] কিন্তু কিছু মাস যেতে না যেতেই অন্য যুবকের প্রতি আকৃষ্ট হল সে। সর্দার তার বিচার করে তার মাথা মুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দিল,তাকে যেন আর কেউ বিয়ে না করতে পারে সে আদেশও দিল। কিন্তু মাথা মুড়োতে নারাজ রুকণীকে জোর করে মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হল। পরদিন দেখা গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছে রুকণী। রুকণী কিন্তু ভালবেসেছিল পানুকে। পরে বারবার তার জন্য চোখের জল

ফেলতে ফেলতে পানু ভেবেছে ,যে রুকণী চিরকাল কেবলমাত্র পানুকে ভালোবাসতে পারেনি, এই তার অপরাধ। আর তেজী রুকণী অপমান মেনে নিতে পারে নি, সকলে জোর করে তার মাথা মুড়িয়ে দিলে তার প্রতিবাদ স্বরূপ আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে সে।

এই উপন্যাসের এই একটি আত্মহত্যা পানুকে সারাজীবনের মত বদলে দিয়েছিল,তার জীবনের সকল নারীই বিশ্বাসঘাতক এমনটাই মনে করত সে,আর সকলেই তাকে ছেড়ে চলে যায় এমনটাই ছিল তার বিশ্বাস। যশোদা তার অধিকারবোধ ছেড়ে দিতে না পেরে,গর্ভবতী অবস্থায় ঘর ছাড়ে,রাজি বা রাজুও একসময় ছেড়ে যায় তাকে অন্য পুরুষের আকর্ষণে। যদিও যাওয়ার আগে তার আরেকটা বিয়ে দিয়ে গিয়েছিল রাজু। রাজুকে আবার ফিরিয়ে আনে পানু একসময়,আমরা বুঝতে পারি রাজুর আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারে না পানু,তার সন্তানের মা,নতুন বৌটির চেয়ে রাজুর ভূমিকা অনেক অনেক বেশি তার জীবনে।কিন্তু এই রাজুকেও সন্দেহ করে সে,বাবুকে নিয়ে,সন্ন্যাসীকে নিয়ে সন্দেহ জমে উঠেছে তার মাথায়। পানুর রাগ,পানুর মনে মায়া মমতার যে অভাব,সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল রাজু তাই ঘরে আগুন দিয়ে পুড়ে মরেছে,পানুকে আটকাতে চেয়েছে সে। পানু কিন্তু সত্যিই বদলেছে, বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে,নমোনারায়ণ বাবার কাছে দীক্ষা নিয়েছে সে। এই উপন্যাসের দুটি আত্মহত্যা যেন আসলে পানুর জীবনের দুটি জন্মকে তথা ভিন্ন অধ্যায়কে সূচিত করেছে।

৪.৭.৩ *আগুন* : ঈশ্বরলাভের মোহে আত্মাহুতি

আগুন (১৯৩৭) উপন্যাসের কথক ও দর্শক নরু। তাকে ঘিরে যে গল্পগুলি আবর্তিত হয় তার অন্যতম হল চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথ ও তার পরিবারের কাহিনী। নিশানাথ তার পরিবারের প্রতি সমস্ত দায়িত্ববোধকে এড়িয়ে ঈশ্বর সন্ধান করতে চেয়েছিল। স্ত্রী একবার

তার মনকে ঘরের প্রতি আকৃষ্ট করলেও ছয় মাস পরে দ্বিগুণবেগে ছিটকে গিয়েছিল সে সংসারের মায়ার বিপরীতে। তার সংসারের করুণ অবস্থা দেখে পাঠকের মন তার প্রতি বিরূপ হলেও তার ইসবরকে পাওয়ার এই অনিবার চাহিদা মিথ্যে বলে মনে হয় না কখনো। বারংবার গৃহত্যাগী নিশানাথ শেষে তার সমস্ত মোহ ত্যাগ করতে চেয়েছে,স্ত্রীর থেকে তাকে স্পর্শ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে সে সব টান ভুলতে চেয়েছে,কিন্তু তবুও বিয়ের পর নরু আর নিরুকে একবার একসঙ্গে দেখার বাসনা ত্যাগ করতে পারেনি। ক্রমাগত নিরম্বু অনশনে মত্ত হয়ে সে ঈশ্বরের দেখা পেতে চেয়েছে,গ্রামবাসী তার এই ক্রম আত্মহননকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছে। ক্ষেত্রগুপ্তের কথা ধার করে বলা যায় -

"নিশানাথের অনশনে আত্মাহুতি এবং গ্রামবাসীদের ভক্তির উচ্ছ্বাসে পাঠকের মন বিদ্রুপে বক্র হয়ে উঠতে চায় । কিন্তু এ সব সত্ত্বেও নিশানাথের মধ্য দিয়ে নিশানাথকে দেখবার পথটি রুদ্ধ করে দিতে চাননি লেখক। আমি 'জীবনে' কাম্যধন চাই - ভগবানকে চাই, শুধু ভগবানকে আর কিছু নয়, তার জন্য 'জীবন' দিতে পারি। নিশানাথের চরিত্রভেদী এই প্রত্যয় পাঠককে তাড়া করে।"[xxviii]

৪.৭.৪ *নাগিনী কন্যার কাহিনী* : আত্মহনন,সামাজিক অবদমনের ফলশ্রুতি

এই উপন্যাসটি (১৯৫১)সেই অর্থে আধুনিক জীবনযাত্রা তথা সমকালীন সমাজ থেকে দূরে থাকা, বিশিষ্ট এক জনগোষ্ঠীর কাহিনী। ধন্বন্তরির শিষ্য বিষবেদের আবির্ভাব হয় মনসামঙ্গলের কাহিনী থেকেই। চাঁদের অভিশাপে দেশ ঘর খুইয়ে আজ তারা বহু প্রজন্ম জুড়ে হিজল বিলের অধিবাসী। তাদের নানা স্বপনকে, বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছে তারা আজও । এক মানুষীকে নাগিনী কন্যা রূপে প্রতিষ্ঠা করে তারা। তাদের এই স্বপ্নকে মিথ বলে ভাবাই যায়। কিন্তু উপন্যাস এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে “ বহুকালাগত সংস্কার ও জৈব ধর্মের তথা নারীর স্বাভাবিকী বৃত্তির দ্বন্দ্বের ভিতরে যত স্পষ্ট হ’তে

লাগল যে মানুষী নাগিনী কন্যা হয় না।তত ব্যালাড-প্যাটার্ন খসে যেতে লাগল, পট ও ব্যক্তির সংঘাতের ভিতর দিয়ে ঔপন্যাসিক লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল।”[xxix]

সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে একে পড়তে খানিকটা অসুবিধা হলেও আমরা খুঁজব যে কিভাবে অতীতাশ্রয়ী একটা সংস্কার বা বিশ্বাস আসলে এই জনগোষ্ঠীর দুই নারীকে কোন আশ্রয় দিতে পারছে না। শবলা বড় বাড়ির বিলাসী যুবককে কামনা লোলুপ করে তুলেও তার বাহুডোরে বাঁধা পড়ে না অথচ শিবরামকেও সে মোহগ্রস্ত করতে চায়, শিবরাম তার সঙ্গে ভাইবোনের সম্পর্ক পাতিয়ে জটিলতা কমায় এবং তার কাছে প্রশ্রয় পেয়েই হয়ত সে আত্মহত্যার ও গর্ভপাতের ওষুধ চায়। তার প্রেমিকের কথা গোপন থেকে যায় সমগ্র উপন্যাস জুড়েই। কিন্তু মহাদেবের সঙ্গে যে টানাপোড়েন চলে সারা উপন্যাস জুড়ে তার সমাপ্তি ঘটে অদ্ভুত ভাবে। নেশাগ্রস্ত মহাদেব তাকে নিজের প্রেমিকা ভেবে অন্ধকারে তার সঙ্গে মিলিত হয়, তাকে পাপে আচ্ছন্ন করে তারপর বিষ কাঁটা দিয়ে তাকে হত্যা করে, নগ্ন শবলা নদীর কালো জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। নিজের প্রতিহিংসার পাশাপাশি তার কামনার দমনের ফলশ্রুতি যেন এই ঘটনা। প্রেমিকের প্রতি তার যে আসক্তি ও তাকে নিয়ে পালাতে না পারার যে সংস্কার তা অনুমান করা যায়। মহাদেব হত্যার মধ্যে দিয়ে এই সব সংস্কারের থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে সে, তার এই নাগিনী জীবন ছেড়ে যেতে যাওয়ার অনুষঙ্গই লুকিয়ে আছে নগ্ন দেহে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যে।

কাহিনীর অন্য অংশটি আবর্তিত হয় পিঙলাকে ঘিরে। পিঙলার প্রতি শিরবেদে গঙ্গারামের আকর্ষণ এবং নাগু ঠাকুর ও পিঙলার পরস্পরমুখী ভালোবাসা- এখান থেকেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘনিয়ে এসেছে। নাগিনী মেয়ের যৌন সংযমের যে মিথ তা বারবার ভেঙে দিতে চেয়েছেন লেখক। শবলা গর্ভপাতের ওষুধ চেয়েছিল আর নাগু ঠাকুরের প্রণয় প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে কামনার অবদমন ঘটাতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক অবদমনের শিকার হয় পিঙলা।

সীতার মত শঙ্খচূড়ের সম্মুখে পরীক্ষা দিতে হয় তাকে। কামনা রূপী চাঁপা ফুলের গন্ধ যেন তাকে ক্রমশ অস্থির করে তুলছিল,এর পাশাপাশি কামুক গঙ্গারামের ক্রমাগত চক্রান্তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে শবলা। সে ভয় পায় যে তার এই জাগ্রত কামনার কথা নিশ্চয় জেনে গেছে লোভী গঙ্গারাম। আর তাই বন্ধ ঘরে, নাগু ঠাকুরের আনা শঙ্খচূড়ের সামনে বুক পেতে দেয় সে। শবলার মত অন্যকে হত্যা করে নয়,আত্মহননের মধ্যে দিয়েই নাগিনী জন্মের এই ট্রাজেডি থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে সে। সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতার কাহিনী হলেও এই কাহিনী আসলে সামাজিক নীতি নিয়মে জর্জরিত আধুনিক মানুষের বাধাপ্রাপ্ত বাসনা ও আত্মহননের কাহিনী। এই ধরণের আত্মহত্যাকে Durkheim , Fatalistic Suicide বলেন।

৪.৭.৫ *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* : প্রেমের দর্প চূর্ণ

হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় (১৯৪৭) বাঁশবাদীর কাহারেরা কোপাই নদীর বাঁকে রয়ে গেছে প্রান্তিক জীবনযাপন নিয়ে। এই গ্রাম আধুনিকতার থেকে অনেক দূরবর্তী। বনওয়ারি ও করালীকে কেন্দ্র করে এখানে লড়াই তৈরি হয়েছে,নতুন পুরাতনের লড়াই,প্রাচীন নিশ্বাস ও আধুনিক যুক্তির লড়াই। চন্দনপুরের স্টেশনে কাজ করা করালী বহু সংস্কারের বিরুদ্ধে গিয়ে গ্রামের মানুষের ভালো করতে চেয়েছে। বাঁশবাদির জঙ্গলে যে কালারুদ্দুর মিথ ছিল তা ভেঙে যায় করালীর হাতে। সাপকে মারার মধ্যে দিয়েই অতীতাশ্রয়ী জীবনযাত্রার ভাঙ্গন শুরু হয় যেন। তার এই ঔদ্ধত্য মানতে নারাজ বনওয়ারি। বাবুদের বিরুদ্ধে কাহারদের হয়ে লড়াই করে বারবার নিন্দার মুখে পড়েছে করালী। অন্যদিকে রুগ্ন নয়ানের বৌ পাখির সঙ্গে তার উদ্দাম প্রেম। সমাজের নৈতিকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তারা আবার বিয়ে করে ঘর বেঁধেছিল। তারই মধ্যে একদিকে দোতলা কোঠাবাড়ি তৈরি করে আর বনওয়ারির যুবতী বৌ সুবাসীকে কেড়ে এনে একরকম বিজয়ভাব অনুভব

করতে চেয়েছে করালী। কিন্তু সুবাসীর প্রতি করালীর এই আকর্ষণ মেনে নিতে পারেনি পাখি। স্বামীর ঘর ছেড়ে ভালোবেসে করালীর বাড়িতে চলে আসা পাখির মনে প্রেমের যে অধিকারবোধ জেগে উঠেছিল তারই পরিণতি পাখির আত্মহনন। ক্ষেত্রগুপ্তের কথা ধার করে নিয়ে বলতে পারি,

"...পাখিই বরং ওদের সমাজে একক, সে তার ভালোবাসার অপমান সয় নি। করালীর মতোই দর্পিত চরিত্র তার। করালীকে দা দিয়ে মারতে চাইল, জখম করল তারপর পালিয়ে এসে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ল।" [xxx]

তার এই আত্মহত্যার পর করালীকে আর তেমন খুঁজে যাওয়া যায় না, নসুবালাও কেঁদে ভাসায় পাখির আত্মহত্যার পর। তার স্মৃতিচারণে প্রেমের দর্পে স্বামীর ঘর ভেঙে আসা পাখির দর্প ভাঙার দুঃখ আরও গভীরভাবে ধরা পড়েছে পাঠকের চোখে।

৪.৮ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

বঙ্কিমচন্দ্রের *কপালকুণ্ডলা*-তে আত্মহত্যার যে স্বাভাবিক চিত্রটি ফুটে উঠেছিল তার অন্যরকম একটি রূপ দেখি জগদীশ গুপ্তের অসাধু সিদ্ধার্থ বা রতি বিরতি উপন্যাসে। কিন্তু মানিকের হাতেই তা সম্পূর্ণতা পেল। তাঁর উপন্যাস, ছোটো গল্পে আধুনিকের 'আত্মহত্যার অধিকার' বিষয়ে যে ঘোষণা তিনি করলেন তা পাঠকদের বিস্মিত করল। এর আগে নানা উপন্যাসে আত্মহত্যা এসেছে ঘটনার সূত্রে, উপন্যাসের স্বস্তিদায়ক পরিণতির স্বার্থে, কিংবা এসেছে নেহাত লেখকের মূল্যবোধের পরিচয় নিয়ে। কিন্তু এই প্রথম বাঙালি পাঠক দেখল যে আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে কোনো প্লট বা কাহিনি তৈরি হতে পারে। আত্মহত্যাকারীর প্রতি দয়া, মায়া, সহানুভূতির বদলে তৈরি হল এক অভাবিত প্রশ্ন। কেন? উপন্যাস আমাদের আলোচ্য বিষয় হলেও আত্মহত্যা প্রসঙ্গে তাঁর

যে দুটি গল্পের উল্লেখ না করলেই নয় সেগুলি হল – *আত্মহত্যার অধিকার* ও *গলায় দড়ির কেন। আত্মহত্যার অধিকার* গল্পে সরকারের বড়োছেলের পিসে যখন বলে যে ডাক্তারেরা তাকে সরাতে যদি নাই পারে তাহলে মরার ওষুধ দিলেই পারে।এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আসলে লেখক যেন বলে উঠতে চান যে সমাজ যদি মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে আত্মহত্যার অধিকার কেড়ে নেওয়ার কোন অধিকারও তার নেই।

৪.৮.১ *দিবারাত্রির কাব্য* : প্রেমকে সম্পূর্ণতা দিতে ব্যক্তি 'আমি'র মৃত্যু?

মানিকের প্রথম পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যে সকল সমস্যার বিবরণ পাওয়া যায় তার পেছনে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রভাব খুঁজতে চেয়েছেন অনেকে। যদিও এ বিষয়ে কোন পোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম উপন্যাসেই (*দিবারাত্রির কাব্য,* ১৯৩৪) বহুবার আসে 'আত্মহত্যা'র কথা কিন্তু সেই আত্মহত্যার একটি কোনো বাস্তব কারণ খুঁজে পায় না পাঠক। হেরম্বের স্ত্রী কেন আত্মহত্যা করেছিল তা যেমন বুঝতে পারে না সুপ্রিয়া, কিংবা বলা ভালো ভুল বোঝে ঠিক তেমনই পাঠকও খুঁজতে থাকে উমার গলায় দড়ি দেওয়ার কারণ। উপন্যাসের শেষে আনন্দ যখন 'পরিনৃত্য' নাচ শুরু করল, কাপড় জামা সব খুলে আগুনে সমর্পন করল তখন তার এই নাচ হেরম্ব কল্পনাও করে উঠতে পারে না। নিজের প্রেমের বয়স গুণতে থাকা আনন্দর মনে আসলে ছিল যে প্রেম হয়ত বড়ো জোর একমাস বাঁচে। হেরম্ব তাকে এও বুঝিয়েছিল যে রোমিও-জুলিয়েটের ট্র্যাজেডি তাদের মৃত্যুতে নয় বরং প্রেমের অসমাপ্তিতে এবং তাদের প্রেমের সম্পূর্ণ বিকাশের আগেই তার সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের বিষয়ে অন্যের দুঃখবোধ, আনন্দ কিন্তু নিজের ভালোবাসা মরে যাওয়ার ঘটনা টের পেয়ে অসহ্য কষ্ট পেয়েছে। আর তাই নাচতে নাচতে 'আগুনের আরও নিকটে সে থমকে দাঁড়াল, আগুন

এখন তার মাথা ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠেছে, আনন্দকেও মনে হচ্ছে আগুনের শিখা। পরক্ষণে আনন্দ কাত হয়ে সেই বিপুল যজ্ঞানলে ঢলে পড়ল।'[xxxi] তখন হেরম্বর মনে হয় যে আনন্দের মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই, বাকি ছিল তার চিতায় ওঠার পালা।

৪.৮.২ *পুতুলনাচের ইতিকথা* : ইচ্ছামৃত্যুর আড়ালে পরাজয়ের গোপন গ্লানি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে *পুতুলনাচের ইতিকথা*-য় (১৯৩৬) যাদব পণ্ডিত ও তার স্ত্রী পাগলদিদির আত্মহত্যাটির গুরুত্ব অপরিসীম। দশগ্রামের মানুষের কাছে শুধু ছোটো হয়ে যাওয়ার ভয়ে মুখ ফসকে বলে ফেলা কথাটির এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ – এ সত্যি মানবমনের এক অদ্ভুত জটিলতার প্রকাশ ঘটায়। এ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি দেখা যাক–

"যাদব যে জন্য আত্মহত্যা করলে, সে স্পষ্ট জানে তা মিথ্যে; কোনো মোহ তার ছিলো না, এমনকি তার সজ্ঞান চিন্তা কখনো ভুলেও এমন ধারণা প্রকাশ করেনি যে এর দ্বারা শশীকে দলে টানা যাবে; তবু মুক্তির পথ থাকা সত্ত্বেও সে মেনে নিলে নাস্তি অন্ধকার"[xxxii]

সূর্যবিজ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছামৃত্যুর দিন বিষয়ে ঘোষণা করে যখন রথের দিন আফিমের সমস্ত লক্ষণ নিয়ে যাদব পণ্ডিত ও পাগলদিদি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে তখন এই আত্মহননের ঘটনা শশীকে এতটাই প্রভাবিত করে যে সে কখনোই কারো কাছে তাদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বলে উঠতে পারেনা। নিয়মবহির্ভূত এই দুটি মানুষের আত্মহত্যাকে সম্মান জানাতেই শশীর এই নিশ্চুপ থাকা। আর যাদব ও তার স্ত্রীর জন্য পড়ে থাকে শুধুই শূন্যতা, নিজের অবিশ্বাস, মিথ্যাকে কেন্দ্র করে যে আত্মহত্যার পথ তারা বেছে নেয় তাতে

একদিকে যেমন মৃত্যু তাদের ইহলোকের জীবনের সমাপ্তি ঘটায় তেমনই মৃত্যু মুহূর্তে যে তাদের নিষ্কৃতি বিষয়ে কোনো বিশ্বাস ছিল না তাও বুঝিয়ে দেয়।

এই অত্মহত্যার সমতুল্য কোন মৃত্যু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কেবল আত্মমহিমা, আত্মগরিমা প্রচারের লোভে দুটি মানুষ যখন এই নিদারুণ আত্মহত্যার মুখোমুখি হয় পাঠকের বুদ্ধিতে কুলোয় না। যে ঈশ্বরের কথা তারা বলেন সেই ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাসই তাদের আত্মহননের দিকে ঠেলে দিল। সুতরাং মৃত্যকালে ঈশ্বরবিশ্বাস টুকুও তাদের সঙ্গ দিলনা।কিন্তু এই আত্মহত্যা মধ্যে দিয়েই কিংবদন্তী হয়ে বেঁচে থাকার যে লোভের কথা লেখক বলেছেন তা দেখে শিউরে উঠতে হয়। শশী এই আত্মহননকে প্রত্যক্ষ করে যে মনোজগতের খোঁজ পেল তা কি সে আর ভুলতে পারবে কোনদিন?

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের অন্য একটি উপন্যাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রাবন্ধিক অরিন্দম চক্রবর্তী। ‘মরিবার হ’ল তার সাধ’ প্রবন্ধে তিনি মানিকের ‘জীবনের জটিলতা’ উপন্যাসটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন । এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আত্মহত্যা প্রসঙ্গে একটি অতি জটিল ও দার্শনিক ভাবনা তুলে ধরেছেন -

“যতখানি বেদনার সঙ্গে নারী মানুষকে পৃথিবীতে আনে, মানুষ বোধ হয় ঠিক ততখানি অনিচ্ছার সঙ্গেই পৃথিবীতে আসে। পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়াটাকে মানুষ তাই এত ডরায়। অনিচ্ছায় পাওয়া পথিকবৃত্তি মৃত্যুভয়েই ধন্য হইয়া গিয়াছে ।ছেলেটা বাস চাপা পড়িয়া মরিয়া তাই জানিয়া গেল ছোটখাটো ব্যর্থতায় জীবনটা ভারাক্রান্ত হইলেও, শক্তি তার কম নয়; প্রকৃতির সবচেয়ে প্রবল বন্ধনকে সে জয় করিয়াছে; না-মরিবার লাখ লাখ সুযোগের একটা গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করে নাই ।”[xxxiii] উপন্যাসের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শুরুর এই অংশটি তুলে প্রাবন্ধিক আত্মহত্যাকারীর মনের যে অবস্থার প্রতি নির্দেশ করতে চেয়েছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আত্মহত্যার পেছনে অনেক সময়েই আসলে

বাঁচতে চাওয়ার যে বাসনা থাকে, এই বক্তব্যটি তাকে নস্যাত্‌ করে । সচেতন মানুষের মৃত্যুকে সচতনভাবে বেছে নেওয়ার পক্ষে ওকালতি করে এই বক্তব্যটি ।

৪.৯ মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)

মনোজ বসুর উপন্যাসে প্রেম ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে।তিনি যে সময় উপন্যাস লিখছেন তখন গোটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দ্বারা শোষিত হচ্ছে মানুষ, স্বাধীনতার আশা তখনও বেঁচে রয়েছে মানুষের মনে। লেখক যে বিপ্লবের গল্প শোনান তাতেও এই আশাবাদের লক্ষণ রয়েছে। বাইরের ঘটনা তাঁর লেখক সত্তাকে বিচলিত করে, তিনি কলম ধরেন অবিচারের প্রতিবাদ করতে। *ভুলি নাই* উপন্যাসটিও শেষ হচ্ছে এই আশা নিয়ে যে দেশে শান্তি আসবে, দেশের শ্রী ফিরবে।

৪.৯.১ ভুলি নাই : আত্মোৎসর্গের গরিমা

ভুলি নাই (১৯৪৩) উপন্যাসটি রচিত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে। কুন্তল দা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তাঁর বিপ্লবের ভাবনা, রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ছোট বড় নানা চরিত্রের ছবি আঁকেন লেখক। শুরুতেই জানা যায় যে কুন্তল দা মরার চেষ্টা করেন হাজতে,যাতে অত্যাচারে দলের কথা ফাঁস না করে দিতে হয়, এই স্বীকারোক্তির প্রসঙ্গ ধরে আসে সরোজ পাকড়াশি নামক এক চরিত্রের কথা, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধরা পড়লে বারবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হত সে কী জানে? ‘একদিন সরোজ বলল, শুনবেন না দেখবেন?......একটানে সরোজ ব্যান্ডেজ ছিঁড়ে ফেলে। রক্ত তীরবেগে ছুটেছে। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল, চেতনা আর ফেরে নি।” [xxxiv]

দেশের হয়ে কুন্তল দার সঙ্গে কাজ করতে চাইত রাণী অর্থাৎ উমারাণী, কুন্তলদা সেই বাসনাকে ছেলেমানুষি মনে ক’রে, বিপদের আশঙ্কায় কখনোই সেভাবে কানে না

তুললেও, একদিন পুলিশের ভয়ে লুকানো অস্ত্র তুলে দিতে বাধ্য হন তারই হাতে, অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়লে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে মাল সমেত ঝাঁপ মারে ভৈরব নদীতে। যদিও মৃত্যু তার হয়নি,কিন্তু আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল সে, এমনকি পরে দেখব, দলের কাগজ পত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে বিয়ে করে অনন্তকে এবং সেদিন দল বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল যে রাণী ,পরে সে দলকেই বাঁচাতে কেমন করে ধীরে ধীরে মৃত্যুরূপী জীবনকে মেনে নিয়েছে সে,তার এ আত্মত্যাগ,আত্মহননের নামান্তর,আর এতে আত্মোৎসর্গের গরিমা লুকিয়ে আছে।

আনন্দের মত সুন্দর, গুণী যুবকের কথাও আসে এই উপন্যাসে,যে তার কোমল স্বভাব সুন্দর মুখের জন্য বিপ্লবী দলের কাছে উপহাসের পাত্র হত, নিজে নিজে বোমা বাঁধতে গিয়ে তার সেই সুন্দর মুখ পুড়ে গেলে তাই যেন সে খুশিই হয়,আর পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে প্রাণ দিয়ে আনন্দ যেন সেইসব উপহাসের বদলা নেয়, নিজের দেশসেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নিয়ে জীবন উৎসর্গ করে সে।

৪.১০ শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫)

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জীবন, স্ববিরোধ সব মিলিয়ে তিনি সর্বদাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। হাংরি আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো লেখক শক্তির জনপ্রিয়তা মূলত কবি হিসাবেই, প্রথম উপন্যাস *কুয়োতলা* । *লুসি আর্মানীর হৃদয় রহস্য* তেমন জনপ্রিয় উপন্যাস নয়। কিন্তু উপন্যাসটিতে কবি শক্তির যে দ্বিধা, যে ঠিকানাবিহীন জীবন, তার খানিক পরিচয় যেন পাওয়া যায় রাজুর বেহুশ জীবনের বর্ণনায়।

৪.১০.১ *লুসি আর্মানীর হৃদয় রহস্য* : মৃত্যু ভালোবেসে

এই উপন্যাসে (১৯৬৬) লুসি কথকের কাছে রাজুর কাহিনী শুনিয়েছে। শিল্পী রাজুকে মদের নেশার থেকে দূরে সরাতে লুসি নিয়ে আসে সমুদ্রতী রের ঝাউবীথিতে, কিন্তু রাজু যেন মেতে ওঠে সেই সমুদ্র, ঝাউবনের নেশায়। ফেরার কোনো আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সে। শুধু ঝাউবনের থেকে নেমে সমুদ্রের নীল জলের সামনে দুজনে মৌন দাঁড়িয়ে থাকা - এটাই যেন জীবন ভেবে নেয় রাজু। রাজুকে এখানে রেখে দিয়ে একা কলকাতা ফিরে যাওয়ার ভয় দেখায় লুসি। যাওয়ার আগের দিন রাজু হঠাৎ মন পরিবর্তন করে ও লুসিকে জানায় যে সেও ফিরবে তার সঙ্গে। ফিরে গিয়ে তার একজিবিশন আছে, সে চাকরির কথা বলে, ভবিষ্যতের কথা বলে, ঘর সংসার, ছেলেপুলের চিন্তায় তন্ময় হয়ে রাত কাটায় তারা। ক্লান্তিতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে লুসি, রাজু তাকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দেয়। পরদিন যখন ঘুম ভাঙে তার তখন বাড়ির সামনে 'জলে-ডোবা-নীল-পাংশু' রাজুর দেহ নিয়ে হৈ-চৈ। রাজুর এই মৃত্যু প্রসঙ্গে লুসি বলে "রাজুর যে জীবনের এরকমই কোন শেষ তা যেন আমি কল্পনায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। আত্মহত্যা? আত্মহত্যা নয়। কি জানি! এখনো পর্যন্ত আমি কোন কারণ খুঁজে পাই নি। ...হতে পারে - ভয়ে,সংসার সমাজের ভয়! আবার নাও হতে পারে। কিন্তু যেদিক দিয়েই হোক -রাজুর এই মৃত্যুতে ভালোবাসা ছিল- হয় সমুদ্র ভালোবেসে মরেছে রাজু, নয়তো সমুদ্রই রাজুকে ভালোবেসে মেরে ফেলেছে।" [xxxv] রাজুর এই মৃত্যুর কোন কারণ খুঁজে লেখক বা লুসি যেন এই আত্মহত্যাকে কলুষিত করতে চান নি। এই মৃত্যু ভালোবাসার মৃত্যু। অনায়াস এই আত্মহত্যা।

জগদীশ গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু বা মানিক বন্দোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি চরিত্রগুলির আত্মহত্যা প্রসঙ্গে যে স্বভাবিকতার নিদর্শন পাওয়া যায় যত পাঠককে বিস্মিত করে। কেবল

ব্যক্তিগত কোন শোক, অপ্রাপ্তি থেকে অত্মহত্যার পথ বেছে নেয় না তারা। সিদ্ধার্থ, সোমেন, সাগর, রাজু বা আনন্দের মত চরিত্রদের আত্মহত্যাকে লেখক কোন নির্দিষ্ট কারণ দিয়ে বাঁধতে চান নি, মানবেন্দ্রবাবুর উক্তি ধার করা যায়- "... এরা কোনো ব্যক্তিগত হতাশার জন্যও আত্মাহুতি দেয়নি। একটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলো ব'লেই তারা ছিঁড়ে গেল। আত্মা ও শরীরের দ্বন্দ্বেই ঘটলো এত রক্তপাত, যা অসীম পর্যন্ত উঠে গেলো ফিনকি দিয়ে"। [xxxvi]

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উপন্যাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিপ্লব, দেশভাগ পেরিয়ে পাঁচের দশক থেকেই বাংলা উপন্যাসে সামাজিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিপর্যয়ের কাহিনী ঠাঁই করে নিতে থাকলো। কেউ কেউ অসহায় ভাবে সামাজিক প্রতিকূলতার কাছে হার মানল, কেউ গণ আন্দোলনের স্বপ্ন দেখল। দেশবিভাগের ফলে ভিটে মাটি হারা, ছিন্নমূল মানুষেরা জীবিকার অভাবে, স্বপ্নভঙ্গের ব্যথায়, পরিবার পরিজন হারিয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি বিশ্বাস হারাল। জীবন বিষয়ে যে আশা বা আগ্রহের কাহিনী লিখেছিলেন এই শতকের প্রথম দুই দশকের ঔপন্যাসিকেরা, তা আর সম্ভব হল না। এই প্রসঙ্গে সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য তুলে ধরি, - "...উভয় দিয়েই যখন নেতির বোধ প্রবল, তখন সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য আসলে রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যেরই সন্তান ; সামাজিক স্থিরাদর্শহীনতারই ফল।" [xxxvii]

তিনি একথাও বলছেন যে - "বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে সভ্যতার অসুস্থতা ও অসহায়তা উপন্যাসে ব্যক্তিপাত্রের চেতনামুকুরে নানা প্রতিবিম্ব ফেলেছে। ব্যক্তির শারীরিক মানসিক নৈতিক আর্ততা উপন্যাসে ধীরে ধীরে তীব্রতাও পেয়েছে। এতদিনে বাংলা উপন্যাসেও তা মূর্ত হল। এই বিবিক্ততাবোধ বা অনন্বয়ের মৌল প্রেরণা এখানে চঞ্চল

হয়ে উঠল।... একালের নায়ক নিজের বিপন্ন ব্যক্তিসত্তার বিষণ্ণ ধূসরতার দর্পণেই বিশ্বাবলোকন করে।” [xxxviii]

পাঁচের দশক থেকেই দেশে খাদ্য সমস্যা দেখা দিলেও ১৯৬৪ সালের আগে সেভাবে তা ঘিরে কোন গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। আর সত্তর জুড়ে রয়েছে নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস। দেশ জোড়া খাদ্য সংকট,রাজ্যের খাদ্য সংকট,ছাত্র যুবদের অস্তিত্বের সংকট, চরমপন্থী উপায়ে হলেও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বড় কোন বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা, এবং এই নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বামপন্থী দল বিভাজন হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এই নকশাল আন্দোলনের প্রভাব অকল্পনীয়।

৪.১১ নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬- ১৯৭৫)

মানুষ নিয়ে, সম্পর্ক নিয়ে খুব সহজ গদ্যে দুরূহ বিষয় নিয়ে গদ্য লিখেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ফেলে আসা সময়ের জন্য মায়া যেন পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর উপন্যাসে। কল্লোলীয় ভাবনা ও ঔপনিবেশিক শোষণের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা এই কথাসাহিত্যিক ছোট ছোট মুহূর্তের কথা লিখেছেন। সামাজিক আলেখ্য নির্ভর এইসব লেখায় সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যার পাশাপাশি এসেছে সমাজের ভেঙে পড়া নৈতিক বোধের কাহিনীও।

৪.১১.১ *চেনামহল* : সামাজিক নৈতিকতা

ডুর্খেইম যে সামাজিক অ্যানোমির কথা বলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি। মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন বিজু ও প্রীতি একসঙ্গে প্রীতির বিয়ের রাতে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও বিষের শিশির বদলে বিজু একমুঠো ফুল তুলে দিতে চেয়েছিল সেদিন প্রীতিকে। ভিতু বিজু সেদিন নিজেকে শেষ করে

দিলেও প্রীতি কিন্তু খেয়ে উঠতে পারে নি বিষ। বাঙালির জীবনের সব অনুশাসন, ভীতি, নৈতিকতাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে এই দুই চরিত্রের যে পরিণতি ঘটান লেখক তা আমাদের মনে নৈতিকতার ভ্রান্ত ধারণাকে প্রশ্ন করতে বাধ্য করে, কোনটা ঠিক, কোনটা উচিত, কোনটা স্বাভাবিক তা কীভাবে সমাজ নির্ণয় করে দিতে চায় অথচ ব্যর্থ হয় তারই খুব চেনা কাহিনী চেনামহল।

৪.১২ সমরেশ বসু (১৯২৪- ১৯৮৮)

সমরেশ বসু একসময় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পার্টির ভাঙনের সময় থেকে দূরত্ব বাড়ে, পার্টির তরফ থেকে তাঁর নামে যেমন নানা অভিযোগ আসতে থাকে, তিনিও মনে করেন তাঁর স্বাধীন লেখক সত্তার ক্ষেত্রে পার্টির এই হস্তক্ষেপ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। কিন্তু পার্টি ও সমকালীন রাজনীতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন নি তিনি কোনদিনই। তাঁর উপন্যাসে পার্টির চরিত্র, নানা আন্দোলনের কাহিনী স্থান পেয়েছে বারবার। সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনের আগে বাংলায় মন্বন্তর, স্বাধীনতা অংদলন, দেশভাগ বা তেভাগা তেমনভাবে উপন্যাসে স্থান করে নেয় নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে নিয়ে প্রমথনাথ বিশী লিখছেন *বঙ্গভঙ্গ* (১৯৭৬), *আদাব, সাদা ঘোড়া* বা মানিকের *হারাণের নাতজামাই* প্রমুখ গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। *জাগরী, ভুলি নাই* বা *ঢোঁড়াই চরিত মানস* অবশ্যই ব্যতিক্রম। কিন্তু নকশাল আন্দোলনকে লিখিত হল অজস্র গল্প ও উপন্যাস। কেবল সংখ্যা বেশি তাই নয়, এই উপন্যাসগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত জনপ্রিয় হল এবং নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাসগুলির উৎকর্ষ নিয়েও কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪.১২.১ *মহাকালের রথের ঘোড়া* : প্রতিবাদ

নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসের (১৯৭৭)মূল চরিত্র রুহিতন কুরমি। তার বাবা চার পুরুষ ধরে চা বাগানের মজুর হলেও রুহিতন নিজের জমিতে চাষ করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু তার এই স্বপ্ন সফল হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা যা একাধারে সামন্ত্রতন্ত্র ও উপনিবেশের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছে। নকশাল আন্দোলন সবচেয়ে প্রথমে বিস্তৃতি লাভ করেছিল কৃষকের অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে, আন্দোলনের সে নায়কের সঙ্গে রুহিতনকে একেবারে মিলিয়ে দেন সমরেশ বসু। চা বাগানের মালিক, জমিদার, জোতদার, বড় চাষীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে রুহিতন। ১৯৭৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত এই উপন্যাস যেন ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দুই দিক দিয়ে নকশাল আন্দোলনের সাক্ষ্য বহন করে। একসময় পুলিশি বাহিনীর সাহায্যে রাষ্ট্র এই আন্দোলনকে দমন করে, জেলে যায় সে কিন্তু জমি দখল ক'রে, মুক্তাঞ্চল গড়ার যে স্বপ্ন তারা দেখেছিল সেই স্বপ্ন ভুলতে পারে না রুহিতন। যে সময় সমরেশ বসু এই উপন্যাস লিখছেন তখন আন্দোলন প্রায় স্তিমিত হয়ে কেবল স্মৃতিটুকু রয়ে গেছে। রুহিতনের মত যারা বেঁচে আছে ও ঘরে ফিরেছে তাদের পরিবারও আর চায় না ওই ভয়ঙ্কর সময়ের স্মৃতিচারণ করতে। কিন্তু নবারুণ যেভাবে বলেন ও ভাবতে চান যে বিস্ফোরণ ঘটবেই, ততটা দৃঢ় ভাবে না বললেও সমরেশের মনেও কী বিপ্লবের স্বপ্নের কিছুটা রাশ রয়ে যায়? উপন্যাসের একদম শেষে গিয়ে রুহিতন খুঁজে বের করতে চায় তার ডবল ব্যারেল একটা বন্দুক। -" রুহিতন তার ডান হাতের তর্জনীর অবশিষ্ট তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে ট্রিগারে রাখলো। বুকের কাছে বাট চেপে, ট্রিগারে ক্ষয়প্রাপ্ত তর্জনী দিয়ে চাপ দিল। জঙ ধরার একটা শব্দ হলো। কিন্তু ট্রিগার নড়ে উঠলো। ...রোদ খাইয়ে

শুকোলে কী আবার এ বন্দুক চালানো যাবে? টোটাগুলো কাজ করবে? ব্যারেলের মুখ থেকে মাটি বের করে দিলে, গুলি বেরোবে? সে হাঁফাচ্ছে।” [xxxix]

রুহিতন কী আত্মহত্যা করবে? না কি গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে শ্রেণিশত্রুদের নিধন করার যে স্বপ্ন একদিন তারা রেখেছিল তার জঙও ঝেড়ে ফেলে আবার লড়াইয়ে নামতে চায় সে? প্রশ্ন থেকে যায়, তবে মূল কথা হল প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত হতে চায় সে। সে প্রতিবাদ নিজেকে বা শত্রুকে শেষ করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি চরম অনাস্থা প্রকাশের মধ্যে দিয়েই ঘটবে তা একপ্রকার নিশ্চিত।

৪.১৩ নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪)

নবারুণ ভট্টাচার্য সমাজের তথাকথিত উন্নয়নকে স্বীকৃতি দেন নি কোনদিনই, অন্যদিকে তাঁর লেখা বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন যে - “...মানুষের প্রত্যেক প্রজন্ম, তার সময়ে তার হরাইজোনে যতগুলি প্রশ্ন ওঠে সেগুলোকে জানার বোঝার চেষ্টা করে....যেমন আমি যতই যুক্তি দিয়ে বুঝি ,মৃত্যু কী সে সম্বন্ধে আমার জানা শেষ হয়নি।” [xl]তাঁর লেখাগুলি স্থান-কালের কোন ছোট পরিধির মধ্যে আটকে থাকে নি। চারিপাশের চেনা মানুষদের থেকেই উপাদান খুঁজে নিয়েছেন তিনি,তাঁর সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা, পণ্যসর্বস্বতা, জটিল নীতিবোধ বা মনুষ্যত্বের অভাব দেখে তিনি বারবার মনে করেছেন বিস্ফোরণ ঘটবেই।

৪.১৩.১ হারবার্ট: অনিবার্য আত্মহত্যা

হারবার্ট (গ্রন্থাকারে প্রকাশ, ১৯৯৩) উপন্যাসের আসলে এ প্রান্তিক মানুষের কথা বলে, তার আত্মহত্যা অবশ্যম্ভাবী এবং তার আত্মহত্যাকে একেকজন পাঠক একেক রকম ভাবে পড়তে পারে। জন্মের পরেই হারবার্ট বিচ্ছিন্ন। পরিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগ অতি

স্বল্প। দোতলার বারান্দা, গলি আর চিলেচাদ ছিল তার জগৎ। এখানেই প্রথম হারবার্ট মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে। কেবল হারবার্টের আত্মহত্যা ও তার অনিবার্যতা নয়,এই কাহিনীর বিন্যাসের সঙ্গেই আত্মহত্যার যোগ রয়েছে পরতে পরতে। আমরা আত্মহত্যা ইতিহাস ও আত্মহত্যাকে দেখার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি কিভাবে তা বিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে আত্মহত্যাকে অস্বীকার করার চেষ্টা থেকে শুরু করে, পরবর্তী সময়ে তাকে ধর্মের চোখে পাপ, আইনের চোখে অপরাধ এবং ক্রমশ মনস্তত্ত্বের চোখে আত্মহত্যাকারীকে রোগী হিসাবে সনাক্ত করার যে প্রবণতা তাও দেখেছি। আত্মহত্যার এই সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসকে বুঝে নিয়ে আমরা এই উপন্যাসটি পড়তে চেষ্টা করব। *‘চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল’ : পাগলামি-পলায়ন-প্রতিবাদ: একটি আত্মহত্যার রিপোর্ট* - এই প্রবন্ধে লেখক রণবীর লাহিড়ীর বক্তব্য এক্ষেত্রে খুবই যথাযথ বলে মনে হয়েছে আমার। খানিকটা উল্লেখ করি,

“প্রতিটি গল্পের এগিয়ে চলার, বেড়ে ওঠার একটা নিজস্ব লজিক আছে। সেই লজিকের জোরে বলাই যায় হারবার্টের আত্মহননের ঘটনা গল্পটিকে দেয় এক ধরনের সম্পূর্ণতা। এভাবে বলার অর্থ হল - সমগ্র আখ্যান জুড়ে মৃত্যুর যে প্রচণ্ড উপস্থিতি তার শীর্ষবিন্দু হল হারবার্টের আত্মহনন। বেশ কিছু মৃত্যু ও আত্মহননের ঘটনা,মৃত্যুকেন্দ্রিক স্বপ্ন, প্রতীক ও চিহ্ন আখ্যানকে চারদিক থেকে ধরে রেখেছে। সর্বোপরি হারবার্টের চেতনা মৃত্যুচিন্তায় আছন্ন । গল্পের কেন্দ্রীয় মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে হারবার্টের হঠাৎই খুঁজে পাওয়া সেই করোটি যার প্রতি সে অদ্ভুত ভয়মিশ্রিত টান বোধ করে। জন্ম নেয় এক দুর্মদ মৃত্যুচেতনা।...গল্পের পূর্ণ পাঠে এটা মনে হওয়া অসংগত নয় যে, করোটির দেখা পাওয়া হারবার্টের জীবনে কোনো আপতিক ঘটনা নয়। এটা আখ্যানের কেন্দ্র জুড়ে এক প্রতীকী উপস্থিতি যা হারবার্টের আত্মহননের প্রথম ও সবচেয়ে জোরালো ইঙ্গিত।”[xli]

হারবার্টের অস্থিরতাকে মানসিক ব্যাধি বা ভারসাম্যহীনতা বললে এই উপন্যাস তথা চরিত্রটিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হবে না। পারিবারিক সূত্রে যে ধ্বংসাত্মক উত্তরাধিকার পেয়েছিল হারবার্ট তা তাকে আত্মার হননি যে প্ররোচিত করবে তা বলাই যায়। বন্ধু খোড়ো রবির আত্মহত্যার সচেতন প্রভাব পড়েছে তার ওপর। রণবীর লাহিড়ী হারবার্টের আত্মহত্যাকে ডুর্খেইম কথিত সামাজিক আত্মহত্যা হিসাবেই পড়তে চেয়েছেন। - "হারবার্টের তৈরি যৎসামান্য এই পরিসর বিরাট কর্মমুখর, সুস্থ-সফল পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এক কৌশল মাত্র। অন্য কোনো কর্মদক্ষতা তার জানা নেই। সবসময় সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। পুলিশ-আইন-আদালত এসব কিছুর মুকাবিলায় সে নিতান্তই অক্ষম। তার কাছে একমাত্র পথ পলায়ন যার নামান্তর আত্মহনন। এই সেই ডুর্খাইম বর্ণিত আত্মহত্যার মডেল যেখানে আত্মহত্যা ও হত্যা প্রায় অভিন্ন।"[xlii]

কিন্তু এই পলায়ন কিন্তু ব্যক্তি আমি-র ব্যর্থ মনোরথ হয়ে পালানো মাত্র নয়। সমাজের বিরুদ্ধে এ তার প্রতিবাদ। খোড়ো রবি মারা গেলে মৎস কন্যারা কাঁদবে ভেবেছিল হারবার্ট। তার মৃত্যুতে কি কেউ কাঁদত ? উত্তর নেই। তার পরলোকচর্চা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শোকে নয়, তার বুজরুকি ধরা পড়ে যাওয়ায় নয়, আসলে তার তৈরী করে নেওয়া একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতি এ তার প্রতিবাদ।

৪.১৩.২ ভোগী : সময় যেন নিঃশব্দ ঘাতক

এই উপন্যাসে(১৯৯৩) লেখক বলেন যে ভোগীরা "কয়েকদিন মাত্তর থাকে। এর মধ্যে ভোগ করে। তারপর বলি হয়ে মরে যায়। ... চারদিকে এত অনাচার, অত্যাচার, ধম্মোলোপ, খুন-খারাপি, চোপরদিন চুরিচামারি -এই অনাছিষ্টি দূর করার জন্যই ভোগী আসে, তারপর...আত্মঘাতী হয়।" [xliii]

ভোগীর এই আত্মত্যাগ লেখকের নিজস্ব ভঙ্গীতে যেন নেহাত বাজারি হয়ে ওঠে, আকণ্ঠ বিয়ার পানের পর গৌতমদা ভোগীর কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়ে, আবার তারপরেই পকেট থেকে নোট বের করে বলে, -"এত বড় একটা স্যাক্রিফাইস হবে আর আমি, শালা কর্পোরেটের গিনিপিগ গৌতম রায় ল্যাবার মত বসে থাকব?" [xliv] এই আত্মত্যাগের ভিডিও তুলে, পাপমুক্ত হতে চেয়ে কান্না জোড়ে সে।

কিন্তু প্রেমিকা মিমির কথায় হুঁশ ফেরে মিথিলের,সে ভোগীকে বেচে দিতে চায় না। পরে আবার চিত্রনির্মাতার মুখ দিয়ে লেখক বলান যে।- 'ভোগী কিন্তু তারকোভস্কির - 'স্যাক্রিফাইস'-এর অট্টো নয়। ...ভোগী একজন কমন ম্যান। কমন ফ্যানই প্রোটেস্ট করবে। করছে।তার জন্যে মরতে হবে" আসলে অতীত থেকে হয়ে আসা নানা আঘাতের বিরুদ্ধে ভোগীকে 'একটা পোয়েটিক ইমেজ অফ আ প্রোটেস্ট' বলেন পরিচালক। [xlv]

প্রতিক্ষণ পত্রিকায় ১৯৯৪ এর মে সংখ্যায় দেবেশ রায়ের 'নবারুণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথাবার্তা' শীর্ষক লেখাতে লেখক বলেন - "আজকের দিনে এমন একটা আত্মবলিদানকে সত্যি বলতে পারি না। অথচ সেটা আমাকে কোনো এক ভাবে দেখাতে হবার। এই দেখা আর বানানো মিলেই উপন্যাসের বুনোটটা তৈরি হয়।"

এই উপন্যাসটি ২০০৭ সালে 'অটো' উপন্যাসটির সঙ্গে একত্রে 'অটো ও ভোগী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তার প্রচ্ছদ ফ্ল্যাপে বলা ছিল -

"ভোগী হারবার্টের অন্য এক মুখ ; নবারুণেরও। ভোগীও হতে পারে ব্যবসার মূলধন আবার গোলকায়নের অপরিচিত ভুবনে তার মতো বিপন্ন, লুপ্তপ্রায় এক জীবের ঘোরাফেরা যে বিস্ফোরকের মতো ভয়াবহও হতে পারে - সেই বিপজ্জনক সারল্য নিয়ে সে দাঁড়িয়ে। ভোগী কিংবা অটো - দুয়েরই মধ্যে যে নেমেসিসকে নবারুণ তুলে ধরেন -

তা অস্তিত্বের এক অন্তর্মুখিন রাজনীতি! যে মৃত্যু উপত্যকার মধ্যে দিয়ে নবারুণের চরিত্ররা অনবরত ঘোরাফেরা করে সেখানে মানুষের দুটোই চেহারা - হয় নিঃশব্দ ঘাতকের, না হলে অসহায় আত্মহননকারী বা পরাজিতের। আর সেই উপত্যকা জুড়ে কেবল উন্নতির পারমাণবিক কুয়াশা। সময় আর সমাজের সঙ্গে একক মানুষের লড়াই আর সহাবস্থানের, অভিমান আর উদযাপনের যে যুদ্ধপরিস্থিতি - তারই আরো দুটি চেহারা- ভোগী আর অটো।” [xlvi]

৪.১৩.৩ *যুদ্ধ পরিস্থিতি* : রাষ্ট্র দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড

এই উপন্যাসটিতেও(১৯৯৫) ‘হারবার্ট’- উপন্যাসটির মত প্রতিরোধের কথা, সত্তরের রাজনীতির কথা তুলে ধরেছেন নবারুণ। নকশাল বাড়ি রাজনীতি লেখককে নাড়া দিয়েছিল প্রবল ভাবে, বর্তমানের এই মেকি উন্নয়নের পরিবর্তে তাই বারবার হারিয়ে যাওয়া সময়ের দিকেই চোখ থাকে তাঁর। *হারবার্ট* উপন্যাসে বিনুকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের যে চিত্র এঁকেছিলেন নবারুণ, এই উপন্যাসে সেই পথের পথিক রণজয়। এখানেও অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে রণজয় ফিরে এসেছে,সেও যেন কোনো এক বিস্ফোরণ ঘটাতে চায়। নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পিছনে নানা কারণ ছিল, কিন্তু নবারুণ মনে করেছেন এতগুলো তাজা প্রাণ যেখানে শেষ হয়ে গেল সেই আন্দোলনকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এক রাজনৈতিক চক্রান্ত। আর তাই নিজের প্রজন্মের এই কাহিনী বারবার বলে চলেন তিনি।

বাবার অনুপস্থিতিতে বাবার সময়ের কথা জানতে মাঝে মাঝেই মায়ের দেওয়া বুকলেট পড়ে কোবা, সে জানতে পারে- “....সম্প্রতি বিচার প্রহসনে ঝরে গেছে দুটি অমূল্য তাজা প্রাণ। সর্বস্বান্ত গরিব কৃষক নিমাই সরকার আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। আরেক কৃষক একই কারণে বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন। আমরা মনে করি এ ঘটনা নিছক

আত্মহত্যা বা মৃত্যু নয়- রাষ্ট্র দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ড।" [xlvii] কোবা ঘুমিয়ে পড়লে মেখলার ভাবনায় ফিরে আসে অতীতের কথা, রণজয়ের কথা, পৃথিবী পাল্টে যাওয়ার কথাও। সে পড়তে থাকে,

"ফলিডলের শিশি গলায় ঢেলে দিয়েছিলেন নিমাই সরকার। মামলার বোঝা বইতে না পাড়ার ফলেই যে তিনি, আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন এই সত্যটুকুও গোপন করেছিলেন পরিবার-পরিজন। ডায়রিয়াতে নিমাই মারা গিয়েছেন এমনিই প্রচার করেছিলেন তাঁরাই। কারণ? পুলিশের ভয়।" [xlviii]

Van Gogh: A man suicided by Society রচনাটিতে আন্তোনিন আর্তো লিখেছিলেন – " কেউ নিজে নিজে আত্মহত্যা করে না। প্রত্যেক আত্মহত্যার ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজের শরীর দিয়ে , নিজের জীবন নিজেই নাশ করার এই উদযোগ করবার কারণ হিশেবে অবশ্যই থাকে এক দল বহুসংখ্যক দুষ্ট সত্তার সেনবাহিনী। আর আমি বিশ্বাস করি যে এইরকমের উত্কটতম মৃত্যুর মুহূর্তটিতে সব সময়ে অন্য কেউ-না-কেউ একটা থাকে যে আমাদের নিজেদের জীবন নিজেদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।" [xlix] অরিন্দম চক্রবর্তী এই উক্তি উদ্ধৃত করার মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছেন ভারতবর্ষের কৃষকের আত্মহত্যার জন্য আসলে দায়ী 'বিশ্বায়িত পুঁজিবাদ', তেমনিই নিমাইয়ের এই আত্মহত্যা বা পূর্বে উল্লেখিত অন্য কৃষকদের আত্মহত্যার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ও তৎকালীন রাজনীতির।

৪.১৪ বিমল কর (১৯২১-২০০৩)

উপন্যাসে এক অস্থির কাল ও যুগচরিত্রকে ধরতে চেয়েছেন বিমল কর। নিজের 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসটি সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে নিজের জীবনদর্শনের আধার রূপে

উপন্যাসের কথা বলেন তিনি। "... দীর্ঘকাল ধরে যে অবসেশন-মৃত্যু এবং জীবনের স্থায়িত্বের তুচ্ছতা নিয়ে-আমাকে পীড়িত করত, এই লেখাটি শেষ করার পর তার থেকে অনেকটাই মুক্তি পাই।"[1] মৃত্যু নিয়ে যে অবসেশনের কথা লেখক বলছেন তা থেকেই কি *অজ্ঞাতবাস* ও *দ্বীপ* এই দুটি উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যেই আত্মহত্যার বীজ বপণ করেন তিনি? তাঁর *আত্মজা* গল্পটিতে হিমাংশুর স্ত্রী যূথিকা যখন তাদেরই মেয়ে পুতুলের প্রতি হিমাংশুর অন্যরকম আসক্তির অভিযোগ আনে, তখন হিমাংশুর মনে যে অনুভূতি তৈরি হয় তা অদ্ভুত। একদিকে যূথিকার নিষ্ঠুর শানিত কথাগুলো তাকে আহত করে, পাশাপাশি সে ভাবতে থাকে যে পুতুলের চোখ, সর্ব্বাঙ্গের ঘ্রাণ কি তার চিত্তে শিহরণ জাগায় না? পিতার পাশাপাশি পশুর ছবি ভেসে ওঠে তার আয়নায়। আর এই নিষ্ঠুর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিমাংশু মণিবন্ধের শিরায় খুর চালিয়ে দ্রুত মুক্তি পেতে চায় ঐ পশুটার হাত থেকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিমাংশ কিন্তু অনুভব করেছে যে পনেরো বছরের পুতুল তার আত্মার অভিন্ন অংশ, হিমাংশু কখনোই চায়নি পুতুল বড়ো হোক, পুতুলের যৌবন আসুক। নিজের এই চাহিদায় নিজের প্রতি আস্থা হুঁজে পাওয়া হিমাংশু তখন বাঁচতে চাইলেও মৃত্যু তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে, মানসিক জটিলতা, নিজের মনের দ্বন্দ্ব, আত্মহননের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের অবসানের চেষ্টা – 'আত্মহত্যা'র সঙ্গে মানসিক এই জটিল ভাবনার সংযোগ শুরু হয় এভাবেই।

তিনি যে উপন্যাসে ব্যক্তি মানুষকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বারবার সে কথা তিনি বহু সাক্ষাৎকারে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলছেন – "আমি মূলত ইন্ট্রোভার্ট লেখক এবং আমার লেখার বিষয়ও অনেক সময় কোন মানুষের আত্মিক সমস্যা ও দার্শনিক জিজ্ঞাসা

থেকে দেখা যায়। সেখানে ঠিক আজই বাইরে কি ঘটছে বা না ঘটছে তা আমার কাছে প্রাধান্য পায় না।... আমার মনে হয় আমরা এখন জীবনের একটি দুটি তাৎপর্যকে ধরবার যতটা ব্যগ্র ততটা সমগ্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে নয় ।” [li] যে মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেয়েছিলেন বিশ শতকের প্রথমার্ধের জগদীশ গুপ্ত, মানিক বা বুদ্ধদেব বসুর মত ঔপন্যাসিকেরা তারই সার্থক উত্তরসূরী বলা যায় বিমল করকে।

৪.১৪.১ *অজ্ঞাতবাস* : অস্তিত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

অজ্ঞাতবাস (১৯৯৩) উপন্যাসে কেয়ার ভিলেজে কিছুদিনের জন্য থাকতে আসা মানুষগুলোর প্রত্যেকেরই কোন না কোন অসুস্থতার ইতিহাস আছে। তবে শকুন্তলার নিজের কথায় - “আমাদের এই ভিলেজ কোনও হাসপাতাল নয়,যাকে অ্যাসাইলাম বলা যায় তাও নয়। ...বিদেশে ওঁদের কাজ ছিল, ট্রম্যাটিক নিউরোসিস নিয়ে যারা বড় হয়ে উঠেছে তাদের ট্রান্সফার অফ মেন্টাল ফাংশনিং। ওঁর মুখে শুনে আমি যা বুঝেছিলাম তাতে মনে হয়, ছেলেবেলায় যুদ্ধের সময় নানা আঘাত ও আতঙ্কে হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে উঠেছিল, সাবালক হয়েও মনের তলা থেকে সেই আতঙ্ক নৈরাশ্য দূর করতে পারেনি, না পেরে মানসিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে উঠেছিল তাদের মন থেকে সেই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব মুছে দিয়ে নতুন করে জীবন সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলা। ..ঠিক ঠিক যাকে রোগী বলে তেমন কাউকেই এখানে থাকতে দেওয়া হয় না। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। একমাত্র তারাই এখানে থাকতে পারে যারা একসময় অসুস্থ হয়ে থাকলেও এখন কোন ব্যাধি নিয়ে আসেনি, অথচ মানসিক বা শারীরিক অবসাদ ক্লান্তি, কোনও বিশ্রী চাপ নিয়ে রয়েছে; আর নিতান্তই দু’ -চার মাস বিশ্রাম নিয়ে নিজেদের সুস্থ করে তুলতে পারে খানিকটা।”

কিন্তু এই ভিলেজে থাকতে আসা আর পাঁচটা মানুষের থেকে অন্যরকম ছিল নিশিকান্ত সেন। সে তারই কোটের পকেট থেকে পাওয়া চিঠি যে তার, তা অস্বীকার করে এবং চিঠির নিশিকান্ত সেন যে আসলে সে তাও বেমালুম অস্বীকার করে বারবার। ভিলেজে অন্য কারো সঙ্গে কোন আলাপ গড়ে ওঠে না তার। গল্পের শেষভাগে গিয়ে আমরা সন্দেহ করে যে সে হয়তো বারবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে কারণ বিমানবাবু একবার তার ঘরের দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনেছিল এবং একবার খুবই আশ্চর্যজনক ভাবে সে আগুনে আংশিক ভাবে পুড়ে যায়। ভিলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত মণিলাল যখন তার মিথ্যে বক্তব্যের প্রমাণ জোগাড় করে, তখন শকুন্তলা তাকে সরাসরি ভিলেজ ছেড়ে যেতে বলে। শকুন্তলাকে লেখা তার চিঠিতে তার পূর্বজীবন ও মানসিক অবস্থার কথা পাঠকের সামনে আসে। মায়ের উচ্ছৃঙ্খল জীবন, বাবার মৃত্যু ও অবশেষে ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মায়ের মৃত্যু- তার ছোটবেলাকে অভিশপ্ত করে তুলেছিল। পরিচারিকার সঙ্গে তার যৌন ব্যাভিচার, প্রথমা স্ত্রী লিলির গর্ভবতী থাকাকালীন মৃত্যু, এই সমস্ত ঘটনা প্রকৃত পক্ষেই তার মনে অন্ধকার জমা করছিল তারও অজান্তে। আর তাই স্ত্রী সাধনা ও মেয়ে ঝুনুকে নিয়ে তার জীবনের সুখ ছিল স্বল্পস্থায়ী। এক দুর্যোগের রাতে শববাহী এক দলকে দেখে যেন তার জীবনের এই স্থিতাবস্থা হঠাৎ নড়বড়ে হয়ে গেল। হঠাৎ অতীতমুখী হয়ে গিয়ে জীবন যেন তাকে বুঝিয়ে দেয় যে এই জীবনের আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। সে আসলে আচমকা নিজের পরিচয় খুঁজতে চায় ও তার মনে হয় নিশিকান্ত সেন আসলে মৃত। “সেই পরিচয় আমি পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর অবধি বয়ে বেড়িয়েছি, কোনওদিন খেয়াল হয়নি ওটা আমার ভেতরের পরিচয় নয়, আমার নিজের অস্তিত্বের নয়।”

নিশিকান্ত আত্মহত্যা করে, তার যখন মনে হল যে সে একা , সহায়হীন ও নিঃসঙ্গ, ভয়ে সে পালিয়ে আস্তে চাইল ভিলেজে, সেখানেও পরিচয় নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে, শেষ অবধি সে

বুঝল যে এই যন্ত্রণা থেকে পালানোর কোন উপায় নেই। তাই সে শেষ করতে চাইল এই যন্ত্রণার তথা নিজের অস্তিত্বের। আধুনিক মানুষের যে সংকটের কথা আমরা বারবার বলতে চেয়েছি, সামাজিক যে অ্যানোমির কথা ডুর্খেইম বলেছেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে নিশিকান্ত ও তার আত্মহনন। তার এই সমাজের থেকে বিচ্ছিন্নতা আসলে আত্মবিচ্ছিন্নতা। নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে নিজের পরিচয়ের দ্বন্দ্ব। আর উপন্যাসের একদম শেষভাগে তা যেন নাড়া দেয় শকুন্তলাকেও। সে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছেই প্রশ্ন তোলে। আধুনিক মানুষের এই সঙ্কটময় প্রশ্ন দিয়েই শেষ হয় উপন্যাস। বিমল করের উপন্যাসে ব্যক্তিমানুষের সংকটকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখতে চেয়েছেন লেখক। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের চরিত্রের এই ব্যক্তিগত সংকট কিন্তু কখনোই সমাজ বিচ্ছিন্ন নয়। বহু ক্ষেত্রেই অতীতের প্রভাব বর্তমানে ফিরে ফিরে আসে, অবচেতনে ঢুকে থাকে, যেমন নিশিকান্তের শৈশবের পর আবার ফিরে আসে তার ভীতি, সংকট, অবচেতন। স্বাভাবিক সুখী জীবন থেকে হঠাত্‍ কখন যে অস্তিত্বের সংকটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয় মানুষের মন, তা তুলে ধরেন বিমল কর। স্বাভাবিকতার আড়ালে নখ দাঁত নিয়ে উপস্থিত থাকে আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট।

৪.১৪.২ *দ্বীপ* : তবু কেন সুখী নই?

এই উপন্যাসটি (১৯৭৭) অজ্ঞাতবাস উপন্যাসটির অনেক আগে লেখা। উপন্যাসের কাহিনীতে খানিকটা মিল আছে। অজ্ঞাতবাসের কাহিনীটিতে প্রেক্ষাপট ছিল কেয়ার ভিলেজ এবং এই উপন্যাসে তা আসলে একটি হাসপাতাল। সম্পূর্ণ জনহীন, প্রত্যন্ত স্থানে তৈরি এই হাসপাতালের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই অসুস্থ, কথকের বক্তব্য অনুযায়ী সেখান থেকে কেউ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে না, কোনোদিন কেউ ফেরে নি। হাসপাতালের সকলের কাহিনী বলেন তিনি, শেষে নিজের কথাও বলেন কথক ধ্রুবপদ মজুমদার। বাবার কঠিন

শাসন,বাবার মৃত্যুর পরেও তাকে নিয়ে ভীতি আতঙ্ক ছিল তাঁর শৈশবের অনবরত সঙ্গী। যৌবন বিষয়েও তাঁর বক্তব্য -

“অথচ আমি সুখী ছিলাম না। কখনওই নয়। কেন? স্বাস্থ্য মজবুত ছিল, অন্নচিন্তা ছিল না, বন্ধুবান্ধব ছিল, সঙ্গ পাবার মত পয়সা ছিল তবু কেন আমি সুখী নই? কী এমন হয় যাতে এক একদিন মনে হয় আমি কেমন বিশ্রী এক একঘেয়েমির মধ্যে ডুবে আছি ?”[lii]

একঘেয়েমি থেকে মানসিক নানা ভ্রান্তি গড়ে উঠেছিল। সাধারণ মানুষের মত সব মেনে ও মানিয়ে নিতে পারলে হয়ত আপাত স্বাভাবিক হত তাঁর জীবন কিন্তু ভেতরের ‘খোঁচা’ তাঁকে স্বাভাবিক যে হতে দেয় নি। কেউ কেউ তার এই মানসিক ভ্রান্তির কারণ খুঁজতে চেয়েছিল, শৈশবের থেকে বয়ে আনা ভীতি, অতৃপ্ত যৌনজীবনের কথা বলতে চেয়েছিল কেউ কেউ। তার ওপর স্ত্রী যেদিন তার জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে মরতে বলে, প্রশ্ন করে যে সে কেন এখনো বেঁচে আছে, ধ্রুবপদের সমস্ত স্বভাবিকতার মুখোশ সেদিন ভেঙে পড়ে। অসহায় এই মানুষটি জানে কেবল উদ্বেগ আর দুর্ভাবনা ছাড়া আর কিছু করার নেই তার। তাই এই মানসিক হাসপাতালে নিস্তরঙ্গ জীবন কাটাতে কাটাতে হঠাত্ আসা মৃত্যুই অনেক বেশি নিশ্চিন্তির।

৪.১৫ শংকর (১৯৩৩-)

আজীবন লিখে যেতে চাওয়া এই মানুষটির হাতে তৈরি হওয়া অজস্র চরিত্র বাঙালি পাঠকের মনে চিরস্থায়ী স্থান দখল করেছে। জনপ্রিয়তায় তিনি সমকালীন অন্যান্য লেখকদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন। তিনি যা দেখেছেন তাঁর লেখায় সেই গল্পই উঠে এসেছে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের নানা অসঙ্গতি, লোভ ও ক্লান্তির ছবি ফুটে ওঠে

তাঁর রচনায়। পাঠকের কাছে সমাদৃত হলেও সমালোচকরা তাঁকে কেবল পপুলার সাহিত্যের রচয়িতা হিসেবে আক্রমণ করেছেন।

৪.১৫.১ *নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি* : বৌদ্ধিক চর্চা ও সাংসারিক জীবনের সংঘাত

উপন্যাসের (১৯৬৬) মূল চরিত্র,আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের স্নেহধন্য বাঙালী বিজ্ঞানী জীমূতবাহন প্রথমে রাসায়নিক কীটনাশক নিয়ে গবেষণা শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক কীটনাশকের দিকে মনোযোগ যায় তাঁর, নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে নানা সহকারী নিয়ে পুরোদমে কাজ করতে চান তিনি। বিজ্ঞান ও গবেষণা নিয়ে মেতে থাকা এই মানুষটির সাংসারিক বোধের ওপর বিন্দুমাত্র ভরসা নেই স্ত্রী ঈশিতার, জীমূতবাহনের এই গবেষণা নিয়ে পাগলামির প্রতি কোন আগ্রহ বা সহানুভূতি নেই তার। আর তাই চার সন্তানের সুবন্দোবস্ত করতে স্বামীর ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে আসা উজ্জ্বল তরুণদের প্রতি নজর তার। বলা যায় ল্যাবরেটরি বিষয়ে এইটুকুই তার আগ্রহ। মেয়ে চিত্রলেখা, সুস্মিতা ও প্রিয়ংবদার জন্য আগেও সুপ্রিয়,দেবকুমার ও অজয়কে পাত্র হিসেবে ছিনিয়ে নিয়েছে সে।বিজ্ঞানের ক্ষতি হবে জেনেও স্ত্রীর চাহিদাকে অমান্য করতে পারেন নি জীমূতবাহন আগে। ঈশিতার 'মোহিনী' চোখের সম্মুখে না বলতে পারার ক্ষমতা ছিল না তাঁর, এ লজ্জা তাঁর, বিজ্ঞানের পরিপোষক হিসেবে তিনি লজ্জিত। কিন্তু যেদিন খুকুমণি অর্থাত্ ছোটমেয়ে মদালসার জন্য অমিতাভ মিত্রের দিকেও হাত বড়াল ঈশিতা এবং তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে গিয়ে অমিতাভের গাফিলতিতে গবেষনার কাটুই পোকাগুলো মারা গেল, সেদিনই মনস্থির করে নেন তিনি। ছাত্রী ইন্দুমতীকে বলেন অমিতাভকে জিতে নিতে, নির্লজ্জের মতো অসহায় মাস্টারমশাইয়ের চাওয়া গুরুদক্ষিণা দিতে নিমরাজি হয় ইন্দু, তার নিজের বাসনা পূরণের একটা লক্ষণও যেন ফুটে ওঠে আড়ালে। যেদিন

অমিতাভ ও ইন্দুর একসঙ্গে নিখোঁজ হওয়ার খবর চাউর হয়, ঈশিতা তাঁকে বলে- 'সাপেরাই শুনেছি নিজেদের বাচ্চা খায়'[liii] খবরটা জেনে অসুস্থ হয়ে পড়া মদালসার কথা ভেবে নিজেকে অপরাধী মনে হয় তাঁর। শৈশবের নানা স্মৃতি তাঁকে আরও খানিকটা দুর্বল করে দেয়। ঈশিতার কঠিন বাক্যে দিশেহারা জীমূতবাহন তাই স্বামীর হত্যাকারী কালো মাকড়শার কাছে গিয়ে ধরা দেয়। কালো মাকড়শা লূতা ও ঈশিতা কখন যেন সমার্থক হয়ে যায়, আর পরদিন ল্যাবরেটরির মেঝেতে তাঁর প্রাণহীন দেহ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধিক চর্চা ও সাংসারিক জীবনের সংঘাত বহুদিনের। সে সংঘাত কেউ সামলাতে পারে, কিন্তু জীমূতবাহন বারবার সন্তানের জন্য বিজ্ঞানচর্চার ক্ষতি করার পর যখন একবার বিজ্ঞানের জন্য পরিবারের সঙ্গে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হলেন, তাঁর পিতৃস্নেহ, অপরাধবোধ ও স্ত্রী-র ক্রমাগত বাক্যবাণ তাকে অস্থির করে তুলল, আত্মহনন ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না তিনি। সমাজ নির্দিষ্ট স্বাভাবিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারা এমন ভবঘুরে কবি, সাহিত্যিক বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক কর্মীরা এই সময়ের উপন্যাস জুড়ে রয়েছেন। যাঁরা নিজেদের মত করে নানা মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন ও অধিকাংশ সময়েই সমাজ তাঁদের সামনে আত্মহত্যা ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা রাখে নি।

৪.১৬ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫)

সন্দীপনের উপন্যাস বিষয়ে দেবেশ রায় বলেন - "...আখ্যান বলতে আমাদের মনের ও শরীরের ও বোধের যে কথাগুলো কখনও বলা যায়নি, সন্দীপন সেইসব কথা আমাদের জানিয়েছেন। যেমন এমন সব আত্মগত কিন্তু অচেতন অনুভবের কথা একসময় জীবনানন্দ বাংলা কবিতায় জানিয়েছিলেন।" [liv]আর নিজের লেখা নিয়ে বলতে গিয়ে স্বয়ং লেখক তাঁর উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডের নান্দীমুখে বলেন -

"শুধু সামাজিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, আজ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসও মৃত। লেখার জন্য আজ শুধু পড়ে আছে একজন মানুষের অস্তির কাহিনী, অস্তিত্বের জগৎ...এখন বিষয় যৎসামান্য তথা কাজ একটিই। ব্যান্ডেজ খুলে রক্তঝরা ক্ষতস্থানটি দেখানো। সেটাই উপন্যাস।"[lv]

অস্তিত্বের যে সংকটের কথা তিনি বলেন তা ছড়ানো রয়েছে তার উপন্যাসের পাতায় পাতায়, বলা বাহুল্য তাঁর জীবন, কথন ও উপন্যাসে কোন বিভেদ নেই। সব মিলিয়ে যেন একটি কাহিনী রচনা করে চলেছেন তিনি ক্রমাগত। তাঁর উপন্যাসে মৃত্যু ও প্রেম চলেছে একসঙ্গে যেন হাত ধরাধরি করে। প্রেম বিষয়ে তাঁর অশ্রদ্ধা ফুটে উঠেছে বারবার কিন্তু তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি প্রেমকে। অথচ এই প্রেমের কোন এক সংকট থেকেই মৃত্যুভাবনা জন্ম নেয় তাঁর লেখায়।তাঁর উপন্যাসে কোন ঐতিহ্যের অনুসরণ বা আবহমান সত্য খুঁজতে গেলে অসফল হতে হবে। কারণ মুহূর্তকে ধরেছেন তিনি তাঁর উপন্যাসে। আর তাই হয়ত আজ, বা এখন দিয়ে শুরু হয় তাঁর বহু উপন্যাস। ব্যক্তিগত জীবন, সংকট, প্রতিটা দিন গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর উপন্যাসে। 'টাইমলেস' দিনে বেঁচে থাকতে চেয়েছেন তিনি তাঁর উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে।

সন্দীপনের *আইভি সোম হত্যা মামলা (১৯৭৮) : একটি পোস্টমর্টেম-* গল্পে সাধনধন চক্রবর্তী তার ও তার স্ত্রী বাসনার প্রেমহীন জীবনের মধ্যে আইভির ভালোবাসা পেয়েছিল। কিন্তু আইভি সোমকে সে হত্যা করে। তার এই হত্যার সঙ্গে আত্মহত্যার ধারণা এমনভাবে মিলিয়ে দেন সন্দীপন যে পাঠকের মনে সংশয় তৈরি হয় যে এই হত্যা কি সত্যিই সাধনধনের বেঁচে ওঠার সম্ভাবনার মৃত্যুই নয়। এতো আসলে আত্মহত্যাই। আইভিকে হত্যা করে, ভালোবাসার সমস্ত সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে সাধনধন এই মৃত্যুময় জীবনকেই বেছে নিয়েছে।

সেইসব আত্মহত্যা গল্পে লেখক সম্পর্কের মৃত্যু এবং সেই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আমাদের মনের মৃত্যু – এই আত্মহত্যার কথা বলেছেন। ক্রমাগত আত্মহত্যা করতে থাকা আধুনিক মানুষ কিভাবে সেই আত্মহত্যাকেও মেনে নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে সে কথাই বলেছেন। এই আত্মহত্যাকে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া সন্দীপনের উপন্যাসের একটি বড় লক্ষণ। যা আমরা বিভিন্ন উপন্যাস অবলম্বনে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

৪.১৬.১ *এখন আমার কোনো অসুখ নেই* : আধুনিক অস্পষ্টতা

এই উপন্যাসে (১৯৭৭) মনোজ হঠাৎ পনেরো দিনের জন্য দেশে ফেরে,ঠিক যেমন হঠাৎ একদিন সে দেশ ছেড়েছিল। দেশ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশিনী বৌ ও সন্তান নিয়ে সে খবর পাঠাতো বন্ধু প্রতুলকে। এয়ারপোর্ট থেকেই সে প্রতুলকে ফোন করে পুরী যাওয়ার কথা বলে। পুরী যাওয়ার জন্যই দেখে ফিরেছে মনোজ। পুরীর জনহীন সমুদ্র সৈকতে, পূর্ণিমার আগে হঠাৎ এক পাহাড়ের খোঁজে বন্ধুকে নিয়ে জলে নামে সে, প্রবল ঢেউয়ের হাত থেকে প্রতুল কোনোক্রমে রক্ষা পেলেও মনোজ বেঁচে ফেরে না। প্রতুল মনে করে মনোজ আত্মহত্যা করেছে। জলে নামার মুহূর্তে নয়, এয়ারপোর্ট থেকে পুরী যাওয়ার পরিকল্পনা করার সময়েও তার এই সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছিল। মনোজ জলের মধ্যে পাহাড় খুঁজতে চেয়েছিল, খুঁজে পেলেই ফিরে আসবে বলেছিল। মনোজের আত্মহত্যা নিয়ে ক্রমাগত একটা চেতনা প্রবাহ কাজ করে প্রতুলের মধ্যে। অতীতের কোন রোগ, বর্তমানের শারীরিক সমস্যা, কোন পুরোনো স্মৃতি বা যন্ত্রণা এই আত্মহত্যার কারণ কিনা তা সে জানে না। কিন্তু সে একসময় স্বীকার করে -

“হ্যাঁ, আমি জানতুম। হ্যাঁ, আমি বাধা দিই নি। নবাবিষ্কারে আত্মনিযুক্ত বৈজ্ঞানিককে তার সর্বস্ব ধরে যেমন টান দেয় সমুজ্জ্বল পরিণতি - তেমনি -আমার শরীরময় সমস্ত জীবন

ঝুঁকে পড়েছিল মনোজের ধ্বংসসৃষ্টির দিকে। তার আত্মহনন, আগ্নেয়গিরির সেইসব লাভা ও তার আলো,শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করে আমি ধন্য।” [lvi]

একজনকে মানুষকে শেষ হয়ে যেতে দেখা ও তার পরবর্তী অনুতাপকে প্রতুল ‘অনির্বচনীয় অর্গ্যাজম’ মনে করেছে।

মনোজের এই আত্মহত্যা আধুনিক মানুষের জটিল মননের পরিচায়ক। এই যন্ত্রণা কি আত্মবলুপ্তির যন্ত্রণা? সে কী চায়, কেন চায়, কী জন্য আত্মহননের পথ বেছে নেয়, কীসের উপর ভিত্তি করে কখন এই সিদ্ধান্ত নেয় তা স্পষ্ট করে বোঝা যায় না কখনো। তবে তার মাথা ধরত, বিদেশিনী স্ত্রী মার্থার নাম সে ভুলে গিয়েছিল একদিন,মাদকাসক্তির ছিল। আর তাই সাত বছর পর পুরী যাওয়ার জন্যই পুজোর মুখে দেশে ফেরা ও পুরীতে ভরা পূর্ণিমার রাতে পাহাড় খুঁজতে জলে নামা, এ সবই ধোঁয়াশা হয়ে থেকে যায়। বৌকে বাংলা শিখিয়ে, সন্তানকে সচেতভাবে বড় করে তুলতে চাওয়া মনোজের একাকিত্বকে কোন পার্থিব কারণ দিয়ে বাঁধতে চান নি ঔপন্যাসিক।

৪.১৬.২ *কলেরার দিনগুলিতে প্রেম* : আত্মহত্যা বিষয়ে বহুমাত্রিক স্বর

উপন্যাসে (১৯৯২) অবিনাশ রায়চৌধুরীর বোন মান্তু। তার স্বামী রণেন ও শ্বশুরবাড়ি রামপুরহাটে। দেওর তপনের সঙ্গে পুজোর আগের দিন সুরুচুয়া থেকে মলুটি যাওয়ার পথে রানওয়ের ধরে মান্তু ধর্ষিত হয়। মান্তুকে যে চারজন ধর্ষণ করে তাদের সকলেরই বয়স ছিল অতি অল্প। মান্তু যেভাবে এই ঘটনার কথা বর্ণনা করে, আপাতভাবে মনে হয় যেন সে এ বিষয়ে বিশেষ ভাবিত নয়, যেন কিছুই হয় নি। সাধারণভাবে ধর্ষণকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক মানসিকতা গড়ে উঠতে দেখা যায় তার একদম বিপরীত একটা ছবি আঁকেন লেখক। প্রথমদিন তাকে দেখে অবিনাশের মনে হয় যে ধর্ষণের এই ঘটনা

মান্তুকে প্রভাবিত করে নি মোটেই, সগৌরবে সংসার করে সে, রণেনও যেন খুব সহজভাবে নেয় বিষয়টাকে। কিন্তু অবিনাশের এই ভাবনা যে কতটা ভুল তা প্রমানিত হয় উপন্যাসের পরের অংশেই,তারপরেই উপন্যাসের পরবর্তী পংক্তিতে আচমকা বদল আসে যখন রণেন বলে -

- "সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান দাদা" ... "ও পাগল হয়ে গেছে" [lvii]

আমরা ভাবি সত্যি হয়ত মান্তুর মনেই দানা বেঁধেছে কোনো অসুখ। এরপর আমরা মান্তুকে দেখি তার দাদার বাড়িতে, নিজের সঙ্গে কথা বলে, সেই কথাকে আপাতভাবে ধর্ষণের রাতের দুঃস্বপ্ন মনে হলেও তাতে জড়িয়ে থাকে দাদার বন্ধু চঞ্চলদার কথা,দাদার প্রেমিকা মমতাদির কথা, তার এই কথোপকথন নিজের সঙ্গে, অচেতনে। পরে কিছুই আর তার মনে থাকে না। কিন্তু সে ঘর থেকে বেরোতে চায় না। তার এই অসুস্থতার কেন্দ্র যে আসলে রণেন তা বোঝা যায়, রণেন এলে সে স্থির হয়ে বসে থাকে, স্বামীর সব আচরণ স্বাভাবিক ছিল তার ধর্ষণের পরেও, মান্তু দাদাকে জানিয়েছে যে রণেন তাকে ভালোবাসলেও ঘটনার ছমাস পরেও একবারও চুম্বন করে নি সে, এই রণেনকে মান্তু ঘৃণা করে। শিক্ষিত, আধুনিক মনস্ক রণেন মান্তুর ধর্ষণের ঘটনাকে আপেক্ষিক ভাবে অতি সাধারণ ঘটনা বলে দাবি করতে চাইলেও, তার মধ্যে জমে থাকা সামাজিক যে মন, সেই মন হয়ত শরীরের শুদ্ধতা নামক বোগাস জিনিসতিকে বিশ্বাস করে। আর তাই মান্তুকে ভালবাসলেও তার ধর্ষিত শরীরকে ভালোবাসতে পারে না সে, মান্তুর কাছে আসতে পারে না। রণেনের এই দ্বিধা, এই দ্বিচারিতকে ঘৃণা করে মান্তু। আবার চঞ্চলকে হয়ত সে ভালোবাসে, কিংবা তার কী কোন গোপন অতীত আছে চঞ্চলকে নিয়ে? স্পষ্ট হয় না কিছুই, মমতার সঙ্গে কাকে মিশতে বারণ করে সে? দাদাকে? কেন? কিংবা দাদার চোখ

দিয়ে নিজের নারীত্বকে যাচাই করে নিতে চায় কেন সে? রণেন তাকে যে শীতলতা উপহার দিয়েছিল বা চঞ্চলের কাছে যে ভালোবাসা সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল তারই শেষ আশ্রয় ছিল দাদা, অথচ মমতার সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনে ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবিনাশ খানিকটা নেগলেক্টই করেছিল বোন মান্তু ও তার বেড়ে ওঠা সমস্যাকে। মান্তুকে যেদিন খুব সুস্থ মনে হয় অবিনাশের তার পরের দিনই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে সে। দরজা বন্ধ ছিল না, ভেজিয়ে রাখা ছিল। ক্রমশ বেড়ে ওঠা অবসাদে ক্লান্ত মান্তু যখন অবসাদ খানিকটা কাটিয়ে ওঠে তখন সে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, অবসাদ ও আত্মহত্যার এই লক্ষণগুলো আমাদের চেনা। এমনকি তার দরজা বন্ধ না করার পেছনে কি এমন কোন ইঙ্গিত থেকে যাচ্ছে যে সে হয়তো সমস্যার মুক্তি খুঁজছিল, তাই বাঁচার সামান্য একটা ইচ্ছেও থেকে গিয়েছিল তার মনে। অ্যান্ড্রু সলোমন যাকে বলেন - সমস্যামুক্তির আশায় আত্মহত্যা (সুইসাইড থ্রু আ ফল্টি লজিক) ,এই ধরনের আত্মহত্যায় মানুষের মনে একধরনের ভুল ধারণা তৈরি হয় যে তার এই অসহনীয় সমস্যাগুলির থেকে মুক্তির একমাত্র পথ আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা নিয়ে ডাঃ ঘোষাল ও ওসির কথোপকথন পাঠকের মনে ধাক্কা দিয়ে যায়, তারা অতি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে আত্মহত্যাকে দেখতে গিয়ে ডাক্তারি পরিভাষার কথা বলেন, তারা বলেন এটি একটি সাইকোসোমাটিক কেস এবং এইধরণের কেসে সাধারণত গলায় দড়ির পন্থাই বেছে নেয় আত্মহত্যাকারী।

মান্তুর মৃত্যুর পর অবিনাশ ভাবতে চেয়েছে মান্তুর এই আত্মহত্যার জন্য কে দায়ি? নিজে নেগলেক্ট করেছে সে বোনকে, জানে সে, পাশাপাশি সে ভাবতে থাকে, - "...বোধবুদ্ধিহীনভাবে হলেও, মান্তু তো চঞ্চলকে ভালবাসত। সে কি চঞ্চলের কাছেও

কিছুটা প্রোটেকশন পেতে পারত না ?.....মন এবং শরীরের--জীবনের--সে অনির্ণেয় তৃতীয়মাত্রার হকদার কেউ হতে পারে না। না ব্যক্তি, না সমাজ, না রাষ্ট্র। নাঃ, কেউ না"[lviii]

কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজের এই ভাবনাকে নস্যাৎ করে ভেবেছে, - "আমার চূড়ান্ত অবহেলার কারণেই মান্তুর আত্মহত্যা। মমতার জন্যে আমার উদভ্রান্তিই সে অবহেলার কারণ। মন্টুর মৃত্যুর জন্যে কি মমতা কোনও ভাবেই দায়ী নয়?" [lix]

সন্দীপনের উপন্যাসে যে বহুমাত্রিক স্বর থাকে তাই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে এই আত্মহত্যার ক্ষেত্রে, অবিনাশ, রণেন, মমতা, চঞ্চল, ডাঃ ঘোষাল বা ওসি প্রত্যেকেই যেন তাঁদের মত করে দেখতে চেয়েছেন এই আত্মহত্যাকে, পড়তে চেয়েছেন। ঠিক যেমনটা সমাজের ঘটে আত্মহত্যার পর মানুষের প্রতিক্রিয়া হয়। কেউ মান্তুর আত্মহত্যার জন্য দায়ী করবে ধর্ষণের ঘটনাটিকে, কেউ রণেনের থেকে পাওয়া অপমানকে, কেউ অবিনাশের অবহেলাকে, কেউ চঞ্চলের প্রতি অবরুদ্ধ ভালোবাসাকে আবার কেউ মমতার প্রতি ঈর্ষা বা মান্তুর পাগলামিকে, অসুস্থতাকে। কিন্তু কোন একটি কারণ দিয়ে লেখক অন্তত বাঁধতে চান নি এই ঘটনাকে।

৪.১৬.৩ *এখন জীবন অনেক বেশি সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা* : দায়ী কে?

নিখিলের বন্ধু কল্লোল বাগচী অফিসের অ্যান্টি-চেম্বারে পনেরো বছরের দ্রৌপদীকে ভোগ করে। আর বাইরে বসে থাকে তার মা নমিতা। নমিতা মোটা হয়ে যাওয়ায় আর তাকে মনে ধরে না কল্লোলের। উপন্যাসে (১৯৯৪) এরপর লেখক যে দৃশ্যে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে দ্রৌপদীর আত্মহত্যার কথা জানান তা বাস্তব না স্বপ্ন না কল্পনা তা পরিষ্কার হয় না। তবে মন্ত্রী শান্তাপ্রসাদের গেল হাউসে দ্রৌপদীকে পাঠানোর জন্য কল্লোলকে ক্রমাগত মারতে

থাকে অমি ও জার্মান। নিখিলের মনে প্রশ্ন জাগে,যে নাবালিকা ধর্ষণ করেও কেন কল্লোলের সশ্রম কারাদণ্ড হবে না,ফাঁসিই বা হবে না কেন। কিন্তু আসলে নিখিল প্রকাশ্যে প্রতিবাদ তো দূরে থাকে, নিজের অপছন্দের কথাও কখনো জানিয়ে উঠতে পারে না কল্লোলকে। সে চেয়েছে কেউ প্রতিবাদ করুক, অমি উদ্ধার করে আনুক দ্রৌপদীকে, কিন্তু সে নিজে কেবল কামনা, প্রতিবাদের ইচ্ছে, ব্যর্থ নিয়ন্ত্রণ ও দুঃস্বপ্নে জেরবার হয়েছে। আর তাই হয়ত তার স্বপ্নদৃশ্যে অমিত আর ওঁরাও একসঙ্গে জানতে চায় যে দ্রৌপদীর আত্মহত্যার জন্য - "দায়ী কে?" [lx]

৪.১৬.৪ *এসো নীপবনে* : খুন না আত্মহত্যা?

এই উপন্যাসটিকে (১৯৯৫) লেখক গোয়েন্দা কাহিনী বলেছেন। জয়ন্তীর চিঠিতে প্রথম অংশের নাম -'পুরোহিতের আত্মহত্যা' - যা পড়ে আমরা বুঝতে পারি যে পুরোহিতের ছদ্মবেশধারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার লোকেশ গাউর। লোকেশকে হত্যা করবে জয়ন্তী এর পরে এবং পুলিশ ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করবে এবং পরে নিশ্চিত হবে যে এটি একটি ঠান্ডা মাথার খুন। কিন্তু লোকেশের এই মৃত্যু কি নিছক খুন? আত্মহত্যা নয়?

কাহিনী এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানতে পারি বিয়ের আগে লোকেশের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্ক শেষ করতে চায় জয়ন্তী। লোকেশ মেনে নেয় এই ঘটনাকে। কিন্তু সোমনাথের সঙ্গে সিনেমা হলে জয়ন্তীকে একান্ত মুমূর্তে দেখে ফেলা লোকেশ জয়ন্তীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। লোকেশ ও জয়ন্তীর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের নানা ছবি জয়ন্তীর স্বামী সোমনাথকে রেজিস্ট্রি পার্সেল করে পাঠায় সে। দীঘায় সে কথা জয়ন্তীর কাছে জানায়

সোমনাথ ও তাকে ক্ষমা করে বলে - “আমি তো তোমাকে বিয়ে করেছি জয়ী। তোমার কৌমার্যকে নয়।” [lxi]এরপর ভোর রাত্রে হোটেলের বাথরুমের সে আত্মহত্যা করে।

সোমনাথের আত্মহত্যার কথা সে চিঠির ‘চার’ নম্বর অংশে বলে। সোমনাথের আত্মহত্যা নিয়ে তখন বিশদে কিছু না বললেও সে শুধু জানায় যে রিস্ট কেটে হাত জলে চুবিয়ে রেখেছিল সোমনাথ। তার আগে নিজে কিচেনে গিয়ে জল গরম করে এনেছিল এবংবাথ্রুমের দরজায় ছিটকিনি দেয় নি সে। সঙ্গে একটি সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় সারা ভারত ঘোরে জয়ন্তী, নিখোঁজ লোকেশের খোঁজে। দুবার তাকে হত্যা করতে গিয়েও ফসকে যায় সে। উপন্যাসটির শেষে জয়ন্তীর কাছে যে চিঠিটি পাঠায় লোকেশ তা কি সুইসাইড নোট?

জয়ন্তীকে সে কল্যাণীয়া বলে সম্বোধন করে ও চিঠিতে উল্লেখ করে যে - “..আর তোমাকে বলতে হবে না যে আমি অবশেষে আমার মৃত্যু কামনায় করছি এবং তোমার হাতে এবং কেন। আজ তিন বছর ধরে মৃত্যুর আগে আগে ছুটে ছুটে আমি অবশেষে ক্লান্ত। ...এক কথায় আর কোথাও পালাবার শক্তি আমার নেই। হ্যাঁ, আমি খুনি। সোমনাথের মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী। আমার শাস্তি মৃত্যু। এবং তোমার হাতে” [lxii]

এই উপন্যাসের এই দুটি আত্মহত্যা একেবারে ভিন্ন ধরনের। লোকেশের আত্মহত্যায় যে ক্লান্তির ছাপ,অপরাধবোধের ছাপ তা থেকে স্পষ্ট যে এটি ডুর্খেইম কথিত বাধ্যতামূলক আত্মহত্যা(Obligatory Altruistic Suicide), মুক্তির কোন উপায় নেই জেনে,অপরাধভারে জর্জরিত লোকেশ তাই তাকে খুন করতে আসা জয়ন্তীর জন্য বিশদে পথনির্দেশ পাঠায়, জয়ন্তীর রোষ যাতে শান্ত হয় তাই বন্দুকের গুলির বদলে ক্ষুর দিয়ে হত্যার নিষ্ঠুর উপায় বাতলে দেয় তাকে। এটি অবশ্যই এক ধরনের Anomic Suicide-

ও বটে। লোকেশের মনে কোনো নৈতিকতার বোধ তৈরি করতে না পারা সমাজও কি ততটাই দায়ি নয় এক্ষেত্রে? পাশাপাশি উল্লেখ করতে মেনিঙ্গারের বক্তব্য - আত্মহত্যা আসলে এক বিশেষ ধরনের মৃত্যু যেখানে মৃত্যুর পাশাপাশি হত্যার ইচ্ছা ও খুন হওয়ার ইচ্ছার লুকিয়ে থাকে। মৃত্যুর থেকে আলাদা এই খুন হওয়ার ইচ্ছা। " ...being killed is the extreme form of submission just as killing is the extreme form of aggression" [lxiii]এক্ষেত্রে খুন হওয়ার ইচ্ছেতেই সবচেয়ে বেশি প্রবল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মগ্নচেতনে কাজ করা যে বিবেকের কথা বলেন মেনিঙ্গার তার উদাহরণ লোকেশ। এই বিবেককে মনে করা হয় আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির একটি অংশ, যা বাইরের দিকে চালিত হওয়ার পরিবর্তে নিজের দিকে নির্দেশিত হয়। আসলে খুন হওয়ার এই ইচ্ছে অসচেতন মনের একটা ইচ্ছে, যা এক্ষেত্রে সচেতন ইচ্ছেয় পরিণত হয়েছে।

যে অনায়াস ভঙ্গিতে, বারবার উপন্যাসে আত্মহত্যার কথা বলেছেন লেখক তাতে তাঁর গল্পে জীবন বা মৃত্যু কতটা জুড়ে থাকে একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য, - "...জীবন আর মৃত্যুকে প্রত্যেক মুহূর্তে মুখোমুখি করে দিয়ে যে অস্তিত্ব আর চেতনার সম্পর্ককে বুঝতে চেয়েছিলেন তিনি, সত্যাশ্রয়ী হতে চাইলে তার বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার আর পথ নেই কোথাও।" [lxiv]

ক্ষতস্থানের রক্তঝরানো দেখাতে গিয়েই লেখকের হাতে মৃত্যুর কথা,হত্যার কথা এবং সর্বোপরি আত্মহত্যার কথা উঠে এসেছে বার বার। আত্মহত্যাকে তিনি প্রশ্ন করেন নি, আত্মহত্যাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন নি, কোনো পার্থিব কারণ, চিকিৎসা শাস্ত্র দিয়ে বুঝতে নেওয়ার কোন প্রয়াস ফুটে ওঠে নি তার লেখায়। 'ডাবলবেডে একা' উপন্যাসে আইভি যখন নিজের আত্মহত্যার চেষ্টার কথা বলে অতি অনায়াসে তখন তা যেন

খানিকটা দেখনদারি মনে হয়। তার ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের কথা, স্লিপিং পিল খেয়ে পরে হাত কাটার কথা, সমস্ত খুঁটি নাটি দিক বলার মধ্যে আত্মহত্যা বিষয়ে লেখকের ভাবনা খুঁজে নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয় আমরা। আসলে সন্দীপন ক্রমাগত সময়ের কথা বলে চলেছেন। ঠিক ভুল, উচিত, অনুচিত এসব নিয়ে ভাবার কোন বাসনাই কখনো ছিলো না তাঁর। 'আত্মগত কিন্তু অচেতন' এইসব অনুভূতিরা ঠাঁই পেয়েছে তাঁর লেখায় বড় অনায়াসে। সেইজন্যই জীবনে যেমন আত্মহত্যা আছে তেমন তাঁর উপন্যাসেও আত্মহত্যা আছে। বহুবিধ ব্যাখ্যা, বহুবিধ মতামত, মতভেদ, তত্ত্ব, দ্বন্দ্ব সব নিয়েই তা উপস্থিত। সব শেষে বলা যায় 'ভারতবর্ষ' উপন্যাসের পিনাকীর বক্তব্যের কথা -

"আত্মহত্যা? হ্যাঁ, সেও একটা খুন বটে, আবার খুন ঠিক নয়ও। কারণ প্রত্যেক আত্মহত্যাকারীর কাছে সেই খুন তো একটা মুক্তি - যাকে বলে জীবন যন্ত্রণা, তা থেকে। শারীরিক বা মানসিক সে যন্ত্রণার উৎস যেখানেই হোক। অনেকে বলেন আত্মহত্যার আগে মানুষ পাগল হয়ে যায়, অন্তত সাময়িকভাবে। পাগল? না না একেবারেই ভুল। তাহলে তো প্যাথলজিক্যাল পাগল যারা, তারা প্রত্যেকে আত্মহত্যা করত।" [lxv]

কার্ল মেনিঙ্গার বলেন যে কাল্পনিক আত্মহত্যা নিয়ে বহু সাহিত্য, নাটক তৈরি হলেও আত্মহত্যাকে যুক্তিযুক্তভাবে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বা মনোবিজ্ঞান দিয়ে কেউ ব্যখ্যা করতে চান নি, এর পেছনেও কারণ হিসেবে তিনি ট্যাবুর কথাই বলেন। এই ট্যাবু যে সন্দীপনের হাতে বারবার ভেঙে গেছে তা বলাই বাহুল্য। শেষে উদ্ধৃত পিনাকীর এই আত্মহত্যা বিষয়ক বক্তব্যে আমরা ছাপ খুঁজে পাই মার্কিন লেখক অ্যান্ড্রু সলোমনের। আত্মহত্যাকে তিনি বিষাদের একটি লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেন এবং বলেন যে বহু বিষাদগ্রস্ত মানুষ যেমন আত্মহত্যাপ্রবণ হতে পারে তেমনিই আত্মহত্যায় সামিল মানুষের মধ্যে বিষাদের কোন লক্ষণ নাও থাকতে পারে। ঠিক তেমনই আত্মহত্যাকরীকে পাগল

বলে দাগিয়ে দিতে অনিচ্ছুক পিনাকী। লেখক আত্মহত্যাকে সময়ের অসুখ বলেই মনে করেছেন, তাই ডাক্তারি পরিভাষায় আত্মহত্যার যে ব্যাখ্যা বারবার ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায় তাতে খানিকটা ব্যঙ্গের সুর যেন কানে বাজে , সে আইভীর আত্মহত্যার চেষ্টার বর্ণনা হোক বা মান্তুর আত্মহত্যার পর ডাক্তারের বক্তব্য। আধুনিক মানুষ এই সময়ে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের ভাবনার থেকে বিচ্ছিন্ন, তার জীবনের যে জটিলতা কেবল কোন সামান্য চাওয়া, পাওয়া দিয়ে মাপা যায় না। আমরা হয়ত আজও তা মানতে পারি না , তাই আপাত সুখী, উজ্জ্বল মানুষের আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের হতাশ করে, বিস্মিত করে। কিন্তু লেখক সন্দীপন যুগের এই লক্ষণকে চিনতে দেরি করেন নি। পূর্ণেন্দু পত্রী তো তাঁর বিষয়ে বলেছেনই - "নখাগ্র থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত সচেতন কোনও সমসাময়িক লেখককে খুঁজতে গেলে, ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে, আমি পাকড়াবার মত এই একজনকেই পাই অর্থাৎ সন্দীপন(কলকাতার দিনরাত্রি)। " [lxvi]

এই সময়কার উপন্যাস ও উপন্যাসে আত্মহত্যাকে বোঝার জন্য হাংরির লেখক সন্দীপনের উপন্যাসকে মাথায় রেখে এই হাংরি আন্দোলনেরই এক লেখক, শৈলেশ্বর ঘোষের একটি অনুবাদের কথা বলে বক্তব্য শেষ করি। 'আঁতোয়া আর্তো'র একটি লেখার অনুবাদ করেন শৈলেশ্বর *আত্মহত্যা কী কোনো সমাধান?*। সেখানে তিনি বলেন –

> "আমরা বেশ ভালোভাবেই আমাদের জীবনের মূল্যমান যাচাই করে দেখেছি, অন্যদের বিশেষ করে নিজেদের মুখোমুখি এই জীবনে কতটা বাধা রয়েছে তাও জানি। আমরা জনি, কোন ইচ্ছাকৃত স্থূলতা, কোন আত্মঅস্বীকারের প্রবৃত্তি, সুস্থ চিন্তার কোনো অসারতা রোগ প্রতিদিন আমাদের তাড়না করে চলেছে। আমরা সরাসরি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করছি না এখনই – ততক্ষণ অন্তত আমাদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া হোক"[lxvii]

কোনো নীতিগত প্রশ্নে নয় বরং সুস্থ ভাবে, নিজেকে জেনে বুঝে প্রতিদিন তিল তিল করে আত্মহত্যা করছে যে আধুনিক মানুষ, তাদের কথা উঠে এসেছে এই পর্বের গল্পে ও উপন্যাসে। সেই আত্মহত্যার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমরা তৈরি করার চেষ্টা করলাম।

তথ্যসূত্র

i ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ- *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা,১৯৭৬, পৃষ্ঠা-১৫৩

ii ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ- *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা,১৯৭৬, পৃষ্ঠা-৭৬

iii বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, *আত্মহত্যার অধিকার,* দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃ.৫৩

iv ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ১২৮

v তদেব, পৃ. ৪৪৬

vi তদেব, পৃ. ৮০২

vii বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ – *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (পঞ্চম সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ১৫৯

viii তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৮

ix ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৮২৮

x তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৫

[xi] তদেব, পৃষ্ঠা- ৯৫৫

[xii] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ- *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা,১৯৭৬, পৃষ্ঠা- ১৫৫

[xiii] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড),* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃষ্ঠা- ৩৬৪

[xiv] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *গল্পগুচ্ছ,* বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৮, পৃষ্ঠা- ৮৯

[xv] তদেব, পৃষ্ঠা- ৯১

[xvi] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র, *আত্মহত্যার অধিকার,* দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৫৫

[xvii] বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ – *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (পঞ্চম সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৮২

[xviii] রায়, অলোক – *বিশ শতক,* প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১০, পৃষ্ঠা-৭৮

[xix] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র - *আত্মহত্যার অধিকার,* দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৬৬

[xx] রায়, সত্যেন্দ্রনাথ – *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৬৩

[xxi] গুপ্ত, জগদীশ – *জগদীশ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৬, পৃ. ১২২

[xxii] তদেব, পৃ ১৫৩

[xxiii] রায়, অলোক – *বিশ শতক* , প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১০, পৃষ্ঠা-২১৭

[xxiv] বসু, বুদ্ধদেব – *নির্জন সাক্ষর* , ডি.এম.লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬, ১৯৫১, পৃষ্ঠা- ২০০

[xxv] বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ – *বিভূতি রচনাবলী (৩য় খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৪০৩, পৃষ্ঠা- ১৮২

[xxvi] বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, ১৩৮২, পৃষ্ঠা-৩০৪

[xxvii] বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড),* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা- ৩৭

[xxviii] গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড),* গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৪৮

[xxix] বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ – *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (পঞ্চম সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-২৫৩

[xxx] গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড),* গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৮, পৃষ্ঠা-৯৯

[xxxi] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক – *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১, পৃষ্ঠা- ৩৩২

[xxxii] বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র - *আত্মহত্যার অধিকার,* দ্. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৫৯

xxxiii চক্রবর্তী, অরিন্দম – '*মরিবার হল তার সাধ', ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস,* অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১৩, পৃষ্ঠা -৮৪-৮৫

xxxiv বসু, শ্রীমনোজ – *ভুলি নাই,* বেঙ্গল পাবলিশার্স,১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা,১৩৫২, পৃষ্ঠা-৬

xxxv চট্টোপাধ্যায়,শক্তি, *গদ্যসংগ্রহ,* দ্বিতীয় খণ্ড,আখ্যানবিচিত্রা,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৭৭

xxxvi বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র - *আত্মহত্যার অধিকার,* দ্. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা-৭০

xxxvii বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ – *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (পঞ্চম সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩০৪

xxxviii বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ – *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (পঞ্চম সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-৩২৭

xxxix বসু, সমরেশ – *মহাকালের রথের ঘোড়া* , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা- ৮৬

xl ভট্টাচার্য, নবারুণ – *উপন্যাস সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, [*দুনম্বরী একটা সময়ের মধ্যে আমরা বাস করছি...*/মল্লার/১৪১০-১১/পৃষ্ঠা-৩২৯], গ্রন্থ পরিচিতি, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ৫০৯

xli লাহিড়ী, রণবীর -*'চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল' : পাগলামি-পলায়ন-প্রতিবাদ: একটি আত্মহত্যার রিপোর্ট* , দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ৩/৫২, বিজয়গড়, কোলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা-৭৯

xlii তদেব, পৃষ্ঠা-৮২

[xliii] ভট্টাচার্য, নবারুণ – *উপন্যাস সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, ২০১৩, পৃষ্ঠা-৬৭

[xliv] তদেব, পৃষ্ঠা-৭৬

[xlv] তদেব, পৃষ্ঠা-১০৬

[xlvi] তদেব, পৃষ্ঠা-৫১৮-১৯

[xlvii] তদেব, পৃষ্ঠা-১২৪

[xlviii] তদেব, পৃষ্ঠা-১২৫

[xlix] চক্রবর্তী, অরিন্দম – *'মরিবার হল তার সাধ', ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস,* অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ২০১৩, পৃষ্ঠা-93

[l] কর, বিমল - *উড়ো খই* , দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯১৪, পৃ.১৩১-৪০

[li] বাংলা উপন্যাস: *বীক্ষা ও অন্বীক্ষা* (সম্পা. সুবল সামন্ত), এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১১, পৃষ্ঠা-২৪

[lii] তদেব,পৃষ্ঠা -৪৮৮

[liii] শংকর- *নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-১৭৫

[liv] চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-২,* আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০১২, প্রচ্ছদ কথন

[lv] তদেব, নান্দীমুখ

[lvi] চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-৩,* আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ৯০

[lvii] চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-১*, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০০৬, পৃষ্ঠা-২০৩-২০৪

[lviii] তদেব, পৃষ্ঠা-২৩৩-২৩৪

[lix] তদেব, ২৩৩-২৩৪

[lx] চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-৩*, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০১৫, পৃষ্ঠা-৩০০

[lxi] চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-১*, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০০৬, পৃষ্ঠা-১০৭

[lxii] তদেব, পৃষ্ঠা-১১৩

[lxiii] Menninger, Karl - *Man Against Himself*, Harcourt, Brace and World, Inc. New York, P-45

[lxiv] চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-৩*, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০১৫, প্রচ্ছদ কথা

[lxv] তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩০

[lxvi] চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-১*, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০০৬, প্রচ্ছদ কথা

[lxvii] ঘোষ, শৈলেশ্বর – *আত্মহত্যা কী কোনো সমাধান?*

দ্র. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা.) – *ক্ষুধার্ত সংকলন*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২২০

উপসংহার

আধুনিক আত্মহনন: অকারণ হনন, নাকি সমবেত হনন?

বাংলা উপন্যাসে আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে পৌরাণিক নানা অনুষঙ্গ ও প্রবণতা বারবার ফিরে এসেছে উনিশ শতকের শুরুর দিকের উপন্যাসে, ডুর্খেইম যে Altruistic আত্মহত্যার কথা বলেন তা প্রধান হয়ে উঠেছে এই অংশের উপন্যাসে। আত্মহত্যার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজ আত্মহত্যাকে অস্বীকার করলেও দেশের জন্য, দশের জন্য সমাজ, ধর্ম, পরিবার, প্রেম বা আদর্শের খাতিরে আত্মাহুতি বরাবরই বাহবা কুড়িয়েছে। মূলত মেয়েদের ক্ষেত্রে জহর ব্রত, চিতারোহণ ছিল সর্বত্রই প্রশংসিত। আত্মত্যাগের মহিমায় এভাবেই কত সামাজিক অত্যাচার বা অন্যায়কে আড়াল করা হয়েছে। যেভাবে একসময় সীতার প্রতি ঘটে যাওয়া অসম্মান ও অন্যায়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর পাতাল প্রবেশকে আত্মাহুতি বলা হয়েছে। উনিশ শতকে বঙ্কিম সমকালীন উপন্যাসেও তার একেবারে অভাব নেই আর তাই হয়তো এই সময় অবধি পদ্মাবতীর আত্মত্যাগ নিয়ে বারবার কাহিনি নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ হতে থাকে। উপন্যাসে পুরুষের ক্ষেত্রে এই আত্মহত্যার কারণ হিসেবে উঠে এসেছে আদর্শ রক্ষা, প্রতিশ্রুতি রক্ষার মতো ভাবনা।

অন্যদিকে আত্মহত্যা ছিল লেখকদের কাছে সব সমস্যার এক অভাবনীয় ওষুধ। যেখানেই কাহিনিতে জটিলতা, দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে, সেখানেই Dues Ex Messina-র মতো আত্মহত্যার আমদানী করে কাহিনিকে স্বস্তি দান করা হয়েছে। কখনো বা হয়তো এভাবে সামাজিক মূল্যবোধকে সমর্থন জানিয়েছেন লেখক। মৃত কুন্দনন্দিনী মধ্যবর্তিনী হয়ে থেকে যাবে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর জীবনে। তারা কোনদিন স্বস্তি বোধ করবে না। এই

নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, পাপের শাস্তি দিয়েছেন। সূর্যমুখী ফিরে আসার পর তাদের সংসারে কুন্দনন্দিনীর উপস্থিতি জনিত যে সংকট তা থেকে মুক্তি পেতে হীরা মালিনীর সাহায্যে কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যা ঘটিয়েছেন লেখক। ঠিক এমনটাই ঘটেছে চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর জীবন থেকে সমস্ত অস্বস্তি দূর করার উদ্দেশ্যে প্রতাপের আত্মহত্যার ঘটনাতেও।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আত্মহত্যা এসেছে একটি নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। সমাজের আর দশজনের জন্য কিংবা উপন্যাসের পরিণতির স্বার্থে নয়, উপন্যাসের চরিত্রটির মানসিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই ভাবে, একেবারে তারই প্রয়োজনে বাংলা সাহিত্যে তিনি আত্মহত্যার এক নতুন ধরণ আনেন। কপালকুণ্ডলার আত্মহত্যা, কিংবা মবারকের মৃত্যু – একে কী আমরা শুধু আত্মাহুতির প্রকোষ্ঠে ফেলে স্বস্তি বোধ করতে পারি? আসলে এই সময় থেকে ব্যাক্তিতাবোধের জন্ম হচ্ছে, মানুষ নিজের ভালো লাগা, চাহিদা নিয়ে ভাবছে, আত্মাহুতির পরিবর্তে এই সময় একদিকে যেমন উঠে আসছে ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া অতৃপ্তির, Egoistic Suicide-এর কথা, তেমন কপালকুণ্ডলার মধ্যে আত্মহননের যে ইচ্ছা তার সঙ্গে অভিমানের চেয়ে অনেক বেশি জড়িয়ে থাকে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতাবোধ। মবারক দরিয়া বিবিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে তার মৃত্যু আবশ্যক। যুদ্ধে তার আত্মাহুতির প্রচেষ্টা আসলে দরিয়ার প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধবোধেরই প্রকাশ।

এক্ষেত্রে একটি কথা বলতেই হয় Emile Durkheim-এর Altruistic ও Egoistic Suicide–এর বিভাজন বঙ্কিমের হাতে বহুবার ভেঙ্গে গেছে। মবারকদের আত্মাহুতির বাসনার পাশাপাশি বারবার উঁকি মেরেছে ব্যক্তি মানুষের চাহিদা, অপ্রাপ্তি, অধিকারবোধ

বা অপরাধবোধ – আর এখানেই বঙ্কিমের আধুনিকতা। তাঁর উপন্যাসেই প্রথম আমরা আত্মহত্যার সেই নির্বিকার অথচ স্বাভাবিক রূপটি পাই।

বলা বাহুল্য, তাঁর সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসের অন্যান্য ক্ষেত্র (বিষয়, ভঙ্গী, মূল্যবোধ)-এর মতো আত্মহত্যাতেও বঙ্কিম-অনুসারী। তবে সেই অনুসরণ কখনো কপালকুণ্ডলার মতো আরেকটি আত্মহত্যার জন্ম দেয় না, বরং সেখানে কুন্দ, রোহিণীর আত্মহত্যারই একঘেয়ে অনুসরণ চলতে থাকে। শুধু তাই নয়, বঙ্কিম পূর্ববর্তী আত্মহত্যার যে দুটি ধারার কথা উল্লেখ করেছি, এসময়ে সেগুলিও বারবার তৈরি হয় উপন্যাসে। মহিলাদের 'আত্মাহুতি' ছাড়াও আসে পুরুষের আত্মত্যাগের অনুষঙ্গ – বীরত্ব, পৌরুষ, আদর্শবোধ, ধর্মরক্ষার মতো কিছু ভারী ভারী কারণ উঠে আসে এখানে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের শুরুতে সমাজের অস্থিরতাকে যদি মাথায় রাখি তবে তার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আত্মহত্যার অভাব বেশ চোখে পড়ার মতো। উপনিষদে গভীর আস্থা রবীন্দ্রনাথকে 'আত্ম'র বিনাশে নয় বরং এক অখণ্ড ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনবোধের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে আত্মহত্যা যদিও প্রবল প্রভাব ফেলেছিল তাঁর উপর। তাঁর উপন্যাসে আত্মহত্যার সম্ভাবনা তৈরি হয়েও অসফল হয়েছে অনেকবার, আসলে জীবনের উপর ভরসা করতে চেয়েছেন তিনি, তাও বলতে হবে *চতুরঙ্গ*-তে ননীবালার যে আত্মহত্যা তা মানুষের জটিল আধুনিক মননেরই পরিচায়ক। যা ভালো, যা সমাজের ঠিক করে দেওয়া স্বাভাবিক, যা আপাত দৃষ্টিতে ঠিক ও ভাল, তাকেই বেছে নেওয়ার সহজ সমীকরণ দিয়ে আধুনিক মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে যে ব্যক্ত করা যায় না তা ননী চরিত্রটি যেন প্রমাণ করে দেয়।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকতার অনিবার্যতার চিহ্ন হিসেবে কীয়ের্কেগার্ডের দর্শনে 'angst'-এর ভাবনা বা জগতের অযৌক্তিকতার নিদর্শন 'দ্য মিথ অব্ সিসিফাস'-

এর জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনেক দূরবর্তী। অস্তিত্ববাদী দর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল অ্যাবসার্ড আত্মহত্যা ও দার্শনিক আত্মহত্যা। আত্মহত্যা আসলে অ্যাবসার্ডকে মেনে নেয়। কিন্তু আত্মহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া অ্যাবসার্ডের ঠিক বিপরীত মেরুর ঘটনা। এইসময় কামু আত্মহত্যাকে একধরণের বিচ্ছিন্নতা বলছেন এবং বলছেন আত্মহত্যা আসলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছার প্রকাশন নয়। অস্তিত্ববাদীরা বলতে চেয়েছিলেন আমার স্বাধীনতার একমাত্র প্রকাশ ঘটতে পারে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। *আট বছর আগের একদিন* কবিতায় ফাল্গুন রাতে একটি উপভোগ্য জীবন হঠাত্ই শেষ হয় আত্মহত্যায়। নারীর হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, অর্থ, কীর্তি, সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও এই আত্মহত্যা তো এক 'বিপন্ন বিস্ময়'। অস্তিত্ববাদী দর্শনের এই রূপ বাংলা সাহিত্যেও পাই। অথচ রবীন্দ্রনাথের মহৎ জীবনবোধ এই বাস্তবতাকে ক্রমাগত অস্বীকার করে যায়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রবীন্দ্র বৃত্তের মধ্যে থাকা প্রভাতকুমার বা শরৎচন্দ্রের লেখায় আত্মহত্যা ততখানি সংকট নিয়ে উপস্থিত হয় নি। জটিল মনস্তত্ত্ব দিয়ে আত্মহত্যাকে ব্যাখ্যার চেষ্টার পরিবর্তে পাপ-পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত ও নীতিবাদের কথা ফিরে ফিরে আসছে। রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে থাকা লেখকরা আর কোনো রকম গভীর, উন্নত, সুভগ জীবনবোধের আড়ালে আত্মহত্যাকে ঢেকে রাখলেন না। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিমল করেরা দেখালেন যে আধুনিক সমাজ আত্মহত্যাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাই কখনও নিয়তিবাদের অজুহাতে, কখনো সমাজের নির্ধারিত রাস্তায় চলতে না পেরে, কখনো বা মানব মনের জটিলতম অংশের বহিঃপ্রকাশে আত্মহত্যার বাসনা তৈরি হয়ে যায়। তাঁদের উপন্যাসে উঠে আসা মানুষগুলো যখন আত্মহত্যা করে, তখন পাঠকও প্রশ্ন করতে ভুলে যায় যে কেন এরা

আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এইসময় ছোটগল্পে নানারকম আত্মহত্যার সম্ভাবনা তৈরি হয় যা ভিন্ন এক বিশদ গবেষণার দাবি রাখে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের *কুয়াশায়* (১৯৩৮) গল্পটিতে নিঃসহায়, বিধবা সরমার এই আত্মহত্যাও আসলে সমাজ নির্ণীত। পাপ, পুণ্য, মূল্যবোধ দিয়ে বেঁধে দিয়ে সরমাদের জন্য আর কোনো পথ খোলা রাখে না সমাজ আত্মহত্যা ছাড়া।

সমরেশ বসুর *পাপপুণ্য* গল্পে স্বামীর ঘর ফেরত বিন্দু কেন আত্মহত্যা করল তা বুঝে উঠতে পারে না কেতু। কামনার বশে অজ্ঞাতে পিতা-পুত্রীর সঙ্গমের পাপ বিষয়ে বুঝতে পেরে বিন্দু পাপের পরিনামে আত্মহত্যা করে। এইসব অন্ধকার দিকগুলিকে টেনে এনে গল্পকাররা জীবনের নাস্তিবোধের যে ছবি আঁকেন, সেখানে আত্মহত্যার গুরুত্বও ক্রমশ বাড়তে থাকে।

আসলে সময়, সাহিত্য, তার মনে এই ভাবনাটা তৈরি করে দিয়েছে যে কোন্ মানুষটা কখন কেন আত্মহত্যা করবে তা ঠিক সহজ উত্তরে মিলিয়ে দেওয়ার মত বিষয় নয়। মানিক বন্দোপাধ্যায় আত্মহত্যাকে আমাদের অধিকার বলে দাবি করার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন তাঁর রচনায়। জীবনানন্দ দাশের *আট বছর আগের একদিন* কবিতার নায়ক

... কোনো

নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;

বিবাহিত জীবনের সাধ

কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,

সময়ের উর্দ্ধতনে উঠে এসে বধূ

মধু – আর মননের মধু

দিয়েছে জানিতে;

হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে

এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই;

- জীবনের সমস্ত পার্থিব চাহিদা যার পূরণ হয়ে গেছে তার প্রসঙ্গে কবি যখন বলেন যে–

তাই

লাসকাটা ঘরে

চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের' পরে।

তখন সহজ কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ আমাদের মনে যে ধাক্কা তৈরি হয় তা লেখকের ইচ্ছাকৃত। এমন অনায়াসে তিনি জীবনের সব কামনা বাসনার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত নিরাসক্ত আত্মহত্যার চাহিদাকে 'তাই' শব্দটি দিয়ে যুক্ত করেন যে মানুষের যুক্তিবোধ ভেঙ্গে যায়। স্পিনোজা একসময় বলেছিলেন আত্মহত্যা অসম্ভব, তাঁর ঠিক বিপরীতে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যাকে অধিকার বললেন মানিক বন্দোপাধ্যায়।

হাংরির লেখকরা 'আত্মার বন্দীত্ব' থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। একেও এক অর্থে আত্মহত্যার ইচ্ছা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আসলে আত্মহত্যা মানুষের ব্যক্তিতার বোধ থেকে তৈরি একথা আমরা আগেও বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিতার বোধ থেকে তার নিজের হত্যার মনস্তত্ত্ব বোঝা কি এতটাই সহজ? নিজেকে যন্ত্রণা দেওয়া তো সবচেয়ে কঠিন। হত্যার চরমতম রূপই তো আত্মহত্যা। আধুনিক সময়ের সিম্পটম্ হিসেবে আত্মহত্যাকে অস্বীকার করতে পারেন না বিশ শতকের ঔপন্যাসিকেরা। দুঃখ, হতাশা, অপ্রাপ্তি, শোকের মতো কোনো কারণ নির্ণয় করার চেষ্টাও করেন না তাঁরা,

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই অকারণ আত্মহত্যার বিলাসিতা থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আত্মহত্যার পিছনে থাকা সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রসঙ্গ আসে।

সুবিমল মিশ্রের *হারাণ মাঝির বিধবা উভয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি* গল্পে হারাণ মাঝির বিধবা বউয়ের আত্মহত্যা তথা তার মৃতদেহকে সামাজিক অসুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেন লেখক। সে কেন আত্মহত্যা করল তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুর্ভিক্ষকে অস্বীকার করতে চাওয়া সরকার হারাণ মাঝির বিধবার বউয়ের মৃত্যুর জন্য ক্ষুধার তাড়নাকে অস্বীকার করে, এমনকি সমাজের চরিত্রহীনতার কথাও যেন লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে।

একজন মানুষ তার ব্যক্তিতার বোধ দিয়ে ব্যক্তি আমিকে কেন ধ্বংস করে দেয়? কীভাবে এই কঠিনতম হত্যাটি ঘটায় সে? অকারণে? – শুধু অকারণ আত্মহত্যা বলে একে সহজ করে দেওয়া আসলে মুখ ফিরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়ার নামান্তরমাত্র নয়? ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দেই ডুর্খেইম আত্মহত্যার সামাজিক পাঠ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ভ্যান গগকে নিয়ে লিখতে গিয়ে আন্তোনিন আর্তো বলেছেন সমাজের দ্বারা 'আত্মঘাতিত' হওয়ার কথা। বাংলা সাহিত্যের লেখকরাও উপন্যাসে এই সমাজ নির্ণীত আত্মহত্যার কথা বললেন। আপাত দৃষ্টিতে অনেকসময় তা Altruistic বা Egiostic আত্মহত্যার রূপ ধরে থেকেছে হয়ত, কিন্তু উপন্যাসের মূল সুরের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে গেলে সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার কথা বারবার তুলে ধরেছেন তাঁরা।

আসলে Subjectivity বা ব্যক্তিতা বোধ তো সমাজ নিরপেক্ষ নয়। মানুষের ব্যক্তি ভাবনাও সমাজকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। আত্মহত্যার এক-একটি ঘটনাকে আমরা যদি অকারণ বলে উড়িয়ে দিতে চাই কিংবা বলি মৃত্যুর 'সাধ' জন্মানো আধুনিক মানুষের আধুনিকতামাত্র, তখন কি বুঝে নিতে হবে না এই আধুনিকতা আসলে কী? হারবার্ট যখন

আত্মহত্যা করে, তখন তাকে পাগলামি হিসাবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। কারণ ব্যক্তি হারবার্টকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে ভুলে যাওয়া যায় না তার তৈরি হয়ে ওঠার বৃহত্তর সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে। হারবার্টের আত্মহত্যা দিয়ে আসলে লেখক সমাজের প্রতিটি মানুষের আত্মহত্যার ইচ্ছে ও সেই ইচ্ছের স্বাভাবিকতার কথাই ঘোষণা করেন। ভোগীর আপাত নিরীহ আত্মহত্যার মধ্যেও আসলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা বলতে চান নবারুণ। সরাসরি বিদ্রোহের বা বিস্ফোরণের কথা না বললেও সমাজের ঠিক করে দেওয়া স্বাভাবিকতার সংজ্ঞাকে অস্বীকার করতে চায় বিমল করের উপন্যাসের চরিত্রেরা। Fatalistic Suicide প্রবল হয়ে ওঠে সন্দীপনের উপন্যাসেও। মতি নন্দীর *একটি মহাদেশের জন্য* গল্পে প্রফুল্ল ও করবীর জীবনের সমস্ত উত্তেজনা শেষ হয়ে গেছে। অতীতের স্মৃতি থেকে বাঁচতে চাওয়া এই মধ্যবয়স্ক দম্পতি তাই খুন খুন খেলার মধ্যে দিয়ে উত্তেজনাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এই পরস্পরের খুনের খেলা আসলে এক আত্মহত্যার খেলাও বটে। আর তাই প্রফুল্লর ডাকে করবীর মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু এই খেলাও একসময় পুরনো হয়ে যায়। আর আধুনিক মানুষের একাকিত্বের, নিঃসঙ্গতার ছবি হয়ত এভাবে আর কোথাও এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এই খেলার উত্তেজনা বাড়াতেই তাই একসময় তারা মানুষ খুন করে – নেহাত উত্তেজনার আঁচ পোহাতেই। এত অবলীলায় মৃত্যু – এই ধারণা আধুনিক সময়ের সাক্ষ্য বহন করে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক Anomy-কে মানুষের মনে তৈরি হওয়া অকারণ আত্মহত্যার ইচ্ছের প্রধান কারণ বলে মেনে নিতেই হয়। জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের *হনন আত্মহননের পটভূমি, হনন আত্মহনন : স্ত্রীর কথা* এবং *হনন আত্মহনন : মেয়ের কথা* ট্রিলজি গল্পে আধুনিকতার এই ইতিহাস ও তার পরিচয় ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বিধায় চৈতী বা তানিয়ার মতো কেউ কেউ

একেবারে একলা হয়ে যায়, নবনীতার মতো কেউ আঁকড়ে ধরে আদর্শকে আর অশোক – বিশ্বাস, আদর্শ, করণীয়-অকরণীয় ভুলে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এই আত্মহননকে তার পার্টি বলে 'ব্যক্তিগত অধঃপতন', মেয়ে তানিয়া ভাবে নবনীতার যথেষ্ট সহানুভূতির অভাবই এর মূল কারণ। নবনীতার ভাবনায় যে প্রশ্নগুলি উঠে আসে তা হল "*অনেকেরই ভূমিকা আছে এ আত্মহননে? দায়িত্ব আছে। আসলে এ হনন আত্মহননই, শুধুই হনন, সমবেত হনন।*" ঠিক যেমন সন্দীপনের *এখন জীবন অনেক বেশি সতেজ স্বাস্থ্যে ভরা* উপন্যাসে দ্রৌপদীর আত্মহত্যার জন্য সমাজ তথা উপন্যাসের প্রত্যেককে এমন কি নিজেকে সবচেয়ে বেশি করে দায়ী করে নিখিল। পুঁজিবাদের ক্রমাগত বিকাশের ফলে তৈরি হওয়া এই বিশ্বায়ন মানুষের নৈতিকতার বোধটাকেও একসময় নষ্ট করে দেয়। সকলের থেকে আলাদা হতে থাকে সে নিজের স্বার্থে। সমাজ যদিও তার মৃত্যুর দায়ও চাপিয়ে দেয় তার নিজের ওপর কিন্তু তার পেছনে থেকে যায় সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি। তাই হত্যার দায় *"সমবেত সকলের। সমগ্র গোষ্ঠীর"*।

আজ যখন অতি সামান্য ক্ষোভ, অপ্রাপ্তি, পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া বা বাবা মায়ের তিরস্কারে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বয়ঃসন্ধিতে থাকা ছাত্রছাত্রীরা, কিংবা সাফল্যের চূড়ায় থাকা অভিনেতা, ও গ্ল্যামার জগতের তারকারা আচমকা আত্মহত্যা করে তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে যে কেবল মনোবিকলন বা মানসিক অবসাদ দিয়েই আত্মহত্যাকে বোঝা বা প্রতিহত করার চেষ্টা করা অসম্ভব। আমাদের পুরনো সমাজ ভেঙে গেছে, বিশ্বায়ন পরবর্তী সমাজে বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করেছে প্রতিটি মানুষকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমাগত ব্যস্ত থাকা মানেই যে আসলে সে জুড়ে আছে এমনটা নয়। বিশ শতকের ঔপন্যাসিকেরা যে দিকনির্দেশ করেছিলেন সেই পথেই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। সমাজ আমাদের মনে কোন বিশ্বাসের, ভবিষ্যতের স্বপ্ন আঁকতে

পারছে না। উপরন্তু বানিয়ে তোলা মরালিটি ও স্বাভাবিক হওয়ার জন্য যে রীতি তৈরি করে দিচ্ছে রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা সমাজ তা ব্যক্তি মানুষকে অবসাদগ্রস্ত করে দিতে বা বিচ্ছিন্ন করে দিতে যথেষ্ট। দর্শন, সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি ও চিকিৎসা শাস্ত্র - এই সবকটি দিয়ে আত্মহত্যার মত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে পড়তে হবে আমাদের। আত্মহত্যাকারী আত্মহত্যার সময় অসুস্থ, কোন কোন মনোবিদের এই ধারণা যে ভ্রান্ত এমন কি আত্মহত্যার বিপক্ষে ওকালতি করা মানুষটাও যে কখন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেবে তা বলা অসম্ভব। চিত্র তারকা সুশান্ত সিংয়ের আত্মহত্যা প্রসঙ্গে যে আলোচনাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা হল এই যে তাঁর শেষ প্রকাশিত ছবিতে তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সেই চরিত্রটি নিজের সন্তানকে আত্মহত্যার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা শেখায়। আমাদের মনে পড়ে যেতেই পারে মায়াকভস্কির কথা, য়েস্যেনিনের আত্মহত্যার পর যিনি য়েস্যেনিনের উদ্দেশ্যে কবিতা লেখেন। য়েস্যেনিনের আত্মহত্যাকে অনিবার্য বলেও তিনি আত্মহত্যার বিরোধিতা করেন অথচ তার পাঁচ বছর পরেই নিজের বুকে গুলি মেরে জীবনের অবসান ঘটালেন তিনি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে উনিশ বিশ শতকের ঔপন্যাসিকেরা ক্রমবিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আত্মাহুতি,ব্যক্তিগত আত্মহত্যা, মনোবিকলন ও অকারণ আত্মহত্যার স্তর পেরিয়ে সমাজ নির্ণীত আত্মহত্যার দিকে পাঠককে তাকাতে বাধ্য করেছেন। আমাদের দেশের ধর্ম, শ্রেণি ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা মাথায় রেখে বলা যায় যে এই সমাজ রোহিত ভেমুলাকে মৃত্যুর মুখে এনে দাঁড় করায়, হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। তাই আত্মহত্যার পেছনে থাকা ভেঙে যাওয়া মন, জিনগত সমস্যার কথা ভাবলেই হবে না, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রের ধারণা, এই সব সব কিছুর খতিয়ে দেখে তবেই আত্মহত্যার একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা আকর গ্রন্থ

- কর, বিমল, *উপন্যাস সমগ্র ৩,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
- কর, বিমল – *উপন্যাস সমগ্র* ৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
- গঙ্গোপাধ্যায়, তারকনাথ – *হরিষে বিষাদ অথবা নায়ক-নায়িকা শূন্য উপন্যাস* (দ্বিতীয় সংস্করণ), শ্রী শরৎকুমার লাহিড়ী এন্ড কোং, কলকাতা, ১৩০৪
- *বাংলা গল্প সংকলন* (চতুর্থ খণ্ড), গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল(সংকলন ও সম্পাদনা), সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৬
- গুপ্ত, জগদীশ – *জগদীশ রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৯৬
- গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ – *নগেন্দ্র গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), ??
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র – *বঙ্কিম রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা, ১৩৬০
- চট্টোপাধ্যায়,শক্তি-*গদ্যসংগ্রহ,* দ্বিতীয় খণ্ড,আখ্যানবিচিত্রা,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৯৯৭
- চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র-*১, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০০৬

- চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র*-২, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০১২
- চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *উপন্যাস সমগ্র*-৩, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি ৭, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০০৯১, ২০১৫
- চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন- *গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৫
- চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ- *নির্বাচিত জ্যোতিপ্রকাশ*, রায় দেবেশ (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯
- দত্ত, রমেশচন্দ্র – *রমেশ রচনাবলী* (উপন্যাস সমগ্র), বসু, কাঞ্চন (সম্পা.), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৬
- দেবী, স্বর্ণকুমারী – *স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস সমগ্র* (১ম খণ্ড), মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সঙ্কলন, সম্পাদন, ভূমিকা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯
- দেবী, স্বর্ণকুমারী – *স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস সমগ্র* (২য় খণ্ড), মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সঙ্কলন, সম্পাদন, ভূমিকা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯
- নন্দী, মতি- *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৮
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, কলকাতা, ১৪১৮
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ – *রবীন্দ্র রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২

- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩, ১৩৮২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (পঞ্চম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৩৯১
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (সপ্তম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৩৮৯
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (অষ্টম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৩৯২
- বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর - *তারাশঙ্কর রচনাবলী* (দ্বাদশ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ৭৩, ১৯৮৫
- বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ – *বিভূতি রচনাবলী* (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৪০৩
- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক – *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র* (১ম খণ্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১
- বসু, বুদ্ধদেব – *নির্জন সাক্ষর,* ডি.এম.লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬, ১৯৫১
- বসু, শ্রীমনোজ – *ভুলি নাই,* বেঙ্গল পাবলিশার্স,১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৩৫২
- বসু, সমরেশ – *মহাকালের রথের ঘোড়া* , আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯, ১৯৮৮

- ভট্টাচার্য, নবারুণ – *উপন্যাস সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, ২০১৩
- মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, *ফুলজানি,* শ্রী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, ১৩০০
- মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র, *শক্তি-কানন,* শ্রী শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার দ্বারা ৩১ সাঁকারিটোলা হইতে প্রকাশিত, ১৮০৯ শক
- মিত্র, নরেন্দ্রনাথ – *চেনামহল,* ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড, ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলকাতা ৭, ১৩৬১
- মুখোপাধ্যায়, দামোদর – *দামোদর গ্রন্থাবলী* (প্রথম খণ্ড), হিতবাদীর ইলেকট্রিক যন্ত্রে শ্রী অন্নদাচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩১২
- মুখোপাধ্যায়, দামোদর – *দামোদর গ্রন্থাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), হিতবাদীর ইলেকট্রিক যন্ত্রে শ্রী অন্নদাচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত, কলকাতা, ১৩১২
- শংকর- *নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৭৩, ১৯৬৬
- হোসেন, মীর মশাররফ – *বিষাদ সিন্ধু,* আল আমান, আবদুল আজিজ (সংকলন ও সম্পাদনা), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০০

বাংলা সহায়ক গ্রন্থ

- কর, বিমল - *উড়ো খই,* দ্বিতীয় পর্ব, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৯১৪
- কামু, আলব্যের – *দ্য মিথ অফ সিসিফাস,* চাকলাদার, মনোজ (অনুবাদ), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১০

- গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র (ভূমিকা, অনুবাদ, টীকা) – *মনুসংহিতা,* আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭
- গুপ্ত, ক্ষেত্র - *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড), চতুর্থ সংস্করণ, গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বিটুয়া টোলা লেন, কলকাতা, ২০০৮
- গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বিটুয়া টোলা লেন, কলকাতা, ২০০৮
- গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (তৃতীয় খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, ৫৯/১ বিটুয়া টোলা লেন, কলকাতা, ২০১৩
- গুপ্ত, ক্ষেত্র – *বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, ২০০৮
- ঘোষ, শৈলেশ্বর – *আত্মহত্যা কী কোনো সমাধান?* দ্র. ঘোষ, শৈলেশ্বর (সম্পা.) – ক্ষুধার্ত সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১
- চক্রবর্তী, অরিন্দম – *'মরিবার হল তার সাধ', ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস,* অনুষ্টুপ, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
- চৌধুরী, ডঃ সুকোমল(সম্পা.) *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন,* বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সিরিজ – গ্রন্থমালা ২, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০০৭৩
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ- *জীবনস্মৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা,১৯৭৬
- *পৌরাণিক অভিধান,* সরকার, সুধীরচন্দ্র (সংকলিত), এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

- বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র - *আত্মহত্যার অধিকার*, দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ – *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (পঞ্চম সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩
- বসু, পথিক – *বিচ্ছিন্নতার মনোদর্শন*, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৮, ১৯৯৩
- বসু, রামদুলাল – *বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন গৌণ ঔপন্যাসিকবৃন্দ*, চলন্তিকা প্রকাশন, কলকাতা, ১৩৮৮
- বাংলা উপন্যাস: *বীক্ষা ও অন্বীক্ষা* (সম্পা. সুবল সামন্ত), এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২০১১
- বিশ্বাস, অনিল – *বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য* [১৯০১-১৯৫২], প্রথম খণ্ড (উপন্যাস), জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট; কলিকাতা, ১৯৫২
- ভট্টাচার্য, বামনদেব (বঙ্গানুবাদ) – *শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা*, ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা
- ভট্টাচার্য, সুকুমারী – *সতী, প্রবন্ধসংগ্রহ* ১, গাঙচিল, 'মাটির বাড়ি', ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা ৭০০০১১, ২০১৪
- রায়, অলোক – *বিশ শতক* , প্রমা প্রকাশনী, ৫৭/২ই, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ২০১০
- রায়, সত্যেন্দ্রনাথ – *বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা*, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, ২০০০

- লাহিড়ী, রণবীর - *চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল: পাগলামি-পলায়ন-প্রতিবাদ: একটি আত্মহত্যার রিপোর্ট*, দ্র. *বিষয় আত্মহনন – একটি ভাষাবন্ধন সংকলন*, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ৩/৫২, বিজয়গড়, কোলকাতা, ২০১০
- সেনগুপ্ত, অমলেন্দু – *জোয়ারভাটায় ষাট-সত্তর* , পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৬, ১৯৯৭
- সেনগুপ্ত, অমলেন্দু – *উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব,* প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৬

ইংরেজি গ্রন্থ ও পত্রিকা

- Bradatan, Cristina - *About Some 19th Century Theories of Suicide – Interpreting Suicide in an East European Country*, International Journal of Comparative Sociology 48(5), 2001
- Durkheim, Emile*, Suicide – A Study in Sociology*, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1922
- Evans, Glens, Farberow, Norman L, Kennedy Associates, *The Encyclopedia of Suicide* (2nd edition), Fasts on File, Inc, New York, 2003
- Hume, David- *Essays on Suicide and the Immortality of the Soul*, Fleet Street and Patterton Row, 1783
- Falret, Jean-Pierre, *De L'hypochondrie et du Suicide*, 1822

- Freud, Sigmund – *Beyond the Pleasure Principle*, Hubback C.J.M(Translation), Vienna: International Journal of Ethics for October, 1895
- James William- *Is Life Worth Living?* Published in the International Journal of Ethics, October, 1985.
- Marcuse, Herbert – *Eros and Civilization*, (2nd Ed.), London: Routledge, 1987
- Marx, K- *Capital*, (3 Vol), Moscow, Progress Publishers, 1977
- Marx, K- *Economic and Philosophical Manuscripts*; Moscow, Progress Publishers, 1977
- Marx, K - *Peuchet: On Suicide*, Geselleschaftsspiegel Rd. II, Heft VII; 1846
- Masaryk, Thomas G. - *Suicide and the Meaning of Civilization*, Translated by W.B Weist and Robert G. Batson, Chicago: University of Chicago Press, 1970[1881]
- Menninger, Karl - *Man Against Himself*, Harcourt, Brace and World, Inc. New York
- Merian, *Memoir Sur Le Suicide*, Berlin, Royal Academy of Science & Bells Letters, 1763

- Ross*, Christopher- Mishima's Sword*, Travel in Search of a Samurai Legend, Fourth Estate- HarperCollins, London
- Solomon, Andrew – *The Noonday Demon, An Anatomy of Depression,* Vintage (Penguin Random House UK), 20 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 2SA, 2001
- Thakur, Upendra - *The History of Suicide in India, An Introduction*, Oriental Publishers and Booksellers, Nai Sarak, Delhi
- Turnball, Stephen R (1977), *The Samurai: A Military History*. New York, MacMilan Publishing Co.

তত্ত্বাবধায়ক

গবেষক